কিশোর থ্রিলার
তিন গোয়েন্দা
ভলিউম ৩৭
রকিব হাসান
সেবা
প্রকাশনী
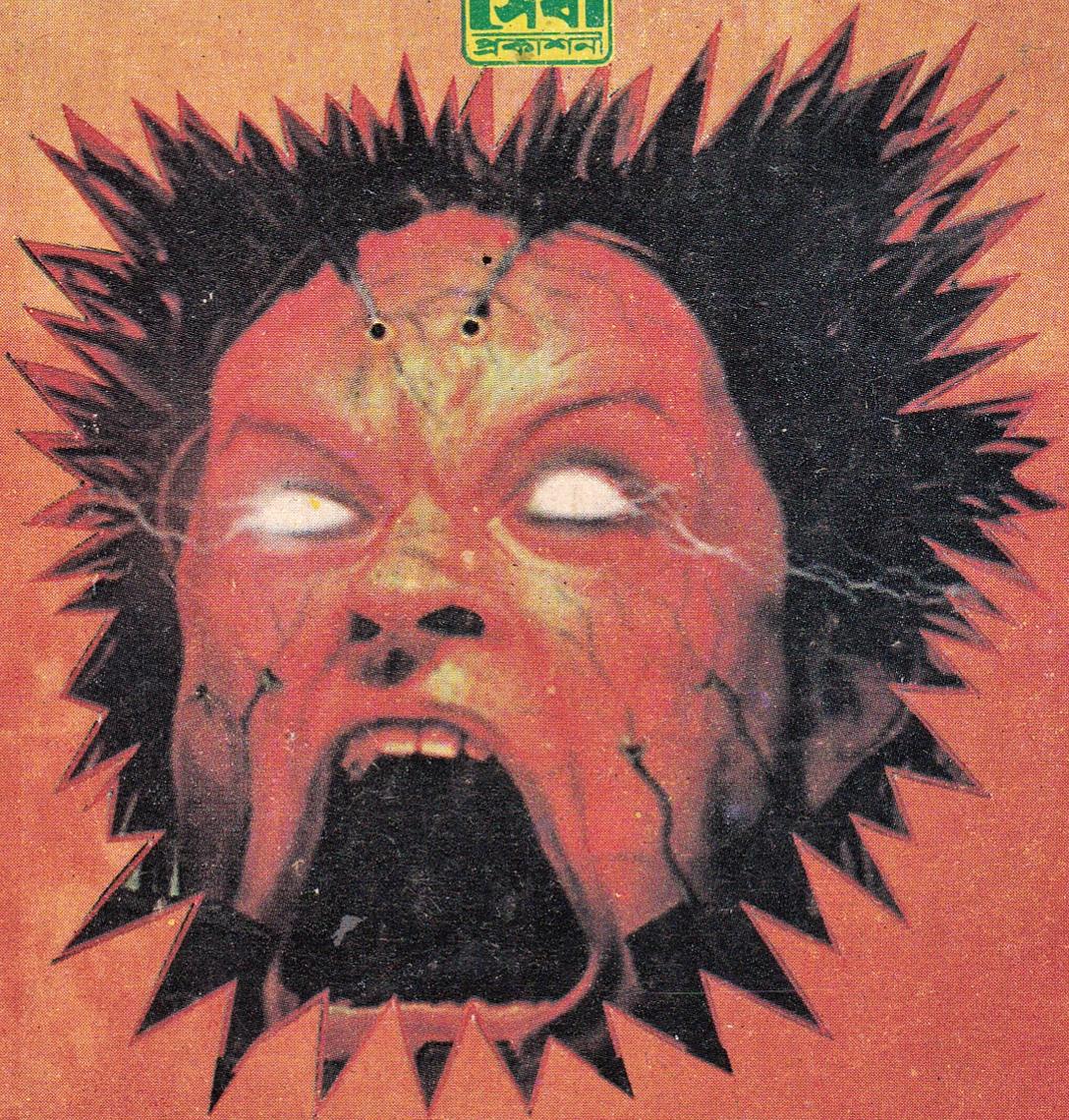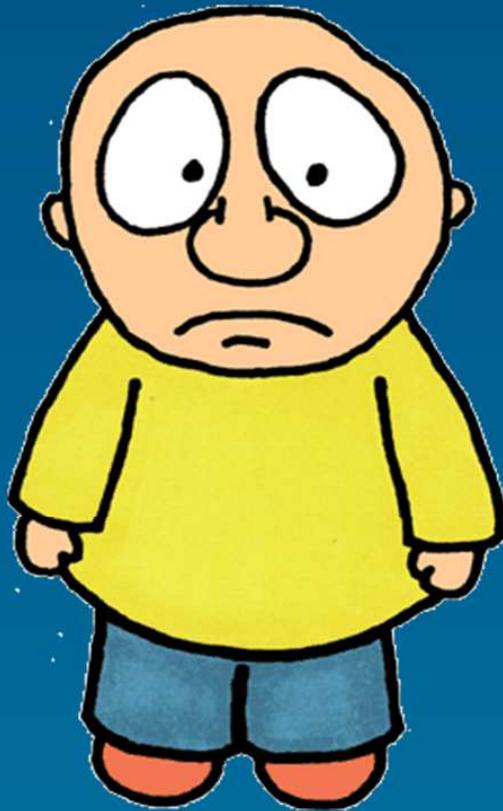
ভলিউম-৩৭

তিন গোয়েন্দা

রকিব হাসান
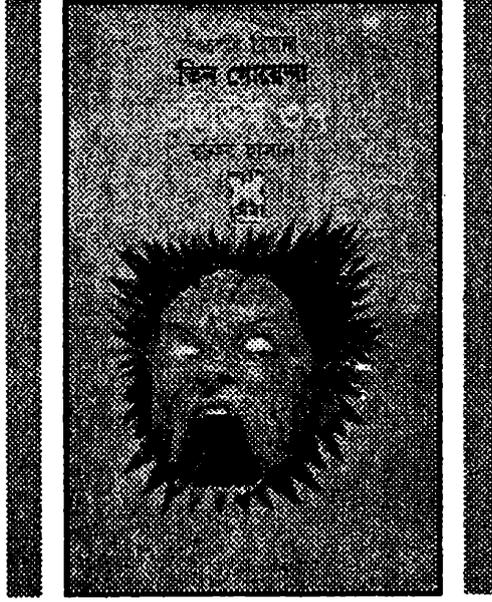
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
ISBN 984-16-1403-0
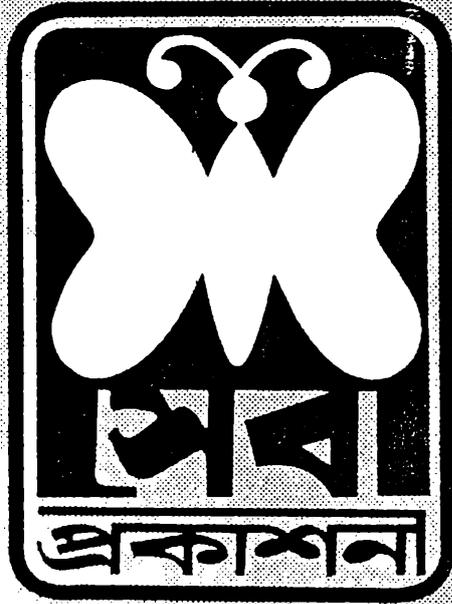
প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯২

রচনা: বিদেশি কাহিনি অবলম্বনে

প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সমন্বয়কারী: শেখ মহিউদ্দিন

পেস্টিং: বি. এম. আসাদ

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি পি ও বক্স: ৮৫০
mail: alochonabibhag@gmail.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮ ১৯০২০৩

Volume-37
TIN GOYENDA SERIES
By: Rakib Hassan

চুয়ান্ন টাকা

তিন গোয়েন্দা

হ্যালো, কিশোর বন্ধুরা—
আমি কিশোর পাশা বলছি, আমেরিকার রকি বিচ থেকে।
জায়গাটা লস অ্যাঞ্জেলেসে, প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে,
হলিউড থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে।
যারা এখনও আমাদের পরিচয় জানো না, তাদের বলছি,
আমরা তিন বন্ধু একটা গোয়েন্দা সংস্থা খুলেছি, নাম:
তিন গোয়েন্দা।
আমি বাঙালী। থাকি চাচা-চাচীর কাছে।
দুই বন্ধুর একজনের নাম মুসা আমান, ব্যায়ামবীর,
আমেরিকান নিগ্রো; অপরজন আইরিশ আমেরিকান,
রবিন মিলফোর্ড, বইয়ের পোকা।
একই ক্লাসে পড়ি আমরা।
পাশা স্যালভেজ ইয়ার্ডে লোহা-লক্কড়ের জঞ্জালের নীচে
পুরনো এক মোবাইল হোম-এ আমাদের হেডকোয়ার্টার।

তিনটি রহস্যের সমাধান করতে চলেছি এবার—
এসো না, চলে এসো আমাদের দলে!

তিন গোয়েন্দার আরও বই:

তি. গো. ভ. ১/১ (তিন গোয়েন্দা, কঙ্কাল দ্বীপ, রূপালী মাকড়সা) ৬৬/-
তি. গো. ভ. ১/২ (ছায়াশ্বাপদ, মমি, রত্নদানো) ৬৬/-
তি. গো. ভ. ২/১ (প্রেতসাধনা, রক্তচক্ষু, সাগর সৈকত)
তি. গো. ভ. ২/২ (জলদস্যুর দ্বীপ-১,২, সবুজ ভূত)
তি. গো. ভ. ৩/১ (হারানো তিমি, মুক্তোশিকারী, মৃত্যুখনি) ৫৫/-
তি. গো. ভ. ৩/২ (কাকাতুয়া রহস্য, ছুটি, ভূতের হাসি) ৫৫/-
তি. গো. ভ. ৪/১ (ছিনতাই, ভীষণ অরণ্য ১,২)
তি. গো. ভ. ৪/২ (ড্রাগন, হারানো উপত্যকা, গুহামানব)
তি. গো. ভ. ৫ (ভীতু সিংহ, মহাকাশের আগন্তুক, ইন্দ্রজাল) ৫৮/-
তি. গো. ভ. ৬ (মহাবিপদ, খেপা শয়তান, রত্নচোর)
তি. গো. ভ. ৭ (পুরনো শত্রু, বোম্বেটে, ভূতুড়ে সুড়ঙ্গ)
তি. গো. ভ. ৮ (আবার সম্মেলন, ভয়ালগিরি, কালো জাহাজ) ৬০/-
তি. গো. ভ. ৯ (পোচার, ঘড়ির গোলমাল, কানা বেড়াল) ৬১/-
তি. গো. ভ. ১০ (বাক্সটা প্রয়োজন, খোঁড়া গোয়েন্দা, অথৈ সাগর ১)
তি. গো. ভ. ১১ (অথৈ সাগর ২, বুদ্ধির ঝিলিক, গোলাপী মুক্তো)
তি. গো. ভ. ১২ (প্রজাপতির খামার, পাগল সংঘ, ভাঙা ঘোড়া)
তি. গো. ভ. ১৩ (ঢাকায় তিন গোয়েন্দা, জলকন্যা, বেগুনী জলদস্যু)
তি. গো. ভ. ১৪ (পায়ের ছাপ, তেপান্তর, সিংহের গর্জন)
তি. গো. ভ. ১৫ (পুরনো ভূত, জাদুচক্র, গাড়ির জাদুকর)
তি. গো. ভ. ১৬ (প্রাচীন মূর্তি, নিশাচর, দক্ষিণের দ্বীপ)
তি. গো. ভ. ১৭ (ঈশ্বরের অশ্রু, নকল কিশোর, তিন পিশাচ) ৬০/-
তি. গো. ভ. ১৮ (খাবারে বিষ, ওয়ার্নিং বেল, অবাক কাণ্ড)
তি. গো. ভ. ১৯ (বিমান দুর্ঘটনা, গোরস্তানে আতঙ্ক, রেসের ঘোড়া)
তি. গো. ভ. ২০ (খুন, স্পেনের জাদুকর, বানরের মুখোশ)
তি. গো. ভ. ২১ (ধূসর মেরু, কালো হাত, মূর্তির হুঙ্কার)
তি. গো. ভ. ২২ (চিতা নিরুদ্দেশ, অভিনয়, আলোর সংকেত)
তি. গো. ভ. ২৩ (পুরানো কামান, গেল কোথায়, ওকিমুরো কর্পোরেশন)
তি. গো. ভ. ২৪ (অপারেশন কক্সবাজার, মায়া নেকড়ে, প্রেতাত্মার প্রতিশোধ)
তি. গো. ভ. ২৫ (জিনার সেই দ্বীপ, কুকুরখেকো ডাইনী, গুপ্তচর শিকারী)
তি. গো. ভ. ২৬ (ঝামেলা, বিষাক্ত অর্কিড, সোনার খোঁজে)
তি. গো. ভ. ২৭ (ঐতিহাসিক দুর্গ, রাতের আঁধারে, তুষার বন্দি)
তি. গো. ভ. ২৮ (ডাকাতের পিছে, বিপজ্জনক খেলা, ভ্যাম্পায়ারের দ্বীপ)
তি. গো. ভ. ২৯ (আরেক ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন, মায়াজাল, সৈকতে সাবধান) ৫১/-
তি. গো. ভ. ৩০ (নরকে হাজির, ভয়ঙ্কর অসহায়, গোপন ফর্মুলা)
তি. গো. ভ. ৩১ (মারাত্মক ভুল, খেলার নেশা, মাকড়সা মানব) ৫৩/-
তি. গো. ভ. ৩২ (প্রেতের ছায়া, রাত্রি ভয়ঙ্কর, খেপা কিশোর) ৬৩/-
তি. গো. ভ. ৩৩ (শয়তানের থাবা, পতঙ্গ ব্যবসা, জাল নোট)
তি. গো. ভ. ৩৪ (যুদ্ধ ঘোষণা, দ্বীপের মালিক, কিশোর জাদুকর)

ভোরের পিশাচ

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৭

'কোন কুক্ষণে যে বিলির কথায় রাজি হয়েছিলাম আমি!' আক্ষেপ করে বলল মুসা।

'কেন, কি হয়েছে?' জানতে চাইল রবিন। দুদিন গ্রীনহিলসে ছিল না। সেদিন সকালে ফিরেছে। ফিরেই চলে এসেছে মুসার সঙ্গে দেখা করতে।

'কি আর হবে? আরেকটু হলেই নরখাদকের হাতে প্রাণটা গিয়েছিল আজ!'

অবাক হলো রবিন। 'কি যে বলো না। এখানে নরখাদক আসবে কোত্থেকে?'

'এসেছে বলেই তো বলছি। বিলি অবশ্য আগেই হুঁশিয়ার করেছিল আমাকে। নইলে ঠিক মারা পড়তাম।'

'তোমার কথা তো কিছু বুঝতে পারছি না। ও তোমার বন্ধু হলো কি করে? চান্স পেলেই তো খেপায়।'

'বন্ধু হয়নি। একটা চাকরি দিয়েছে।'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত মুসার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল রবিন। বিলিকে ভাল করেই চেনে। ভাল নাম বিলিয়ার্ড রেইনার, মুসাদের পড়শী। আগে গাঁয়ের কিনারে অন্য একটা বাড়িতে থাকত, কিছুদিন হলো ওখান থেকে চলে এসেছে। একই স্কুলে পড়ে ওরা, তবে বিলি ওপরের ক্লাসে। বয়েসও তিন-চার বছর বেশি। মুসা ওকে দেখতে পারে না। ওপরের ক্লাসে পড়ে বলে দেমাগ দেখায়। কি করে যেন জেনে গেছে ভূতকে ভয় পায় মুসা। তারপর থেকে খেপায়। সুযোগ পেলেই ভূতের ভয় দেখায়। ইদানীং হাতখরচের টাকা রোজগারের জন্যে খবরের কাগজের হকারি করে।

'দুদিন ছিলাম না,' রবিন বলল, 'এর মধ্যেই এত কাণ্ড ঘটে গেল! খুলে বলো তো ঘটনাটা কি?'

'তুমি যাওয়ার পরদিন এসে আমাকে ধরল বিলি,' মুসা বলল। 'মিনতি শুরু করল—আমার একটা কাজ করে দিবি, ভাই? জিজ্ঞেস করলাম, কি কাজ? বলল, আমি পনেরো দিন থাকব না। বেড়াতে যাব। অতদিন কাগজ না পেলে সহ্য করবে না গ্রাহকরা, অন্য হকার ঠিক করে নেবে। তুই যদি কটা দিন চালিয়ে নিতে পারিস, তো আমার গ্রাহকগুলো থেকে যায়। ওই পনেরো দিনের লাভের টাকাটা নাহয় তুই নিয়ে নিস।'

'রাজি হলে?'

'এমন করে ধরল, না করতে পারলাম না। তা ছাড়া, পঞ্চাশ ডলার পাব।

অনেক টাকা। গরমের সময় মেলায় গিয়ে দুহাতে খরচ করতে পারব। সুযোগটা ছাড়তে ইচ্ছে করল না।'

'তারপর?'

'আমি রাজি হতে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল বিলি। কার কার বাড়িতে কাগজ পৌঁছে দিতে হবে তার একটা লিস্ট দিল আমাকে। নিচের শেষ নামটা দেখিয়ে বলল—তুই যখন আমার কাজটা করতে রাজিই হলি, মুসা, তোকে সাবধান না করে পারছি না; খবরদার, এই বুড়ো সন্ন্যাসীটার ব্যাপারে সাবধান থাকবি। কোনমতেই যেন তোকে ধরতে না পারে!'

'অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকালাম। আমাকে জিজ্ঞেস করল, দেখেছিস ওকে? মাথা নাড়লাম। দেখিনি। চোখ বড় বড় করে বলল সে, লম্বা দাড়ি বুড়োটার। বাদামী দাঁত, হলুদ চোখ। হাতের আঙুলগুলো, জানিস, ঈগলের নখের মত বাঁকা। ও মানুষ খায়।

'বললাম, ভয় দেখানোর চেষ্টা করছ?

'না না, তা দেখাব কেন? আধহাত জিভ বের করে কামড়ে ধরল বিল। বুড়োটা যাতে তোর কোন ক্ষতি করতে না পারে সেজন্যে তোকে সাবধান করা। তুই আমার কাজটা না করে দিলে অবশ্য করতাম না। তখন ভাবতাম, ধরুক তোকে, মরুগে, আমার কি?

'সেদিন বিকেলের বাসে চলে গেল সে।

'পরদিন ভোরে সাইকেলের ক্যারিয়ারে খবরের কাগজের বোঝা নিয়ে রওনা হলাম। কোনখান থেকে কাগজ নিতে হবে, কার কার বাড়িতে পৌঁছে দিতে হবে, আগের দিন যাওয়ার আগে সব আমাকে ঘুরিয়ে দেখিয়েছে বিল।

'ও বলল, খুব ভোরে কাগজ ডেলিভারি দিতে হয়। নাস্তার টেবিলে পড়তে চায় বেশির ভাগ লোকে। সময়মত সামনে না পেলে অমনি ফোন করবে হকারের বাড়িতে। ধমক দেয়া শুরু করবে: আমার কাগজ কই? দুপুর বেলা পড়ব নাকি? বাসি হয়ে গেলে পড়ে কি লাভ? ধমক থেকে বাঁচতে চাইলে অন্ধকার থাকতেই বেরিয়ে পড়তে হবে তোকে। সূর্য ওঠার আগে আগে কাজ শেষ করতে হবে।

'ওর কথামত বেরোলাম। আজব এক ভোর দেখেছি, জানো। গা ছমছম করতে লাগল। কুয়াশা পড়ছে তখন। কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে আছে মনে হলো পুরো গ্রামটা। অসম্ভব নির্জন। একটা গাড়িও বেরোয়নি রাস্তায়, কোন লোক ছিল না। আবছা অন্ধকারে বাস্তব জিনিসগুলোকেও অবাস্তব মনে হতে লাগল। যেমন ধরো, সব্জি খেতের বড় বড় বাঁধাকপিগুলোকে মনে হলো যেন সারি দেয়া মানুষের মাথা।

'তালিকার প্রথম নামটা মিসেস ডেনভারের। যাওয়ার সময় তাঁর বাড়িটাই প্রথমে পড়ে। বিল বলেছে, গ্রীনহিলসের লোকে বারান্দায় পেপার রেখে যাওয়াটা পছন্দ করে না। কুকুর-বেড়ালে নষ্ট করে ফেলতে পারে। তাই বাগানে দাঁড়িয়ে বারান্দায় ছুঁড়ে না ফেলে দরজার নিচ দিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়াটাই নিরাপদ।

'ঘুরে বাড়ির পেছন দিকে মিসেস ডেনভারের রান্নাঘরের কাছে চলে এলাম,' দম নেয়ার জন্যে থামল মুসা।

'মিসেস ডেনভার, মানে, ওই বিধবা মহিলা তো?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'হ্যাঁ।'

কয়েক বছর আগে মহিলার স্বামী মারা গেছে। বাড়িতে একা থাকেন। ছোটদের খুব ভালবাসেন। এটা-ওটা খেতে দেন। গাঁয়ের ছেলেমেয়েরা তাঁকে পছন্দ করে।

'স্ক্রিন ডোরের নিচে কাগজটা ফেলতে গিয়ে থেমে গেলাম,' বলতে লাগল মুসা। 'মনে হলো, কে যেন আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

'মুখ তুলে তাকিয়ে দেখি, মিসেস ডেনভার। নাক চেপে ধরেছেন কাঁচের ওপর। অন্ধকারে অদ্ভুত লাগছে তাঁর চেহারা। মনে হলো চোখ দুটো নেই। শূন্য কোটর। কিছু বললেন না। কিছু করলেন না। একেবারে অনড়।

'তাঁর দাঁড়ানোর ভঙ্গিটা ভাল লাগল না। ভয় পেয়ে গেলাম। সাইকেলের দিকে পিছাতে শুরু করলাম।

'সাইকেলে চড়ে রওনা হলাম আবার। মিসেস ডেনভারের কথা ভাবলাম না বেশিক্ষণ। মন জুড়ে রয়েছে সন্ন্যাসী। মনকে বোঝালাম, ভয়ের কিছু নেই। বিল আসলে মিথ্যে কথা বলেছে, আমাকে ভয় দেখানোর জন্যে। ওটা তার শয়তানি।

'পথে আরেকটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটল, হকিনসদের বাড়িতে। দুটো কাগজ নেয় হকিনসরা—একটা মিস্টার হকিনসের জন্যে, আরেকটা মিসেসের। একটা কাগজ হলে কে আগে পড়বে এই নিয়ে ঝগড়া বাধায়, টানাটানি করতে করতে কাগজই ছিঁড়ে ফেলে। সেজন্যে নাকি দুটো নেয়।

'সামনের দরজার নিচে হকিনসদের দুটো কাগজ ঠেলে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতেই কমাণ্ডারকে দেখতে পেলাম। ডাকলাম, কমান্ডার, কেমন আছিস? আয়!

'ও এল না। লেজও নাড়ল না। শুধু তাকিয়ে রইল আমার দিকে। অবাক লাগল, এমন করছে কেন কুকুরটা? আমাকে দেখলেই যে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে, আদর নেয়ার জন্যে অস্থির হয়, সে এমন চুপচাপ কেন? ভাবলাম, এত ভোরে আমাকে কোনদিন দেখে না তো, তাই বোধহয় অবাক হয়ে ওরকম আচরণ করছে।

'বললাম, কমান্ডার, চিনতে পারছিস না? আরে, আমি।

'নড়লও না সে। নিচের ঠোঁটটা গুটিয়ে ফেলল শুধু। দাঁত দেখতে পেলাম। চাপা গরগর আওয়াজ করতে লাগল। আরও অবাক হলাম! কাউকে পছন্দ না করলেও এমন করে হুমকি দেয় না কখনও!

'ভয় পেলাম। ওর চোখে চোখ রেখে নিচু স্বরে কথা বলতে বলতে পিছিয়ে গেলাম সাইকেলের দিকে। অন্ধকারে চোখ দুটো যেন জ্বলছে ওর। কুকুরের চোখ এত লাল হতে আর দেখিনি।

'সাইকেলের কাছে পৌঁছে বললাম, অমন করলি তো! ঠিক আছে,

দেখিস, আর কোন দিন যদি তোর পেটে হাত বুলিয়ে দিয়েছি তো!

'চাপা গর্জন করে উঠল ও। এক পা এগোল। ভঙ্গিটা ভাল না।

'আর থাকতে সাহস করলাম না। লাফ দিয়ে সাইকেলে উঠে বসলাম। জোরে জোরে প্যাডেল ঘুরিয়ে সরে এলাম হকিনসদের বাড়ির কাছ থেকে।

'মিসেস ডেনভার আর কমাণ্ডারের অদ্ভুত আচরণে বেশ চিন্তায় পড়ে গেলাম। সন্ন্যাসীর বাড়িতে যাওয়ার সময় খুঁত খুঁত করতে থাকল মনটা। বার বার মনে পড়তে থাকল বিলের কথা: সন্ন্যাসীটা মানুষ খায়!

'ধূর! মনকে বোঝালাম আবার, ও ভয় দেখিয়েছে। সব সময়ই তো আমার সঙ্গে এমন করে।

'ওই লোক ভুডু জানে, জানিস—আমাকে বলেছে বিল। ছেলেমেয়েদের দেখলেই ভুলিয়ে-ভালিয়ে নিয়ে গিয়ে বশ করে ফেলে। ভরে রাখে খাঁচার মধ্যে। পরে কচকচ করে চিবিয়ে খায়। টমেটো সস দিয়ে।

'হেসে উড়িয়ে দিয়েছি ওর কথা। কিন্তু ভোররাতে পত্রিকা দিতে সন্ন্যাসীর কুঁড়ের দিকে যাওয়ার সময় রীতিমত ভয় করতে লাগল। নানা রকম প্রশ্ন জাগল মনে: এমন জায়গায় ঘর বাঁধল কেন, একেবারে জলাভূমির কিনারে? জায়গার কি এতই অভাব? কোন কুমতলব না থাকলে ওরকম জায়গায় কেউ বাস করে?

'ফরেস্ট লেনে যখন পৌঁছলাম, কুয়াশা আরও ঘন হয়ে পড়তে লাগল।

'জায়গাটা কবরস্থানের মত নীরব। মাঝে-মধ্যে জলাভূমির আগাছার ভেতর থেকে ক্রোঁক ক্রোঁক করে ডেকে উঠছে একআধটা ব্যাঙ।

'তুমি নিশ্চয় যাওনি ইদানীং ওদিকে? গেলে দেখবে, আঙিনায় কতগুলো কুৎসিত মূর্তি বানিয়ে রেখেছে সন্ন্যাসী। নিজেকে বড় আর্টিস্ট ভাবে আরকি। পুরানো চাকার হাবক্যাপ, গাড়ির বডির নানা রকম টুকরো, লন মওয়ার, টিভি অ্যান্টেনা, গ্যাস মাস্ক এ সব ফালতু জিনিস দিয়ে বানিয়েছে। কোন কোনটাতে হাড় জোড়া দিয়েছে।

'আমার ধারণা গরুর হাড়। কিন্তু বিল বলেছে, মানুষের হাড়! একটার মধ্যে মাংসের তাজা টুকরো লেগে থাকতেও নাকি দেখেছে!

'ওর কথা বিশ্বাস করে কে? যাই হোক, কুয়াশার মধ্যে কিম্ভূত দেখাচ্ছিল মূর্তিগুলো। বেড়ার গায়ে সাইকেলটা ঠেস দিয়ে রেখে গিয়ে গেট খুললাম। কুঁড়ের দিকে তাকিয়ে মুখ শুকিয়ে গেল। ঘরের বেড়ার রঙ সব চেঁছে ফেলা। দরজার চৌকাঠের ওপর ঝুলিয়ে রেখেছে একটা হরিণের খুলি। বিচ্ছিরি!

'মানুষের স্বভাবের কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। ঘরের মধ্যে কাগজ ঢোকানোটা পছন্দ করে না সন্ন্যাসী। বারান্দায় একটা পাথর রেখেছে, কাগজ চাপা দেয়ার জন্যে। দোয়া-দরূদ পড়ে বুকে ফুঁ-ফা দিয়ে, পা টিপে টিপে গিয়ে বারান্দায় উঠলাম। চাপা দিয়ে রাখলাম কাগজটা। শব্দ না করে পিছিয়ে আসতে লাগলাম, ও যাতে কিছু টের না পায়।

'বারান্দা থেকে নামতেই গায়ে পানি পড়ল। বৃষ্টির ফোঁটার মত। কাণ্ড!

আকাশে তো মেঘ নেই, বৃষ্টি এল কোত্থেকে!

'ফিরে তাকালাম। দেখি, একটা মূর্তি নড়তে আরম্ভ করেছে। ধড়াস করে উঠল বুকের মধ্যে। পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম।

'এগোতে শুরু করল মূর্তিটা। আরও কাছে এলে বুঝলাম, মানুষ। মূর্তিগুলোর আড়ালে লুকিয়ে ছিল।

'স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে আছি। পা দুটোতে মনে হলো দশ মন ওজনের লোহা বেঁধে দেয়া হয়েছে। নড়াতে পারছি না।

'লোকটার হাতে একটা মগ, তাতে পানি, আঁজলা ভরে নিয়ে ছিটিয়ে দিল আমার ওপর। বরফের মত শীতল পানি।

'পানি ছিটাচ্ছে কেন? হঠাৎ বুঝে ফেললাম, কেন! আমাকে বশ করার জন্যে মন্ত্রপড়া পানি ছিটাচ্ছে সন্ন্যাসী!

'হাত-পা অসাড় হয়ে এল আমার। মনে হলো, মন্ত্রপড়া পানির জন্যে এ রকম হচ্ছে। গেটের দিকে তাকালাম। বহুদূরে মনে হলো ওটা।

'আরেকটু এগোল সন্ন্যাসী। আবার পানি ছিটাল। বিড়বিড় করে কি বলছে। আর কোন সন্দেহ রইল না, মন্ত্র পড়ছে।

'আল্লাহকে ডাকলাম মনে মনে। হঠাৎ যেন শক্তি পেলাম পায়ে। দিলাম দৌড়।

'লোকটাও এল আমার পিছু পিছু। গেটের কাছে পৌঁছে ফিরে দেখি, আমার একেবারে পেছনে চলে এসেছে। হাত বাড়ালেই ধরে ফেলবে।

'কি ভাবে যে বাইরে বেরিয়ে সাইকেলে চাপলাম, আল্লাহই জানে!'

দুই

'সব তোমার কল্পনা,' সাফ বলে দিল রবিন। 'ভূতকে অতিরিক্ত ভয় পাও তো, অন্ধকারে কিছু দেখলেই ভাবো ভূত। বিলি আরও আজেবাজে কথা বলে বলে তোমার মাথাটাকে গোলমাল করে দিয়েছে।'

মুসাদের বাড়ির বাগানে ছাউনির বাইরে বসে কথা বলছে দুজনে। ফুলের ওপর প্রজাপতি উড়ছে। সেদিকে তাকিয়ে আছে মুসা। 'দেখাটা নাহয় ভুল, কিন্তু পানি? গায়ে পানি পড়ল কোত্থেকে?'

এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারল না রবিন। 'পানি, না অন্য কিছু?'

'পানি। কোন সন্দেহ নেই। আর কি হবে?'

'শিশির হতে পারে। কুয়াশাতেও গা ভেজে।'

চুপ করে গেল মুসা। রবিনের কথায় যুক্তি আছে। রোদ ঝলমলে বাগানে বসে সে নিজেও এখন বিশ্বাস করতে পারছে না যে ভোররাতে ভূতুড়ে কিছু ঘটেছিল। তাহলে কি রবিনের কথাই ঠিক? ভূতের ভয়ে ওর মাথাটা গুলিয়ে গিয়েছিল? আসলে কোন ঘটনাই ঘটেনি, সব তার অতিকল্পনা?

পরদিন ভোর পাঁচটায় কম্বলের নিচের আরাম ত্যাগ করে বিছানা ছাড়ল মুসা। বাইরে তখনও অন্ধকার। সোয়েট শার্ট আর জিনসের প্যান্টটা পরে নিল।

বেরিয়ে দেখে কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। আরও গরম কিছু পরা উচিত ছিল। কিন্তু আর ঘরে ঢুকতে ইচ্ছে করল না।

কিছুতেই সন্ন্যাসীর কথা মাথা থেকে দূর করতে পারছে না। কেবলই ভাবছে, এখন নিশ্চয় ওকে জাদু করার জন্যে মন্ত্র পড়ছে বুড়োটা।

যা করে করুক! না গিয়ে পারবে না। কারণ তিনটে। এক, সন্ন্যাসীকে পত্রিকা না দিলে বেশ কিছু ডলার খসে যাবে লাভের অঙ্ক থেকে। দুই, বিলি একজন গ্রাহক হারাবে। আর তিন, নিজেকে একটা কাপুরুষ মনে হবে ওর। কাপুরুষ হতে চায় না সে।

মনে মনে একটা ফন্দি আঁটল। সবার আগে সন্ন্যাসীর বাড়িতে কাগজ দিতে যাবে। এত আগে যাবে সে, এটা নিশ্চয় ভাববে না বুড়ো। তৈরি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে না মূর্তিগুলোর আড়ালে। হয়তো ফাঁকি দিতে পারবে বুড়োকে।

সোজা ফরেস্ট লেনে রওনা হলো মুসা। এত ঠাণ্ডার মধ্যে ব্যাঙগুলোও গর্ত থেকে বেরোয়নি। গ্যাঁ-গোঁ করছে না। জলাভূমির ওপর কুয়াশার চাদর।

সন্ন্যাসীর আঙিনার মূর্তিগুলো অস্পষ্ট। একটা মূর্তির চোখের জায়গায় রিফ্লেক্টর লাগানো। অন্ধকারেও জ্বলজ্বল করছে। মুসার মনে হলো, একটা দানব যেন নীরবে তাকিয়ে আছে ওর দিকে।

কোনদিকে না তাকিয়ে সোজা গিয়ে বারান্দায় উঠল সে। চাপা দিয়ে রাখল কাগজটা। নেমে এল বারান্দা থেকে।

কিছুই ঘটল না।

আঙিনার কোন মূর্তি নড়ল না।

সাইকেলে উঠল মুসা। ফিরে চলল গাঁয়ের দিকে। কেউ তাড়া করল না।

ফন্দিতে কাজ হয়েছে। ভার নেমে গেল মন থেকে। বাকি পথটা যেন উড়তে উড়তে চলল সে। এক এক করে সব বাড়িতেই কাগজ বিলি করে এল। কোন বিপত্তি ঘটল না। মিসেস ডেনভারের বাড়িতে শুধু দেয়া বাকি।

গেল তাঁর বাড়িতে। আবছা অন্ধকারে বাড়ির পাশ ঘুরে রান্নাঘরের কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

আগের দিন জানালার কাঁচে নাক ঠেকিয়ে কিভাবে তাকিয়ে ছিলেন তিনি, মনে পড়ল মুসার। উবু হয়ে কাগজটা দরজার ফাঁকে ঢোকানোর আগে কাঁচের দিকে তাকাল একবার।

কেউ নেই।

যাক, বাঁচা গেল!

'মুসা, ও মু-সা!' সুর করে বলল কেউ। ইঁদুরের মত কিঁচকিঁচ করে উঠল স্বরটা। তীক্ষ্ণ। আবার বলল, 'মুসা, ও মু-সা!'

ফিরে তাকাল সে। পেছনে দাঁড়িয়ে আছেন মিসেস ডেনভার। ভয়ঙ্কর চেহারা। চোখ নেই। শূন্য কোটর। চামড়ার রঙ মোমের মত ফ্যাকাসে। চোয়ালের চামড়া এতটাই ঢুকে গেছে ভেতরে, দুই গালে দুটো গর্ত হয়ে আছে।

'এদিকে এসো, মুসা!' হাত নেড়ে সুর করে ডাকলেন মিসেস ডেনভার।

এ কিভাবে কথা বলছেন তিনি! হাঁ করে তাকিয়ে রইল মুসা। ধূসর রঙের নাইটগাউন পরনে। ধূসর চুলে জট পাকিয়েছে। এলোমেলো হয়ে আছে। ওকে ধরতে হাত বাড়ালেন। হাড্ডিসার আঙুল, কঙ্কালের মত। এ কোনও স্বাভাবিক মানুষ হতে পারে না। ভূত!

নড়তে পারল না মুসা।

ওর দিকে এগোতে শুরু করল ভূতটা। আঙুল বাঁকা করে গলা টিপে ধরতে এল।

শেষ মুহূর্তে ঝটকা দিয়ে গলা সরিয়ে নিল মুসা। কাগজটা আর দেয়া হলো না। সেটা হাতে নিয়েই ছুটল সাইকেলের দিকে।

সাইকেলে চাপার পর আর পেছন ফিরে তাকাল না।

বাড়ি ফিরে ঘরে ঢুকে দরজার ছিটকানি তুলে দিল। ঝাঁপিয়ে পড়ল বিছানায়। নাকে-মুখে কম্বল মুড়ি দিয়ে ভয় তাড়ানোর চেষ্টা করল।

'মুসা! এই মুসা!'

ডাক শুনে চমকে জেগে গেল সে। মিসেস ডেনভার নাকি!

বিছানার পাশে লিলিকে দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। লিলি ওদের বাড়িতে কাজ করে।

মুসার মা-বাবা বাড়ি নেই। বেড়াতে গেছেন। সঙ্গে নিয়ে গেছেন ফারিহাকে। মুসাকে রেখে গেছেন বাড়ি পাহারা দেয়ার জন্যে।

'মুসা, ওঠো,' লিলি বলল। 'তোমার একজন গ্রাহক ফোন করেছেন। কাগজ দিতে নাকি ভুলে গেছ।'

'কে?'

'মিসেস ডেনভার। এখুনি দিয়ে আসতে বলেছেন।'

তিন

মিসেস ডেনভারের ভয়ানক চেহারাটার কথা মনে পড়তে দমে গেল মুসা। আবার গিয়ে দাঁড়াতে হবে তাঁর সামনে, ভাবতে হৃৎকম্প শুরু হলো। কিন্তু দিতেই হবে কাগজ। অস্বস্তি নিয়ে বেরোল। রোদ ঝলমল করছে। সবুজ পাতা। বাগানে বাগানে ড্যানডেলিয়ন ফুটে আছে। ছায়ার মধ্যে নিঃশব্দ বিচরণ নেই কোন অদ্ভুত অশরীরীর। ভূতুড়ে কুয়াশার চাদর ঝুলে নেই

বাতাসে। পাখি ডাকছে। লোকজন ব্যস্ত হয়ে চলেছে যার যার কাজে। পরিবেশটা মোটেও ভয় পাওয়ার মত নয়।

'ভয় পাচ্ছি কেন অহেতুক!' নিজেকে বোঝাল সে। 'ভোরবেলা কিছু ঘটেনি। সব ছিল চোখের ভুল।'

ধীরে ধীরে প্যাডেল ঘোরাচ্ছে। মনকে বোঝাচ্ছে, ভয়ের কথা বলে বিলি তোমাকে ঘাবড়ে দেয়ার চেষ্টা করেছে। যাতে পত্রিকা দিতে গেলে তুমি ভয়ে আধমরা হয়ে যাও। এটা ওর শয়তানি, স্রেফ শয়তানি। ও তো তোমার সঙ্গে এমনই করে।

একবার স্কুল থেকে ক্যাম্পিং ট্রিপে বনে গিয়েছিল মুসা। বিলি আর তার বন্ধু স্যাডি ছিল ওদের সঙ্গে। রাতে স্লিপিং ব্যাগে ঢুকেছে সবাই। অগ্নিকুণ্ডের আগুন নিভে আসছে। গাছের ফাঁকে ফাঁকে অদ্ভুত কালো ছায়া।

হঠাৎ বিলি বলল, 'মুসা, আঙুল কাটা বেবির গল্প শুনেছিস?'

'না। কে?'

'একটা মেয়ে। পায়ের আঙুল সব কেটে গিয়েছিল।'

'লন মওয়ার দিয়ে বাগানে ঘাস কাটার সময়,' স্যাডি বলল। 'কিছুদিন পর আরেক অ্যাক্সিডেন্টে মারাই গেল সে।'

'এরপর থেকে প্রতি রাতেই বেরোত বেবি,' বিলি বলল। 'ঘুরে ঘুরে দেখত ঘরের বাইরে কেউ রাত কাটাচ্ছে কিনা। হাতে থাকত ফুলগাছ ছাঁটার ইয়া বড় কাঁচি। যদি কাউকে পেত···থাক, আর বলব না। তুই ভয় পাবি।'

গল্পের শেষটা শোনার জন্যে কৌতূহলে ফেটে পড়ল মুসা, 'পেলে পাব। তুমি বলো।'

'কাঁচি দিয়ে ঘ্যাচাং, ঘ্যাচাং, ঘ্যাচাং!' বিলি বলল।

স্যাডি বলল, 'পায়ের আঙুল সব সাফ!'

মুসা বলল, 'আমাকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করছ তোমরা!'

ভয় সত্যি পেয়েছিল ও। মাঝরাতে যখন ঘুম ভেঙে গেল, দেখে কাঁপছে। ঘামে ভিজে গেছে ঘাড়, গলা। কাছেই শব্দ হচ্ছে ঘ্যাচাং, ঘ্যাচাং, ঘ্যাচাং। বেবি আর ওর কাঁচির কথা মনে পড়ল ওর।

ভাল করে শোনার পর বুঝল, শব্দটা ভূতে করছে না। নিশ্চয় ওকে ভয় দেখানোর জন্যে কাঁচি নিয়ে অন্ধকারে ঝোপের ডাল কাটছে বিলি আর স্যাডি।

সেই যে ভয় পেতে দেখেছে ওকে বিলি, তারপর থেকেই পেয়ে বসেছে। সুযোগ পেলেই ভূতের ভয় দেখায়। নানা রকম উদ্ভট ভাবনা ঢুকিয়ে দেয় মাথায়।

ভাবতে ভাবতে পৌঁছে গেল মিসেস ডেনভারের বাড়িতে। দরজার পাশের বেলপুশ টিপে ধরল। তৈরি রইল, যাতে ভূত দেখলেই দৌড় দিতে পারে।

দরজা খুলে দিলেন মিসেস ডেনভার। পুরোপুরি স্বাভাবিক।

'এসো,' সরে জায়গা করে দিলেন তিনি।

ঢুকতে সাহস করল না মুসা। ভূতেরা নানা ছল-চাতুরি জানে। হয়তো স্বাভাবিক মানুষের রূপ ধরে আছেন তিনি এখন। কিন্তু কি বলে মানা করবে?

ভয়ে ভয়ে রান্নাঘরে ঢুকল সে। সাবধান রইল।

'এইমাত্র কেক বানিয়েছি,' মিসেস ডেনভার বললেন। 'গরম গরম কেটে দিচ্ছি, খাও।'

এই রে, আবার খাওয়ার কথা বলে! নিশ্চয় ওষুধ মিশিয়ে দেবেন। যেই খাবে সে, অমনি ভূত হয়ে যাবে।

কেক কেটে দিলেন তিনি। এক গ্লাস দুধও দিলেন।

আড়চোখে নজর রাখল মুসা, খাবারে কিছু মেশান কিনা।

কিন্তু মেশাতে দেখল না। লোভনীয় গন্ধ কেকের। সন্দেহ করার মত কিছু পেল না সে। অতি স্বাভাবিক আচরণ করছেন মিসেস ডেনভার।

চালাকি করে জিজ্ঞেস করল মুসা, 'আজ ভোররাতে আমাকে দেখেছেন?'

'না। সাতটার আগে ঘুম থেকেই উঠি না আমি। কেন?'

'ভোররাতে আমি আপনাকে দেখেছি।'

'তাই নাকি?' হাসলেন মিসেস ডেনভার। 'অন্য কাউকে দেখেছ। অত সকালে উঠিই না আমি।'

'শুনেছি অনেকে ঘুমের মধ্যে হাঁটে।'

'জানি। ওটা একটা রোগ। আমার ওসব নেই।'

তবু দ্বিধা গেল না মুসার। খেতে শুরু করল। এক কামড় খায়, চুপ করে থাকে, দেখে পেটে কোন অস্বস্তি বোধ হচ্ছে কিনা; তারপর আবার কামড় দেয়।

বকবক করে যাচ্ছেন মিসেস ডেনভার। পত্রিকার কোন্ কোন্ খবরগুলো পড়েন তিনি, মিনিটখানেকের মধ্যেই জানা হয়ে গেল মুসার। প্রথমে দুর্ঘটনার খবরগুলোতে চোখ বোলান, তারপর চলে যান রাশিচক্রে। এ বিষয়টা তাঁর ভাল লাগে। তাঁর রাশি লিও, অর্থাৎ সিংহ।

সিংহই হোক, আর মেষই হোক, নাহয় বৃষ; আমার কিছু না—ভাবল মুসা। আমাকে ধরে ভূত না বানালেই আমি খুশি।

কেকটা শেষ করে ফেলল সে। দুধও খেয়ে ফেলল। আরও মিনিট পাঁচেক অপেক্ষা করার পরও যখন কোন ক্ষতি হলো না ওর, বুঝল, খারাপ কিছু মেশাননি মিসেস ডেনভার।

ভোরে পত্রিকা দিতে এসে কেন পালিয়েছিল সে, এ কথাটা আর বলতে পারল না মুসা। কি ভেবে বসেন তিনি, কে জানে!

দেরি করে পত্রিকা দেয়ার জন্যে 'সরি' বলে মিসেস ডেনভারের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল।

বাড়ি ফিরে দেখে ছিপ নিয়ে তৈরি হয়ে বসে আছে রবিন। কাছেই একটা পুকুর আছে, তাতে মাছ ধরতে যাওয়ার কথা। মুসাকে দেখে জিজ্ঞেস করল, 'কি খবর? আজও সন্ন্যাসীর তাড়া খেয়েছিলে নাকি?'

'না। ফাঁকি দিয়েছি আজ তাকে।'

'তাই নাকি। চলো, পুকুর পাড়ে গিয়েই শুনব।'

মিসেস ডেনভারের ভূত হওয়ার কথাটা রবিনের কাছে চেপে গেল মুসা। যদি বিশ্বাস না করে? হয়তো হাসাহাসি করবে। সেটা ভাল লাগবে না তার। নিজেরও এখন মনে হতে লাগল, ব্যাপারটা কল্পনাই ছিল।

চমৎকার আবহাওয়ায় দুপুর পর্যন্ত মাছ ধরল ওরা। বিকেলে বেজবল খেলতে গেল পাড়ার মাঠে।

পরদিন ভোররাতে অন্ধকার থাকতে যথারীতি সাইকেল নিয়ে বেরোল মুসা। ভূতের ভয় তাড়ানোর জন্যে অন্য চিন্তায় মগ্ন রাখল মনকে। কল্পনা করে নিল, সে একজন স্পাই। মোটর সাইকেলে চেপে চলেছে। ঢুকে পড়েছে শত্রু এলাকায়। ওর কাজ শত্রুর আক্রমণের পরিকল্পনা জেনে নিয়ে রেডিওতে হেডকোয়ার্টারকে জানিয়ে দেয়া। ভীষণ বিপদের মধ্যে আছে সে। ধরা পড়লে নিশ্চিত মৃত্যু। সুতরাং সাবধান থাকতে হচ্ছে।

আগের দিন প্রথমে গেছে সন্ন্যাসীর বাড়িতে—ফাঁকিটা ধরতে পেরে যদি আগেভাগেই তৈরি হয়ে বসে থাকে সে, তাই সেদিন প্রথম গেল মিসেস ডেনভারের ওখানে। কিছু ঘটল না। সবশেষে গেল সন্ন্যাসীর বাড়িতে। সেখানেও কিছু ঘটল না।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল মুসা। নিজেকে বলল, দেখলে তো? ভূতফুত কিছু না। সব তোমার কল্পনা ছিল। বিলি তোমার মাথাটা খেয়েছিল। আজ সজাগ রয়েছ, তাই ভূত কল্পনা করোনি।

কাগজ দেয়া শেষ, আর ঘুরপথে যাওয়ার কোন মানে হয় না। শর্টকাট ধরল সে। সুপারমার্কেটের পেছনে পার্কিং লটের ভেতর দিয়ে যাওয়ার পথ আছে। জায়গাটা মাঠের মত। ছুটির দিনে গাড়ি না থাকলে পাড়ার ছেলেরা ওখানে ফুটবল খেলে। সাইকেল রেসের প্রতিযোগিতা করে।

এত ভোরে দোকানপাট সব বন্ধ। একটা স্টোরের কোণ ঘুরে অন্যপাশে আসতেই বিচিত্র শব্দ কানে এল—কঁচাক! কামড় দিয়ে কাঁচা শসা কেটে নিলে যে রকম আওয়াজ হয়, অনেকটা সেরকম।

কৌতূহল হলো মুসার। প্যাডেল ঘোরানো বন্ধ করে দিল।

আবার হলো শব্দটা। কঁচাক! কঁচাক!

থেমে গেল সে।

মনে হলো ফিসফিস করে ওর নাম ধরে ডাকল কেউ।

ভয় পেয়ে গেল। মাথা ঝাড়া দিল। মগজে গোলমালটা শুরু হলো নাকি? অতি-কল্পনা করছে?

আবার শোনা গেল ফিসফিস। না, ওকে ডাকছে না। শব্দটা অনেকটা সাপের ফোঁসফোঁসের মত। তারপর আবার সেই কঁচাক!

চারকোনা বড় একটা ডাস্টবিন রাখা হয়েছে মার্কেটের কোণে। তার ওপাশ থেকে আসছে শব্দটা। বেওয়ারিস বেড়ালে ময়লা-আবর্জনা খাচ্ছে হয়তো। কিন্তু ফোঁসফোঁস করছে কিসে?

সাইকেল থেকে নামল সে। স্ট্যান্ডে দাঁড় করিয়ে রেখে পা বাড়াল ডাস্টবিনের দিকে।

কঁচাক! কঁচাক! আবার হলো শসা কামড়ানোর মত শব্দ।

ডাস্টবিন ঘুরে অন্যপাশে চলে এল সে।

বেড়াল নয়। ফ্র্যাঙ্ক হেয়ার। দিনে সুপারমার্কেটে এক মুদী দোকানে সেলসম্যানের কাজ করে সে, রাতে মার্কেট পাহারা দেয়। ঘুমায় কখন, এটা চিরকাল একটা রহস্য মুসার কাছে। পার্কিং লটে ছেলেদের খেলতে দেখলেই যেন মাথা খারাপ হয়ে যায় তার। বাধা তো আর দিতে পারে না, খালি বাগড়া দেয়। সেজন্যে গাঁয়ের কোন ছেলে দেখতে পারে না ওকে।

কিন্তু এ কি অবস্থা হয়েছে হেয়ারের। বীভৎস! ভয়ঙ্কর!

মুখটাই শুধু মানুষের। কালো পাকানো গোঁফ, ঝোপের মত ভুরু, চকচকে টাক, সব ঠিক আছে; কিন্তু গলার নিচে মানুষের শরীরটা নেই। মানুষের তিন গুণ লম্বা সবুজ রঙের বিশাল এক শুঁয়াপোকার দেহ। ডাস্টবিনের কিনারে পড়ে থাকা জঞ্জাল খাচ্ছে।

পায়ের শব্দে থেমে গেল দানবটা। আস্তে মাথা ঘুরিয়ে তাকাল। নিঃশ্বাস ফেলার সময় ফোঁস ফোঁস শব্দ করছে।

দম আটকে আসছে মুসার।

ওকে দেখে কুৎসিত হাসি ফুটল দানবটার মুখে। লাল টকটকে জিভ বের করে ঠোঁট চাটল। হাঙরের দাঁতের মত ত্রিকোণ, ভয়াবহ দুই সারি দাঁত দেখা গেল। টপ টপ করে লালা ঝরল।

শিউরে উঠল মুসা।

শুঁয়াপোকার মত শরীর বাঁকিয়ে কিলবিল করে ওর দিকে এগোতে শুরু করল দানবটা।

চার

দৌড় দেয়ার প্রবল ইচ্ছে হচ্ছে মুসার। কিন্তু কথা শুনছে না যেন পা। অনড় হয়ে গেছে।

এগিয়ে আসছে শুঁয়া-মানব। ভয়াল দাঁতের ফাঁক দিয়ে ফোঁস ফোঁস শব্দ বেরোচ্ছে। কামড় মারল বাতাসে। শব্দ হলো, কঁচাক!

ঘোরের মধ্যে যেন অনেক কষ্টে একটা পা টেনে তুলল মুসা। তারপর আরেকটা। পিছিয়ে গেল এক পা।

এগিয়ে আসছে ওটা।

দৌড়াতে শুরু করল সে। ফিরে তাকাল কাঁধের ওপর দিয়ে।

গতি বাড়িয়ে দিয়েছে দানবটা। শুঁয়াপোকার মত পিঠ বাঁকিয়ে বাঁকিয়ে বুকে হেঁটে ছুটে আসছে।

সাইকেলের কাছে পৌঁছল মুসা। হ্যান্ডেল ধরে ঠেলা দিয়ে স্ট্যান্ড থেকে নামাল। প্যাডেলে পা রেখে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াতেই চেন গেল খুলে।

খোলার আর সময় পেল না! তাড়া থাকলেই খোলে বেশি, বহুবার দেখেছে সে।

কঁচাক! কঁচাক!

ফিরে তাকাল সে।

বিশাল হাঁ করে রেখেছে দানবটা। দাঁত বেরিয়ে আছে। মুসা তাকাতে আবার কামড় মারল বাতাসে।

কঁচাক!

ওই ভয়ঙ্কর দাঁতের আওতায় পড়লে কি অবস্থা হবে, কল্পনা করতে চাইল না মুসা। চেন লাগাতে বসল। পেছনের চাকাটা উঁচু করে, স্প্রোকেটে চেন বসিয়ে প্যাডেল ঘোরাল।

পেছনে তাকানোর সময় নেই। বুঝতে পারছে, আসছে ওটা। মোটা তুলতুলে শরীর মাটিতে ঘষা লাগার শব্দ হচ্ছে।

ঠিকমত বসেনি চেন। প্যাডেল ঘোরাতেই কাঁটা থেকে খুলে পড়ে গেল আবার।

ওহ্, খোদা!

ফিরে তাকানোর সাহস হচ্ছে না আর। কতটা কাছে চলে এসেছে দেখতে চায় না মুসা। শুনতে পাচ্ছে ওটার এগিয়ে আসার শব্দ।

আবার স্প্রোকেটে বসাল চেন। প্যাডেল ঘোরাল।

টানটান হয়ে গেল চেন, ঘুরতে শুরু করল পেছনের চাকা।

বসেছে।

হ্যাণ্ডেল ধরে ঠেলা দিয়ে একলাফে সীটে চড়ে বসল সে। একেবারে কাছে চলে এসেছে দানবটা। নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ নাকে আসছে। মাংস পচা তীব্র গন্ধ।

ফিরে তাকাল মুসা।

বিকট হাঁ করে কামড় বসাল দানবটা।

কঁচাক!

অল্পের জন্যে মিস করল মুসার পা। আবার হাঁ করল।

প্রাণপণে প্যাডেল ঘোরাচ্ছে মুসা। সরে যাচ্ছে নাগালের বাইরে। কঁচাক কঁচাকও পেছনে পড়ছে।

ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল শব্দ। হাঁপ ছাড়ল ও।

বাড়ি ফিরে সোজা নিজের ঘরে ঢুকল মুসা। বিছানায় শুয়ে ভাবতে লাগল, রবিন কি বলবে? এবারও হাসাহাসি করবে? বলবে মতিভ্রম ঘটেছিল ওর?

ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ল মুসা।

ঘুম ভাঙল অনেক দেরিতে। বাগানের উজ্জ্বল রোদে বেরিয়ে এসে নিজেরই বিশ্বাস হতে চাইল না যে দানবের পাল্লায় পড়েছিল। ভাবল, আচ্ছা, এমন হয়নি তো, কাগজ দেয়া শেষ করে নিরাপদেই বাড়ি ফিরেছি আমি?

শোয়ার পর ঘুমের মধ্যে দুঃস্বপ্নে ঘটেছে ঘটনাটা?

কিছুক্ষণ পর রবিন এল। জিজ্ঞেস করল, 'আজ কিছু দেখেছ?'

'বিশ্বাস করবে না।'

'বলোই না।'

হেয়ারের দানব হওয়ার ঘটনাটা বলল মুসা। ওকে অবাক করে দিয়ে হাসল না রবিন। গম্ভীর হয়ে বলল, 'আমি জানি, কি ঘটছে।'

'তারমানে তুমি বিশ্বাস করেছ!'

'আর না করার কোন কারণ নেই। কাল রাতে ব্ল্যাক ম্যাজিকের ওপর লেখা একটা বই পড়ে অনেক কিছু জেনেছি। আগের কালে ডাইনীরা নাকি মানুষকে তুক করত। বিদ্যেটা শিখে নিলে আজও এ সব করা যায়। তোমার কথা আর হেসে উড়িয়ে দেয়া যাচ্ছে না। সব নষ্টের মূলে ওই সন্ন্যাসীটা, বিলি ঠিকই বলেছে। মানুষকে জাদু করছে সে। ভূত-প্রেত, দানব, যা ইচ্ছে বানিয়ে দিচ্ছে। তুমি ভুল দেখোনি।'

'তবে কি একেক দিন একেকজনকে ভূত বানাচ্ছে সে?'

'তাই হবে। আমার বিশ্বাস, রাতের বেলা জেগে থাকে সন্ন্যাসী। বসে বসে জাদুটোনা করে। রাতেই কেবল কাজ করে তার মন্ত্র। দিনের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রের জোর নষ্ট হয়ে যায়। যাকে জাদু করা হয় সে আবার তখন স্বাভাবিক মানুষ হয়ে যায়।'

'জাদুটা কিভাবে করে, তোমার বইতে কিছু লিখেছে?'

'লিখেছে। সেদিন তোমার গায়ে পানি ছিটিয়েছিল যে, ওটা মন্ত্রপড়া পানি। তুমি সাবধান ছিলে বলে, ভূত হয়ে যেতে পারো এটা জানা ছিল বলে কাজ করেনি ওই পানি। নইলে কখন ভূত হয়ে যেতে!'

দুজনে মিলে সন্ন্যাসীর বাড়িতে তদন্ত করতে যাবে, ঠিক করল ওরা। দিনের বেলা যাওয়াই নিরাপদ। মন্ত্র কাজ করে না তখন। ওদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না বুড়ো।

সাইকেল নিয়ে বেরোল দুজনে। দিনের আলোয় সন্ন্যাসীর কুঁড়েটাকে মোটেও ভূতুড়ে লাগল না। অতি সাধারণ একটা ঘর। আঙিনায় দাঁড় করানো মূর্তিগুলো অদ্ভুত তো নয়ই, বরং হাস্যকর। নানা রকম বাতিল জিনিস দিয়ে বানানো। একটা মূর্তির মাথায় পুরানো একটা সান্টা ক্লজ হ্যাট বসিয়ে দেয়া হয়েছে। সেটা আরও হাস্যকর।

'ওটার আড়ালে লুকিয়ে ছিল সেদিন সন্ন্যাসী,' মুসা বলল। 'সেজন্যেই দেখতে পাইনি।'

'মূর্তি না ছাই! ঘোড়ার ডিম বানিয়েছে এগুলো,' রবিন বলল। 'এসো, ঢোকা যাক।'

ঢোক গিলল মুসা, 'ঢুকব?'

'ভয় পাচ্ছ?'

'না!' কণ্ঠের অস্বস্তি চাপা দিতে পারল না মুসা।

গেট খুলে ভেতরে ঢুকল দুজনে। রবিনের অজান্তে দোয়া পড়ে বুকে ফুঁক

দিল মুসা। একটা মূর্তির বাড়িয়ে রাখা হাত ধরে টান মারল রবিন। খুলল না হাতটা। শক্ত করে লাগানো।

দরজার দিকে কড়া নজর মুসার। সন্ন্যাসীকে বেরোতে দেখলেই দেবে দৌড়।

বেরোল না বুড়ো।

বাড়ির চারপাশে তন্নতন্ন করে খুঁজতে লাগল ওরা। আঙিনার এককোণে স্তূপ করে রাখা লোহালক্করের নিচ থেকে একটা ছোট পুতুল টেনে বের করল রবিন। পুতুলটার বেশির ভাগ চুল উপড়ানো। নষ্ট হয়ে যাওয়ায় ফেলে দিয়েছিল কোন ছোট্ট মেয়ে। কুড়িয়ে নিয়ে এসেছে সন্ন্যাসী।

গম্ভীর হয়ে গেল রবিন। বলল, 'মনে হচ্ছে ভুডু প্রয়োগ করা হয়েছে এর ওপর।'

'ভুডু আবার কি?'

'এক ধরনের বিদ্যা। আফ্রিকার ওঝারা শেখে। খুব খারাপ মন্ত্র। যাকে তুক করতে চায় তার নাম করে মন্ত্র পড়ে পুতুলের গায়ে পিন ফুটিয়ে দেয়। ভয়ানক যন্ত্রণা শুরু হয় মানুষটার। পুতুলের যে সব জায়গায় পিন ফোটায় মানুষটাও সেসব জায়গায় ব্যথা পায়। বুকে ফোটালে মরেই যায়।'

'সর্বনাশ! কে বলল তোমাকে?'

'বইটাতে লিখেছে।'

পেছনের দরজার কাছে এক বালতি পানি রাখা। মুসা ফিরেও তাকাল না। কিন্তু ভুরু কুঁচকে ফেলল রবিন। ফিসফিস করে বলল, 'হাতের কাছে পানি রাখে। দরকার পড়লেই যাতে ছিটাতে পারে। হাতে নিয়ে মন্ত্র পড়ে ফুঁক দেয়, তারপর ছিটায়। লোকটা শয়তানের পূজা করে, কোন সন্দেহ নেই আর।'

সামনের বারান্দায় আরেক বালতি পানি দেখা গেল। মুসা যেখানে পত্রিকা রেখে যায়, তার কাছে।

বুড়োকে না দেখে রবিন বলল, 'সারারাত শয়তানি করে নিশ্চয় এখন ঘুমিয়ে আছে। যা দেখার তো দেখলাম। চলো, জেগে ওঠার আগেই কেটে পড়ি।'

পা টিপে টিপে বারান্দা থেকে নামল দুজনে। গেটের দিকে এগোল। মুসা তো আগে থেকেই ভয় পাচ্ছিল। পানি, পুতুল এ সব জিনিস রবিনেরও ভয় ধরিয়ে দিল। সাইকেলে চেপে তাড়াতাড়ি কুঁড়ের কাছ থেকে সরে এল ওরা।

বাড়ি ফেরার পথে রবিন বলল, 'চলো, সুপারমার্কেট হয়ে যাই। একটা জিনিস দেখতে হবে।'

মার্কেটের কাছে অতি স্বাভাবিক দৃশ্য, অন্যান্য দিন যেমন দেখা যায়। লোকজন আসছে-যাচ্ছে, দোকানে ঢুকে জিনিসপত্র কিনছে। কোথাও কোন গণ্ডগোল চোখে পড়ল না মুসার।

'কোন্ ডাস্টবিনটার কাছে দেখেছ?' জানতে চাইল রবিন।

দেখিয়ে দিল মুসা।

পার্কিং লটের বাইরে সাইকেল রেখে মার্কেটের পাশ ঘুরে পেছন দিকে এগোল দুজনে।

'কি দেখবে?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'দেখব দানবটা কোন চিহ্ন রেখে গেছে কিনা।'

ডাস্টবিনের কাছে এসে দাঁড়াল দুজনে। নিচের দিকে তাকিয়ে চমকে গেল মুসা। গোল একটা ফোকর হয়ে আছে। আশেপাশে দাঁতের দাগ। ধাতু কেটে ছিদ্র করে ডাস্টবিন থেকে খাবার বের করে খেয়েছে দানবটা।

রোদের মধ্যেও শীত করতে লাগল মুসার। মেরুদণ্ডে শিরশিরে অনুভূতি। ওর পা কামড়ে দিতে চেয়েছিল ওটা। লাগলে কি অবস্থা হত ভেবে শিউরে উঠল। বিড়বিড় করে কি বলল বোঝা গেল না।

চুপ করে তাকিয়ে আছে রবিন। বিশ্বাস করতে পারছে না যেন।

'অ্যাই!' কর্কশ কণ্ঠে ডাকল কেউ।

ধড়াস করে এক লাফ মারল মুসার হৃৎপিণ্ড।

ভীষণ চমকে গিয়ে লাফিয়ে উঠল রবিন।

ফিরে তাকাল দুজনে। কালো পাকানো গোঁফ, চকচকে টাক চোখে পড়ল।

'এখানে কি?' জিজ্ঞেস করল হেয়ার। জবাব না পেয়ে আবার খেঁকিয়ে উঠল, 'অ্যাই! কথা বলছ না কেন?'

পাঁচ

সাধারণত মুসার সঙ্গে দৌড়ে পারে না রবিন। কিন্তু সেদিন পারল। উড়ে চলল যেন সে। মুসার আগে সাইকেলের কাছে পৌঁছে গেল। স্ট্যান্ড থেকে ঠেলা দিয়ে নামিয়ে চড়ে বসল সীটে।

ফিরে তাকাল মুসা। কোমরে হাত দিয়ে এদিকে তাকিয়ে আছে হেয়ার। পরনে সবুজ শার্ট-প্যান্ট। অস্বাভাবিক কিছু নেই এখন ওর মধ্যে।

মুসা তাকাতে আঙুল নেড়ে শাসাল। এ রকমই করে। দোকানের কাছে কোন ছেলেমেয়েকে অহেতুক ঘুরঘুর করতে দেখলে যেন মাথায় বাজ পড়ে। তেড়ে আসে। ধরতে না পারলে দূর থেকে শাসায়।

ডাকল মুসা, 'রবিন, দাঁড়াও। হেয়ার এখন স্বাভাবিক মানুষ।'

কিন্তু রবিনের কানে কথা ঢুকল বলে মনে হলো না। প্যাডেল ঘোরানো শুরু করেছে।

আরও জোরে ডাকল মুসা, 'অ্যাই, রবিন, দাঁড়াও না!'

সাইকেল থামিয়ে মাটিতে এক পা রেখে ফিরে তাকাল রবিন।

মুসা বলল, 'অহেতুক ভয় পেয়েছি। হেয়ার এখন স্বাভাবিক মানুষ।'

'কে বলল স্বাভাবিক?'

'তাই তো। দেখছ না?'

'দেখছি তো। তাতে কি? দিন বলে মানুষের রূপ ধরেছে। কিন্তু আসলে দানব। ধরতে পারলে ছাড়ত না, কচ কচিয়ে চিবিয়ে খেত।'

'তুমি না বললে দিনের বেলা মন্ত্রের জোর থাকে না?'

চিন্তায় পড়ে গেল রবিন। মাথা চুলকাল। 'তাও তো বটে। দাঁড়ালে কেন? ওর সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছে নাকি?'

'মাথা খারাপ! ডাস্টবিনের ওই ছিদ্র দেখার পর আরও কি ওর কাছে ঘেঁষি!'

এত তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে করল না ওদের। ফ্রেডের পিজা শপে গিয়ে খানিকক্ষণ ভিডিও গেম খেলল। কিন্তু ভাল লাগল না। খেলায় মন বসাতে পারল না। স্ক্রিনের নকল দানবগুলোকে কামান দেগে মেরে আজ আর কোন মজা পাচ্ছে না। আসল দানবের পাল্লায় পড়েছে ওরা। বুঝতে পারছে, ভয়ানক বিপদ ঘনিয়ে আসছে গাঁয়ের ওপর। বাঁচতে চাইলে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দমন করতে হবে ওগুলোকে।

কিন্তু কিভাবে করবে? উপায়টা কি?

বাড়ি ফেরার পথে রবিন বলল, 'এহ্, এ সময় কিশোর থাকলে ভাল হত। ও যে কেন আসছে না!'

'হয়তো কোথাও বেড়াতে চলে গেছে। দেখি, আর কটা দিন। আমরা কোন সমাধান করতে না পারলে ওকে একটা চিঠি লিখে দেব।'

'ভাবছি, কাল ভোরে আমিও যাব তোমার সঙ্গে। নিজের চোখে ভূত দেখতে চাই। আসল ভূত, না কেউ শয়তানি করছে, সেটা বোঝা দরকার।'

খুশি হলো মুসা। 'এত ভোরে উঠতে পারবে?'

'পারব।'

পরদিন সকালে রবিনই এসে মুসাকে ডেকে তুলল।

রাতে ঝড়বৃষ্টি হয়েছে খুব। মাঝে মাঝে বজ্রপাতের শব্দে ঘুম ভেঙেছে মুসার। বিদ্যুতের চমক দেখেছে। জানালার শার্সিতে বৃষ্টির ফোঁটার আওয়াজ শুনেছে। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে যাওয়ায় আবার ঘুম আসতে দেরি হয়েছে বলে সময়মত জাগতে পারেনি। রবিন না এলে উঠতে দেরি হয়ে যেত।

বাইরে বেরিয়ে দেখল, কুয়াশা আগের রাতের চেয়ে ঘন।

সঙ্গী থাকায় অন্য দিনের মত অতটা ভয় পাচ্ছে না মুসা। দুজন হওয়ায় আরও একটা সুবিধে হলো, কাগজ বিলি করার কাজটা এগোল দ্রুত। রাস্তায় সাইকেল রেখে দুজনে দুটো পত্রিকা নিয়ে দুদিকে চলে যায়, দুই বাড়িতে দিয়ে আসে।

মিসেস ডেনভারের বাড়িতে একসঙ্গে ঢুকল ওরা। কিন্তু ভূত দেখল না।

পিয়ানো শেখান যে মিস পিয়ার, তিনি ভাড়া থাকেন হফ ব্রেকারের বাড়িতে। বাড়ির একপাশে একটা কাঠের সিঁড়ি আছে। সেটা বেয়ে ওপরে উঠলে সামনে একটা দরজা পড়বে, ওটা মিস পিয়ারের ঘর।

ওপরে উঠে দরজার নিচ দিয়ে ঘরের ভেতর পত্রিকা ঠেলে দিল মুসা। নেমে আসতে যাবে, এই সময় একটা শব্দ কানে এল। আহ্ আহ্ করে গোঙাচ্ছে কে যেন!

দাঁড়িয়ে গেল মুসা। বাতাসের শব্দ নয় তো?

আরেক ধাপ নামল সে। সামান্য মড়মড় করে উঠল নড়বড়ে সিঁড়ি।

'আহ্!' আবার শব্দ।

আবার দাঁড়িয়ে গেল মুসা। কান পাতল। গোঙানিটা মনে হলো মিস পিয়ারের ঘর থেকে আসছে।

ঢোক গিলল মুসা। ফিরে গিয়ে দেখবে কিনা দ্বিধা করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত কৌতূহলের জয় হলো। ওপরে উঠে এল আবার। ঠেলা দিল দরজায়। শব্দ হলো। ভেতর থেকে ডাক এল, 'কে?'

'আমি, মুসা। কাগজ দিতে এসেছি।'

'এসেছ, দিয়ে চলে যাও। ধাক্কাধাক্কি করছ কেন?'

'কাকে যেন গোঙাতে শুনলাম।'

'আমিই গোঙাচ্ছি। দাঁত ব্যথা করছে।'

'ও। সরি। কিছু করা লাগবে? ডাক্তার-টাক্তার?'

'না, ধন্যবাদ। বেলা হোক, আমি নিজেই যাব ডেন্টিস্টের কাছে।'

নিচে নামল মুসা। সাইকেলের দিকে এগোল।

উদ্বিগ্ন হয়ে অপেক্ষা করছে রবিন। 'কি হলো? এত দেরি?'

কি হয়েছে, বলল মুসা।

হতাশ মনে হলো রবিনকে। 'তারমানে আজ আর ভূত বেরোবে না! পর পর কয়েক রাত জেগে বোধহয় ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে সন্ন্যাসী। কাউকে আজ জাদু করতে পারেনি।'

'হবে হয়তো। চলো। কি করছে, গেলেই দেখতে পাব।'

বেশির ভাগ বাড়িতে কাগজ দেয়া হয়ে গেছে। সন্ন্যাসী আর ফগকে দিতে পারলেই শেষ।

ফরেস্ট লেনের দিকে এগোল দুজনে।

সন্ন্যাসীর বাড়ি যাওয়ার পথে পড়ে গাঁয়ের পুলিশ কনস্টেবল হ্যারিসন ওয়াগনার ফগর্যাম্পারকটের বাড়ি। ওকে পছন্দ করে না গোয়েন্দারা। সেও দুচোখে দেখতে পারে না ওদের। নিজেকে খুব বুদ্ধিমান ভাবে। বড় বড় কথা বলে, অথচ কাজের কাজ কিছু করতে পারে না বলে গাঁয়ের লোকেও তাকে তেমন পাত্তা দেয় না। একটা মুদ্রাদোষ আছে তার, কথায় কথায় খালি বলে 'ঝামেলা!'

আগে যে বাড়িটাতে থাকত সেটাতে অসুবিধে হওয়ায় ছেড়ে দিয়ে গাঁয়ের ধারে ছোট আরেকটা হলুদ বাড়িতে উঠেছে সে। বিলির গ্রাহক।

পত্রিকা দিতে তার বাড়িতে ঢুকল মুসা আর রবিন। সাইকেলের ক্যারিয়ার থেকে একটা পত্রিকা খুলে নিয়ে মুসা গেল সদর দরজার দিকে। দাঁড়িয়ে রইল রবিন।

খুট করে একটা শব্দ হলো। পাশ ফিরে তাকাল রবিন। একধারে ছাউনির মধ্যে শব্দটা হয়েছে।

আবার হলো শব্দটা। বিড়বিড় করে কে যেন কিছু বলল। কৌতূহল হলো ওর। পায়ে পায়ে এগোল সেদিকে।

পত্রিকা দিয়ে মুসা বারান্দার দরজার কাছ থেকে নেমে এল। হাত নেড়ে ডাকল রবিন, 'দেখে যাও!'

'কি দেখব? দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

'আরে এসো না!'

এগিয়ে গেল মুসা।

নীরবে হাত তুলে দেখাল রবিন।

ছাউনির দরজার একপাশে একটা বৃত্ত আঁকা। ভেতরে রেখা টেনে টেনে ভাগ করা হয়েছে কয়েকটা। তার মধ্যে বিচিত্র সব অক্ষরে কি যেন লেখা।

'আমার কি মনে হয় জানো...'

কথা শেষ হলো না রবিনের। ঝটকা দিয়ে খুলে গেল ছাউনির দরজা। ভেতরে শোনা গেল চিৎকার, 'ঝামেলা! আহ্, ঝামেলা!'

ছাউনির ভেতরের আবছা অন্ধকারে নড়ে উঠল কি যেন!

ছয়

হাঁ হয়ে গেছে রবিন। ছাউনির অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে একটা মূর্তি। আস্তে করে ডাকল, 'মিস্টার ফগর‍্যাম্পারকট!'

বেরিয়ে এল ফগ। মাথায় হেলমেট। মুখটা শিম্পাঞ্জীর মত হয়ে গেছে। পরনে পুলিশ কনস্টেবলের ইউনিফর্ম। আঁটো করে পরা বেল্ট ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে বিশাল ভুঁড়ি। রোমশ হাত। থাবার উল্টো পিঠে বড় বড় কাঁটা। হনুমানের লেজের মত বড়সড় একখানা লেজও গজিয়েছে পেছনে।

ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলছে সে। ভূত হয়ে গেছে বেচারা ফগ। লেজটাকে এপাশ ওপাশ দুলিয়ে চিৎকার করে উঠল, 'হল্ট! কে যায়! হ্যান্ডস আপ! আহ্, ঝামেলা!'

রবিনের কানের কাছে ফিসফিস করে বলল মুসা, 'বাঁচতে চাইলে পালাও!'

হাঁ করে তাকিয়ে আছে রবিন। মুসার কথা যেন শুনতে পায়নি। হাত ধরে টানল মুসা। তবু নড়ল না রবিন।

'হল্ট! কে যায়! ঝামেলা!' হাঁক ছাড়ল ফগ।

রবিনের হাত ধরে হ্যাঁচকা টান মারল মুসা। এতক্ষণে যেন হুঁশ হলো ওর। ড্রাইভওয়ে ধরে ছুটল। গেটের বাইরে রেখে এসেছে সাইকেল।

শিম্পাঞ্জীর মত তিড়িং করে এক লাফ মারল ফগ। ডিগবাজি খেল

মাটিতে। তেড়ে এল বানরের মত লাফাতে লাফাতে। চিৎকার করছে, 'হল্ট! গুলি করব!'

একটানে সাইকেলটা সোজা করে লাফ দিয়ে চড়ে বসে ফিরে তাকাল মুসা।

ড্রাইভওয়ে দিয়ে লাফাতে লাফাতে ছুটে আসছে ফগ। লেজটা ঝাঁকি খাচ্ছে ওপরে-নিচে। দু'হাত সামনে বাড়ানো। ধরতে আসছে।

চিৎকার করে রবিনকে বলল মুসা, 'জলদি ভাগো!'

সাইকেলের পেছন পেছন ছুটে আসতে লাগল ফগ। প্রাণপণে চালিয়েও শুধুমাত্র ওর নাগালের বাইরে থাকতে পারছে গোয়েন্দারা। গতি সামান্যতম কমালেই ধরে ফেলবে।

'হল্ট! হল্ট! ঝামেলা! ঝামেলা!' করছে ফগ। ভূত হয়ে গিয়ে তার 'ঝামেলা' বলার পরিমাণ আরও বেড়ে গেছে। পেছনে বানরের লেজের মত নাচানাচি করছে লম্বা লেজটা।

আর কোন দিকে যাওয়ার পথ না দেখে ফরেস্ট লেনের দিকে ছুটল দুজনে। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নেমে গেছে এখানে পথ। তাতে পড়ে সাইকেলের গতি অনেকটা বেড়ে গেল। কিছুটা পিছিয়ে পড়ল ফগ। কিন্তু থামল না। একতালে এগিয়ে আসতে লাগল। যতবার পেছনে তাকায় ওরা, চোখে পড়ে হেলমেটের নিচে শিম্পাঞ্জীর মুখটা।

হুশ্‌শ্‌ করে শব্দ হলো। চমকে গেল মুসা। নতুন কোন ভূত নাকি! দেখার জন্যে ফিরে তাকাল।

ককিয়ে উঠল রবিন, 'চাকা পাংচার! আমি এবার মরব!'

'নেমে এসে আমারটায় ওঠো! জলদি!'

লাফ দিয়ে মুসার সাইকেলের ক্রসবারে উঠে বসল রবিন। গায়ের জোরে প্যাডেল চাপতে লাগল মুসা। পেছনে একঘেয়ে চিৎকার করছে ভূতটা, 'হল্ট! ঝামেলা! আহ্, ঝামেলা!'

'এসে গেছে তো!' চেঁচিয়ে উঠল রবিন। 'আরও জোরে চালাও!'

'এর চেয়ে জোরে আর পারছি না!'

সন্ন্যাসীর কুঁড়েটা দেখা যাচ্ছে। দরজা খোলা।

'ওখানেই ঢুকব,' মুসা বলল।

'মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি তোমার?'

'আর কোন উপায় নেই। বাইরে থাকলে ধরে ফেলবে।'

ফিরে তাকাল রবিন। কাছে এসে গেছে ফগের ভূত। আর তর্ক করল না। মুসা যা করছে করুক।

গেটের কাছে এসে ব্রেক কষল মুসা। লাফ দিয়ে নেমে গেল রবিন। মুসাও নেমে পড়ল। সাইকেল স্ট্যান্ডে তোলারও সময় নেই। বেড়ার গায়ে কোনমতে ঠেস দিয়ে দাঁড় করিয়ে রেখে ঢুকে গেল গেটের ভেতর। একদৌড়ে উঠান পার হয়ে এসে ঢুকল কুঁড়েতে—সে আগে, রবিন পেছনে। দড়াম করে লাগিয়ে দিল পাল্লা।

অন্ধকার ঘর। একধারে একটা জানালা দিয়ে অতি সামান্য আলো আসছে। ওটার কাছে গিয়ে বাইরে উঁকি দিল মুসা।

গেটের কাছে রাস্তায় বানরের মত লাফাচ্ছে ভূতটা। লেজটা নাচছে, বাড়ি খাচ্ছে মাটিতে।

'ভয় নেই। কাছে আসতে পারবে না আর,' অন্ধকার থেকে কথা শোনা গেল।

সন্ন্যাসী! এককোণে একটা চেয়ারে বসে আছে। আবছামত দেখা গেল তাকে।

ও, এই তাহলে কারণ!—ভাবল মুসা। এ জন্যেই ওদের তাড়া করেছে ফগের ভূত। ধরতে চায়নি আসলে, তাড়িয়ে নিয়ে এসেছে সন্ন্যাসীর বাড়ির কাছে, যাতে উপায় না দেখে তার ঘরে ঢুকে পড়ে ওরা। ওদের ধরবে এখন সন্ন্যাসী! বশ করবে। তারপর আরামসে রসিয়ে রসিয়ে খাবে টমেটোর সস দিয়ে। বিলি তাহলে ঠিকই বলেছে।

'ভয়ের কিছু নেই,' সন্ন্যাসী বলল। 'কি করে ওদের কাবু করতে হয়, জানা আছে আমার।'

'কাদের?' জিজ্ঞেস করল মুসা। গলা শুকিয়ে কাঠ। কথা বলতে পারছে না ঠিকমত।

'ওই ওরা! ভূত-প্রেত, দৈত্য-দানব, যাই বলো। পানিকে ভয় পায় ওরা। পানি হলো একমাত্র ওষুধ।'

'আমার গায়ে পানি ছিটিয়েছিলেন কেন সেদিন? আমাকেও ভূত ভেবেছিলেন নাকি?'

'সরি। তাই ভেবেছিলাম। অন্ধকারে ঠিক বুঝতে পারিনি তুমি ভূত না মানুষ। রোজ দেখি বিলিকে, সেদিন দেখলাম তোমাকে। অচেনা ছেলে দেখেই সন্দেহ হলো। তাড়াতাড়ি মগে করে পানি নিয়ে গিয়ে লুকালাম মূর্তির আড়ালে। পানির ছিটা দিতে তুমি থমকে যাওয়ায় সন্দেহটা আরও জোরাল হলো যে তুমি ভূতই।'

'এদিকে আমরা সন্দেহ করেছি আপনাকে। ভেবেছি, প্রেতসাধক।'

'আমাকে ওরকম ভাবার কোন কারণ ছিল না। আমি অতি সাধারণ একজন বুড়ো মানুষ। পাখি ভালবাসি। খুব ভোরে বেরোই। পাখি দেখতে বনে যাই। ভোরে উঠি বলেই ভূতগুলোর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়।'

সন্ন্যাসী তার নাম জানাল, ডুয়েন। ছবি আঁকতে ভালবাসে, বিশেষ করে পাখির ছবি। লোকের ফেলে দেয়া বাতিল জিনিস কুড়িয়ে এনে মূর্তি বানানোটা তার হবি।

তার ধারণা, গাঁয়ের কোন দুষ্ট লোক মানুষকে জাদুটোনা করছে। জাদুর প্রভাব থাকে কেবল রাতের বেলা—সূর্য ডোবা থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত। রবিনের ধারণার সঙ্গে তার ধারণা মিলে গেল।

'ভূতের খপ্পরে পড়ার ভয় তো আছেই,' ডুয়েন বলল, 'ভূত হওয়ার ভয়ও আছে। গাঁয়ের যে কেউ ওই ওঝার মন্ত্রের শিকার হতে পারে। সূর্য ওঠার

আগে বেরোলেই ঝুঁকি।'

'না বেরিয়ে পারব না,' মুসা বলল। 'কাগজ বিলি করতেই হবে।'

'তাহলে আর কি করা। সাবধানে থাকতে হবে।' বাইরে তখন সূর্য উঠছে। সেদিকে তাকিয়ে ডুয়েন বলল, 'এবার নিরাপদ। বেরোতে পারো।'

'থ্যাংকস, ডুয়েন,' বলে রবিনকে নিয়ে বাইরে বেরোল মুসা। গেটের দিকে পা বাড়িয়েছে, ডাক দিল ডুয়েন, 'দাঁড়াও।'

চমকে গেল দুজনে। আবার ভূত দেখল নাকি সন্ন্যাসী? তাড়াতাড়ি চারপাশে তাকাতে লাগল ওরা।

ডুয়েন বলল, 'আমার পত্রিকা?'

'ওহ্,' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল মুসা। 'ভুলেই গিয়েছিলাম।' সাইকেলের ক্যারিয়ার থেকে কাগজটা এনে দিল।

ফেরার পথে রাস্তা থেকে সাইকেলটা তুলে নিল রবিন। চাকায় হাওয়া নেই। চড়া সম্ভব নয়। অগত্যা তার সঙ্গে মুসাকেও হ্যান্ডেল ঠেলে নিয়ে হাঁটতে হলো।

'আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে,' হাঁটতে হাঁটতে বলল রবিন।

ফিরে তাকাল মুসা, 'কি বুদ্ধি?'

'ওয়াটার পিস্তল।'

'মানে?'

'শুনলে না, ডুয়েন কি বলল? ভূতগুলো পানিকে ভয় পায়। কাল ওয়াটার পিস্তল নিয়ে বেরোব আমরা। ভূত সামনে এলেই পানি ছুঁড়ব।'

'ভাল বুদ্ধি করেছ! দারুণ!'

পরদিন পিস্তল নিয়ে বেরোল রবিন। মুসাও নিল তারটা। পানি ভরে নিয়েছে চেম্বারে।

কাগজ হাতে প্রথমে মিসেস ডেনভারের রান্নাঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল ওরা। মুসার এক হাতে কাগজ আরেক হাতে পিস্তল। রবিনের হাতে শুধু পিস্তল।

কিন্তু ভূত দেখা দিল না।

কাগজ বিলি করতে করতে চলল ওরা। একটা গলিতে এসে ঢুকল যেটার শেষ মাথাটা বন্ধ, অন্য পাশে বেরোনো যায় না। ওই গলিতে আছে তিনজন গ্রাহক। প্রথম বাড়িটা মিস্টার পিটারের। পোস্ট অফিসে চাকরি করে। পরেরটা বিউটি পার্লার। নাম ক্যাথি'জ বিউটি। মালিক এক মহিলা। নাম মিস ক্যাথি। দোকানের সঙ্গেই তার ঘর।

মিস্টার পিটার বা মিস ক্যাথিকে নিয়ে ভাবনা নেই। কাগজ দিতে দেরি হলেও কিছু বলবে না। কিন্তু ভয় হলো শেষ মাথার বাজ নিউম্যানকে নিয়ে। গাঁয়ে একটা পেট্রোল পাম্পের মালিক সে। বেঁটে, পেটমোটা। কাজের সময় যে ওভারঅলটা পরে থাকে, সেটারও বিচিত্র রঙ। টকটকে লাল। আর কোন শ্রমিককে ওরকম ওভারঅল পরতে কখনও দেখেনি মুসা। ভীষণ বদমেজাজী।

ছোটদের দেখলেই খেপে। সাইকেলের চাকায় পাম্প করার জন্যে ওর পাম্পে কেউ ঢুকলে আর রক্ষা নেই, গাল দিতে দিতে তেড়ে আসে। ভূতের চেয়েও বেশি ভয় পায় ওকে গাঁয়ের ছেলেমেয়েরা।

মিস্টার পিটারকে কাগজ দিয়ে রবিন গেল মিস ক্যাথিকে দিতে। মুসা চলল পেট্রল পাম্পে।

পাম্পের অফিসের লাগোয়া একটা ঘরে থাকে বাজ। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে নিচের ফাঁক দিয়ে কাগজটা সবে ঢুকিয়েছে মুসা, দমকা বাতাসের ঝাপটা এসে লাগল গায়ে।

ফিরে তাকিয়ে দেখে বাড়ির পেছন থেকে বেরিয়ে আসছে একটা লাল ভূত। ভয়ঙ্কর চেহারা। ফোলা বেলুনের মত শরীর। আকৃতি গাজরের মত। বিকট হাঁয়ের ভেতর থেকে বেরিয়ে আছে মারাত্মক দাঁত। বেলুনের মত বাতাসে ভেসে ভেসে আসছে। চোখ দুটো যেন জ্বলন্ত কয়লার টুকরো।

কার ভূত ওটা বুঝতে বিন্দুমাত্র অসুবিধে হলো না মুসার। বাজ নিউম্যান। স্বাভাবিক অবস্থাতেই ও ভূতের বাড়া, আর এখন তো ভূতই হয়ে গেছে। কি করবে আল্লাহই জানে!

একটা মুহূর্ত আর দাঁড়াল না মুসা। ঘুরে দিল দৌড়। সাইকেল নেয়ারও সময় নেই। একছুটে বেরিয়ে এল রাস্তায়।

ক্যাথিকে পত্রিকা দিয়ে এসেছে রবিন। দৌড়াচ্ছে কেন, মুসাকে জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল। চোখে পড়ল ভূতটাকে। মুসার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সে-ও দিল দৌড়।

প্রাণপণে দৌড়ে চলল দুজনে। ভূতটা লেগে আছে ওদের পেছনে। গতি কম বলে রক্ষা। নইলে কখন ধরে ফেলত।

সামনে একটা বাড়ির খোলা গেট দেখে ছুটে তার মধ্যে ঢুকে পড়ল রবিন। পেছনে মুসা। লন ধরে ছুটল। শিশিরে ভেজা ঘাস। কিছুদূর এগিয়ে থমকে দাঁড়াল। উঁচু করে বেড়া দেয়া। ডিঙানো অসম্ভব।

আটকা পড়ল ওরা।

সাত

মরিয়া হয়ে এদিক ওদিক তাকিয়ে পালানোর পথ খুঁজল রবিন। একটা ছাউনি দেখে বলল, 'ওখানে ঢুকব!'

মুসাও দেখল ছাউনিটা। বারান্দার সামনে কয়েকটা কার্ডবোর্ড দাঁড় করিয়ে রাখা। পেছনে বেড়া। মাঝখানে একটা কুঠুরি মত হয়ে আছে। তাতে ঢুকে লুকানো যায়। কিন্তু বাঁচার আশা কম। এত সাধারণ একটা জায়গায় লুকিয়ে ভূতের চোখকে ফাঁকি দেয়া সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। তবুও একেবারে খোলা জায়গায় না থেকে সামান্য একটু আড়াল...

বেশি ভাবার সময় নেই। এসে পড়েছে উড়ুক্কু গাজর।

ঢুকে পড়ল দুজনে। বোর্ডগুলোর আড়ালে গুটিসুটি হয়ে বসল। পারলে নিঃশ্বাস আটকে ফেলতে চায়। কিন্তু পারছে না। ছুটে আসায় হাঁপাচ্ছে জোরে জোরে।

ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল রবিন, 'কার ভূত?'

'কার আবার! বাজের!'

'এখানে ঢুকলে কি করব, বলো তো?'

'জানি না...'

বিচিত্র শব্দ করছে ভূতটা। বাষ্পচালিত রেলইঞ্জিনের বাতাস বেরোনোর মত তীক্ষ্ণ শিস বেরোচ্ছে মুখ থেকে। বাতাসে ভেসে এগিয়ে আসছে।

'আরি, করলাম কি এতক্ষণ!' বলে উঠল রবিন, 'পিস্তল না এনেছি সঙ্গে!'

'তাই তো!' পকেটে হাত ঢোকাল মুসা। ধক করে উঠল বুক। নেই! রবিনের দিকে ফিরল। 'নেই! পড়ে গেছে! তোমারটা?'

'আছে,' বের করল রবিন।

'আমার কাছে দাও,' হাত বাড়াল মুসা।

'এখুনি বেরিয়ো না, বসে থাকো। যতক্ষণ কাছে না আসে, বেরিয়ে কাজ নেই।'

কাছে এসে গেল ভূত। বোর্ডগুলোর কয়েক গজ দূরে শূন্যে স্থির হয়ে ভেসে রইল। চোখ এদিকে। কোথায় ঢুকেছে ওরা, ঠিকই দেখেছে।

পিস্তল হাতে হামাগুড়ি দিয়ে এগোল মুসা। মাত্র কয়েক ফুট দূরে রয়েছে ভূতটা। আগুনের মত গরম বাতাস বইছে। গায়ের চামড়া যেন ঝলসে যাবে। তীক্ষ্ণ শিসের শব্দ কানের পর্দা ফুঁড়ে দিতে চায়।

জ্বলন্ত চোখে কুঠুরিটার দিকে তাকিয়ে থেকে আস্তে করে মাটিতে নামল ভূতটা। বুকে হেঁটে এগোতে শুরু করল।

লাফ দিয়ে উঠে ছুটে বেরোল মুসা।

ভূতটা যেখানে নেমেছে, সেখানে কয়েক টুকরো কাগজ আর কিছু শুকনো ডালপাতা পড়ে ছিল। ভূতের গায়ের সঙ্গে লাগতেই আগুন ধরে গেল ওগুলোতে। যেন জ্বলন্ত কয়লার ছোঁয়া লেগেছে। ওই ভয়াবহ গাজরটা তাকে চেপে ধরলে কি ঘটবে ভেবে শিউরে উঠল মুসা।

পিস্তল তাক করে ট্রিগার টিপল সে।

কিছুই ঘটল না। বেরোল না পানি। গুলি করার আগে পাম্প করেনি।

তাড়াতাড়ি একবার পাম্প করে আবার তাক করে ট্রিগার টিপল। কয়েক ফোঁটা পানি বেরোল। দেখে থমকে গেল আগুনে ভূত। এই সুযোগে আরও কয়েকবার পাম্প করে আবার ট্রিগার টিপল সে।

সরু ধারায় ছিটকে বেরোল পানি। গায়ে লাগতেই ছ্যাঁৎ করে উঠল, কয়লার ওপর পানি পড়লে যেমন হয়। চিৎকার করে উঠল ভূতটা। এত তীক্ষ্ণ আর জোরাল আওয়াজ, মুসার ভয় হলো কানটাই বুঝি যাবে তার!

কাছে এল না আর ভূতটা। এক জায়গায় থেকে ফুঁসতে লাগল। সুযোগ

পেলেই লাফ দিয়ে পড়বে মুসার ওপর।

গুলি করল আবার সে।

ঝাঁকি দিয়ে পিছিয়ে গেল ভূতটা।

অপেক্ষা করতে লাগল মুসা।

আবার এগোতে শুরু করল ওটা। আসছে...আসছে...আরও কাছে। প্রচণ্ড গরম নিঃশ্বাস লাগছে মুসার গায়ে। জ্বলন্ত চোখ দুটোর মাঝখানে নিশানা করে গুলি করল সে।

ঝটকা দিয়ে পিছিয়ে গেল ভূতটা। কাত হয়ে পড়া লাটিমের মত গড়ান খেল দুবার। তারপর তীক্ষ্ণ শিস দিতে দিতে একলাফে শূন্যে উঠে পড়ল। গ্যাস ভরা বেলুনের মত আকাশের অনেক ওপরে উঠে উধাও হয়ে গেল।

'হয়েছে! কাজ হয়েছে পানিতে!' চিৎকার দিয়ে বেরিয়ে এল রবিন। 'এত ভয়ানক একটা ভূতকেও ভাগিয়ে দেয়া গেল!'

কথা বলার অবস্থা নেই মুসার। কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়ল মাটিতে।

আট

বাকি কাগজগুলো বিলি করার সময় আর কোন ভূতের তাড়া খেতে হলো না। ওর পড়ে যাওয়া পিস্তলটা রাস্তায় দেখতে পেল মুসা। কুড়িয়ে নিল।

ডুয়েনের কুঁড়ের কাছে গিয়ে দেখে হাঁটতে বেরোচ্ছে সে। বাজ নিউম্যানের ভূতের কথা বলা হলো ওকে।

'দেখেছি আমিও,' সন্ন্যাসী বলল। 'লোকটা যেমন পাজি, তার ভূতটাও তেমনি।'

'ওয়াটার পিস্তল দিয়ে তাড়িয়েছি ওটাকে,' মুসা বলল।

'বুদ্ধিটা ভালই। তবে সবগুলো একযোগে আক্রমণ করলে দুটো পিস্তল দিয়ে ঠেকাতে পারবে না। ভূতের চেয়ে বেশি ভয় আমার ওঝাটাকে। যদি জাদু করে বসে? কখন, কিভাবে করবে জানি না। না জানলে সাবধানই বা হব কি করে?' একটু চিন্তা করে বলল, 'এক কাজ করো। অহেতুক ঝুঁকি না নিয়ে দেরি করেই বেরিয়ো। আকাশ ফর্সা হলে। দুজন আছ যখন, পত্রিকা দিতে দেরি হবে না। সময় মতই দিতে পারবে। কেউ বিরক্ত হবে বলে মনে হয় না।'

কথাটা যুক্তিসঙ্গত মনে হলো দুই গোয়েন্দার কাছে। পরদিন থেকে দেরি করে বেরোতে লাগল। আর কোন ভূত-প্রেত বা দানবের সামনে পড়ল না।

'ভূতের ভয়ে এ ভাবে কাবু হয়ে থাকতে ভাল লাগছে না,' মুসা বলল একদিন। 'যখনই মনে হয় আমাদের স্বাধীনতা হরণ করেছে পিশাচগুলো, রাগ লাগতে থাকে।'

'দোষটা তো আসলে ওদের নয়, দোষটা ওই ওঝার। ওকে ধরে ঠাণ্ডা

করতে পারলে আপনা-আপনি বন্ধ হয়ে যাবে ভূতের অত্যাচার।'

'মুশকিলটা তো ওখানেই। কে যে ওঝা কি করে বুঝব?'

'ফ্র্যাঙ্ক হেয়ার,' রবিন বলল। 'মুদী দোকানে চাকরি করে তো, খাবারে মন্ত্র পড়ে দেয়া তার জন্যে সহজ।'

'কিন্তু সে নিজেও যে ভূত হয়ে যায়। নিজেকে ভূত বানিয়ে ভোরবেলা ডাস্টবিন থেকে আবর্জনা খেতে যাবে নাকি?'

'তাও তো কথা। তাহলে কে?'

'অন্য কেউ। কোন দুষ্ট লোক। মানুষকে ভূত বানিয়ে যে মজা পায়।'

'এ সময় কিশোরকে খুব দরকার ছিল আমাদের। একটা চিঠি লিখব নাকি?'

'আরও দু'চার দিন দেখি। ভূত তো আর এখন সামনে পড়ে না।'

'পড়ে না অসময়ে বেরোই বলে। অন্ধকার থাকতে বেরোলেই তাড়া খাব।' গাল চুলকাল রবিন। 'বুঝতে পারছি, ওঝাটা খুব ধড়িবাজ। কিশোরের সাহায্য ছাড়া ওকে ধরতে পারব না।'

এক মুহূর্ত চিন্তা করল মুসা। 'হুঁ। কিন্তু রকি বীচে আছে কিনা সে কে জানে। ঠিক আছে, দাও লিখে। থাকলে আসবে। না থাকলে আমাদের দুজনকেই যা করার করতে হবে।'

ভোররাতে অন্ধকার থাকতে কাগজ বিলি করতে বেরোল মুসা। সাইকেলটা খারাপ হয়ে গেছে। কাগজের বোঝা হাতে করে বয়ে নিতে হলো। বেজায় ভারি। যে সব বাড়িতে ভূত দেখা গেছে সেগুলো এড়িয়ে চলল।

রাস্তা ধরে হাঁটছে। নীরবতার মধ্যে নিজের জুতোর শব্দই জোরাল হয়ে কানে বাজছে। কুয়াশা এত ঘন, কয়েক হাত দূরের জিনিসও চোখে পড়ে না।

হঠাৎ সামনে তীক্ষ্ণ শিস শোনা গেল। শব্দটা চেনা। লাল ভূত!

তারপর শোনা গেল, 'হল্ট! ঝামেলা!'

ঘুরে দিল দৌড় মুসা। কাগজের বোঝা নিয়ে বেশি জোরে ছুটতে পারল না।

'কঁচাক!' শোনা গেল একপাশ থেকে।

ভয়ে দম বন্ধ করে ফেলল সে। কোনদিকে যাবে বুঝতে পারছে না।

কানের কাছে সুর করে গেয়ে উঠল, 'মুসা, ও, মু-সা!'

পকেটে হাত ঢোকাল সে। পিস্তল নেই। নিতে ভুলে গেছে।

'মুসা! ও, মু-সা!'

চারপাশ থেকে ওকে ঘিরে ফেলল পিশাচগুলো। ভয়াবহ শব্দ করছে। এত কাছে, মনে হলো ওর গায়ের ওপর নিঃশ্বাস ফেলছে।

ধরার জন্যে এগিয়ে এল কয়েকটা হাত। কাগজগুলো ফেলে দিল সে। থাবা মেরে হাত সরানোর চেষ্টা করল। কাপড়ে পেঁচিয়ে গেল ওর হাত দুটো। চতুর্দিক থেকে ওকে চেপে ধরে খামচাতে এল ভয়াল আঙুলগুলো।

ঠিক নাকের কাছে এসে থামল একজোড়া জ্বলন্ত চোখ...

চিৎকার করে উঠল সে। ভেঙে গেল ঘুম। বিছানার চাদরটা হাতে জড়িয়ে গেছে।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। দুঃস্বপ্ন দেখছিল।

পাঁচটা বাজতে বেশি বাকি নেই। উঠে পড়ল সে। ঠিক পাঁচটায় রবিন এল। পত্রিকা বিলি করতে বেরোল দুজনে। কাজ সেরে ফিরে এল নিরাপদে।

আর মাত্র একদিন বাকি। তারপর মুসার পত্রিকা বিলি করার কাজ শেষ। আগামী দিন ফিরে আসবে বিলি।

'কিশোরটা এল না,' রবিন বলল আফসোস করে। 'মনে হয় সে রকি বীচে নেই।'

'মনে হয়। নইলে এ রকম ভূতের খবর শুনলে কিছুতেই না এসে থাকতে পারত না...'

মুসার কথা শেষ হওয়ার আগেই ফোন বাজল। এত ভোরে কে? উঠে গিয়ে রিসিভার তুলে কানে ঠেকাল সে। 'হালো!' মুহূর্ত পরে আনন্দে চিৎকার করে উঠল, 'কিশোর, তুমি! কোত্থেকে!'

লাফ দিয়ে উঠে এল রবিন। রিসিভারের দিকে কান বাড়িয়ে দিল শোনার জন্যে।

আধ মিনিট পর রিসিভার রেখে মুসা বলল, 'কাল অনেক রাতে এসেছে। আমরা ঘুমিয়ে গেছি ভেবে ফোন করেনি। আসছে ও। ক্রিসেন্ট লেকে বেড়াতে গিয়েছিল। বাড়ি ফিরে তোমার চিঠি পেয়ে আর দেরি করেনি। যত তাড়াতাড়ি পেরেছে, ট্রেনে চেপেছে।'

সাতটা না বাজতেই চলে এল কিশোর। টিটু নেই সঙ্গে।

'টিটুকে আনলে না?' রবিনের প্রশ্ন।

'নাহ্। ব্যারাম বাধিয়েছে। লেকের ভীষণ ঠাণ্ডা পানিতে নেমেছিল। সর্দি লেগেছে মনে হয়। রেখে এসেছি বাড়িতে। চাচী ডাক্তার দেখাবে। হ্যাঁ, ভূতের কথা বলো। শোনার জন্যে অস্থির হয়ে আছি।'

নয়

পত্রিকা বিলির শেষ্ দিন। অন্ধকার থাকতে উঠে পড়ল মুসা। পিস্তলটায় পানি ভরে নিল বাথরুমের কল থেকে। কাপড় পরে বেরিয়ে পড়ল। চলে এল পথের মোড়ে, যেখানে ট্রাক থেকে খবরের কাগজের প্যাকেট ফেলে যায়।

প্যাকেটটা সাইকেলের ক্যারিয়ারে তুলে নিল সে। মিনিটখানেক পরই সাইকেল নিয়ে এসে হাজির হলো রবিন আর কিশোর। তিনজনে মিলে কাগজ বিলি করতে বেরোবে। এত তাড়াতাড়ি বেরোনোর উদ্দেশ্য, ভূতের মুখোমুখি হওয়া। কিশোর দেখতে চায়।

'খালি শুধু বেরোক ব্যাটারা আজ,' কিশোর সঙ্গে থাকায় সাহস অনেকগুণ বেড়ে গেছে রবিনের। 'গুলি করে বাপের নাম ভুলিয়ে দেব।' নিশানা ঠিক আছে কিনা দেখার জন্যে রাস্তার পাশের 'স্পীড লিমিট' লেখা বোর্ডের দিকে তাক করে ট্রিগার টিপল।

ফসকে গেল।

হেসে উঠল মুসা, 'এত্ত বড় নিশানা, তাও পারলে না। দাঁড়াও, কি ভাবে লাগাতে হয় দেখাচ্ছি।'

পিস্তল তুলে নিশানা করে ট্রিগার টিপল সে। লাগল জায়গামত। 'দেখলে তো?'

আবার নিশানা করল রবিন। লক্ষ্য স্থির করে ট্রিগার টিপে দিল। লাগল এবার। মজা পেয়ে গেল। এরপর গাছ, সাইনবোর্ড, টেলিফোনের খুঁটি—যা দেখল সব কিছুকে নিশানা করে ট্রিগার টিপতে লাগল।

মুসাও তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ট্রিগার টিপে চলল।

কিশোরের কাছে পিস্তল নেই। চতুর্দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে রাখতে চলেছে সে। ভূত দেখার আশায়।

কাগজ বিলি শুরু করল রবিন আর মুসা।

মিসেস ডেনভারের ভাগ্য ভাল যে চেহারা দেখাননি। তাহলে দুদিক থেকে আক্রমণের শিকার হতেন। দরজার নিচে তাঁর পত্রিকাটা রেখে সরে এল দুজনে।

তালিকায় লেখা নাম অনুসারে কাগজ দেয়ার ধার ধারল না আজ ওরা। যেখানে যেখানে ভূত দেখা যায়, সেসব জায়গায়ই আগে চলল।

সুপারমার্কেটের পাশ কাটিয়ে এল। কোন দানব তাড়া করল না। বাজের পত্রিকা দিতে গিয়ে বিপত্তি ঘটল না। ফগর‍্যাম্পারকটের ভূত বেরোল না ছাউনি থেকে।

'কোথায় তোরা, পিশাচের দল!' চিৎকার করে ডাকল রবিন। 'সাহস থাকলে চেহারা দেখা!'

কিন্তু ওর ডাকে সাড়া দিল না কোন ভূত।

পত্রিকা বিলি প্রায় শেষ। ডুয়েনের কুঁড়ের দিকে রওনা হলো ওরা।

কুঁড়েতে পাওয়া গেল না ওকে। হতাশ হলো মুসা আর রবিন, ডুয়েনের সঙ্গে কিশোরের পরিচয় করিয়ে দিতে পারল না বলে।

আঙিনায় দাঁড়িয়ে আগ্রহ নিয়ে মূর্তিগুলো দেখছে তখন কিশোর।

কাগজটা বারান্দায় রেখে দিয়ে আঙিনা থেকে নেমে এল মুসা। 'নাহ্, তোমার কপালটাই খারাপ, কিশোর। না দেখা হলো ভূতের সঙ্গে, না ডুয়েনের।'

গেটের বাইরে বেরিয়ে এল তিনজনে। ঝোপের মধ্যে খসখস শব্দ হলো।

'কিসের শব্দ?' ফিসফিস করে বলল রবিন। 'ভূত আসছে নাকি?'

বাড়তে লাগল আওয়াজটা।

ভূত নয়, জলাভূমির ধারের ঝোপ থেকে বেরিয়ে এল ডুয়েন।

'গুড মর্নিং,' কাছে এসে বলল সে। 'পাখি দেখতে বেরিয়েছিলাম। তোমাদের দেখে ফিরে এসেছি।' কিশোরের দিকে তাকাল, 'ও কে?'

'কিশোর পাশা,' পরিচয় করিয়ে দিল রবিন। 'আমাদের বন্ধু। ভূত দেখতে বেরিয়েছে।'

হাত বাড়িয়ে দিল ডুয়েন। কিশোরের হাতটা ধরে ঝাঁকি দিল। 'ভূত দেখাটা কোন মজার ব্যাপার নয়।'

'আসলে ভূতগুলোকে ঠাণ্ডা করার ইচ্ছে আমাদের,' কিশোর বলল। 'রবিন আর মুসার কাছে শুনলাম, কোন দুষ্ট ওঝার কারসাজি এ সব। লোকটা কে, ধারণা দিতে পারেন?'

মাথা নাড়ল ডুয়েন। 'না। ভূতগুলো সত্যি খুব জ্বালাচ্ছে। দেখো, কিছু করতে পারো কিনা। আমার সাহায্যের দরকার হলে নির্দ্বিধায় চলে এসো।'

ভূত নিয়ে আরও কিছু আলোচনার পর ডুয়েন বলল, 'আজ তো তোমাদের পত্রিকা দেয়া শেষ। ভোরবেলা আর দেখা হবে না তোমাদের সঙ্গে।'

'হবে না কেন?' হেসে বলল কিশোর। 'দেখা করতে চাইলেই করা যায়। সমস্যা তো কিছু নেই।'

খুশি হলো ডুয়েন। 'তাহলে চলে এসো একদিন। ভোর বেলা পাখি দেখাটা খুব মজার। হঠাৎ করে এমন সব পাখি চোখে পড়ে যায়, সাধারণত যেগুলো দেখা যায় না। লাল সারস। নীল বক।'

'আসব,' কথা দিল কিশোর। 'পাখি আমারও পছন্দ।'

শেষবারের মত ভূতের ব্যাপারে সাবধান করে দিয়ে গেটের ভেতর ঢুকে গেল ডুয়েন। ফিরে তাকিয়ে বলল, 'আজ আর পাখি দেখতে যাচ্ছি না। দেরি হয়ে গেছে।'

ফিরে চলল তিন গোয়েন্দা। আর অল্প কয়েকটা কাগজ দেয়া বাকি।

ঘন হয়ে এল কুয়াশা। আবছা ধূসর অন্ধকারে কোন জিনিসকে বাস্তব মনে হচ্ছে না। কেমন অপার্থিব, ভূতুড়ে।

আরও কয়েকটা বাড়িতে কাগজ বিলি করল ওরা। হেমিংদের বাড়িতে এসে ঢুকল। অবাক হলো মুসা। এত ভোরে আঙিনায় খেলছে ওদের একটা মেয়ে।

তিন মেয়ে হেমিংদের, গাঁয়ের ছেলেরা নাম রেখেছে তিন-কন্যা। সব কটার চুল লাল, বাদামী তিলে ভরা মুখ। একই ধরনের পোশাক পরে। পড়েও তিনজন একই ক্লাসে।

আঙিনায় যে খেলছে ওর নাম পলি। রবারের একটা বল মাটিতে ফেলছে। ড্রপ খেয়ে উঠলে লুফে নিচ্ছে। আপনমনে হাসছে। এই সাধারণ খেলায়ও যেন মজা পাচ্ছে খুব।

মুসা কাগজ দিতে চলল। রবিন ওর সঙ্গে কথা বলতে এগোল। কিশোর দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ।

কাগজ দিয়ে ফিরে এল মুসা। শুনল, রবিন বলছে, 'ওদের দেখেছি

আমরা। ভূত, প্রেত, দানো।'

পলি মাটিতে বল ড্রপ খাওয়াচ্ছে।

'ভাবছ আমি মিথ্যে বলছি?' রবিন বলল। 'মুসাকে জিজ্ঞেস করে দেখো।'

'ও ঠিকই বলেছে,' এগিয়ে গেল মুসা। 'সূর্য ওঠার আগে বাইরে বেরোনো ঠিক না।'

কথা বলল না পলি। শব্দ করে হাসল।

হেমিংদের তিনটে মেয়েই খুব অহংকারী। কিছুদিন আগে টেলিভিশনে নাচার সুযোগ পেয়েছিল, তারপর থেকে গর্বে আর মাটিতে পা পড়ে না। ওদের ধারণা, বড় নর্তকী হয়ে গেছে। হলিউডের অভিনেত্রী হওয়াটাও কোন ব্যাপারই নয়।

'সুপারমার্কেটের ফ্র্যাঙ্ক হেয়ার শুঁয়া-মানবে পরিণত হয়েছে,' মুসা বলল। 'দানব।'

বাড়ির দিকে তাকাল পলি। ওর দুই বোনও আসছে। জলি আর মিলি।

'বাজ নিউম্যানকে চেনো তো,' রবিন বলল। 'ও হয়েছে আগুনে ভূত। লাল রঙের উড়ুক্কু গাজর হয়ে উড়ে বেড়ায়। ইয়া বড় বড় দাঁত। আমাদের পোড়াতে এসেছিল সেদিন। অনেক কষ্টে বেঁচেছি।'

তিন বোনই এক রকম পোশাক পরেছে। লাল কাপড়ে নীল ফোঁটা। তিনজনেরই বড় বড় নখ। এতবড় নখ রাখতে আগে কখনও দেখেনি মুসা বা রবিন।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তিন বোনকে দেখছে কিশোর।

'ফগর‍্যাম্পারকটের কি হয়েছে জানো?' পলিকে বিশ্বাস করানোর জন্যে খেপে উঠল যেন রবিন। 'লেজ গজিয়েছে। হাতে কাঁটা। সেদিন আমাদের তাড়া করেছিল। অল্পের জন্যে বেঁচেছি।'

মেয়েগুলোর আচরণ অস্বাভাবিক লাগল কিশোরের কাছে। আস্তে করে ডাকল, 'রবিন!'

ছোট ছোট কদম ফেলে মুসা আর রবিনের দিকে এগোতে লাগল তিন বোন। তিনজনেই হাসছে টেনে টেনে হি হি করে।

কিশোরের ডাকে সাড়া দিল না রবিন। পলি ওর কথা বিশ্বাস না করায় রেগে গেছে। বিশ্বাস করিয়েই ছাড়বে।

চোখ তুলে তাকাল পলি।

স্থির হয়ে গেল মুসা। এ কি দৃষ্টি!

রবিনেরও টনক নড়ল এতক্ষণে।

ভয়ঙ্কর চোখ!

দশ

পাশাপাশি গা ঘেঁষে দাঁড়াল তিন-কন্যা। আবছা আলোয় জ্বলজ্বল করছে ওদের চোখ। তিনটে খুদে ইবলিসে পরিণত হয়েছে।

হি হি! হাসছে ওরা। হি হি হি!

সরে আসতে গেল রবিন। খপ করে ওর হাত চেপে ধরল পলি। লাফ দিয়ে এগিয়ে এল অন্য দুই বোনও।

চিৎকার করে উঠল রবিন, 'অ্যাই ছাড়ো আমাকে, ছাড়ো!'

পলি তো ছাড়লই না, জলি আর মিলিও রবিনের হাত চেপে ধরল।

টানাটানি করতে লাগল রবিন। ছাড়াতে পারল না কিছুতে।

এগিয়ে গেল মুসা। ধমকে উঠল, 'ছাড়ো ওকে! ছেড়ে দাও! ভাল হবে না বলছি!'

মুসার ধমকের পরোয়াই করল না তিন ইবলিস। হি হি হি! আরও জোরে হেসে উঠল ওরা। চোখা দাঁত বেরিয়ে পড়ল। রোম খাড়া করে দেয়া কুৎসিত হাসি।

পলির আরেক হাত চেপে ধরল মুসা। কিশোরও এগিয়ে গেল। রবিনের হাত ধরে টান দিল। মেয়েগুলোও ছাড়ল না। চলল এই টানাটানি। চিৎকার করছে রবিন। ওর ভয় হচ্ছে, হাত না ছিঁড়ে যায়।

অনেক কষ্টে রবিনকে ছাড়িয়ে আনল মুসা আর কিশোর।

'পালাও!' চিৎকার করে উঠল মুসা। 'এই ইবলিসদের সঙ্গে পারব না!'

দিল দৌড় তিনজনে। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে কিশোরও। ভূতগুলো যে এতটা ভয়ানক, মুসা আর রবিনের মুখে শুনে আন্দাজ করতে পারেনি।

তেড়ে এল তিন-কন্যা। এখন আর কন্যা নেই, ইবলিস।

বাগানের ওপর দিয়ে ছুটল গোয়েন্দারা। সাইকেলের কাছে যাওয়ার সুযোগ নেই।

স্কুলে তিন বোনের সঙ্গে দৌড়ে পারে না কোন মেয়ে। অনেক ছেলেও পারে না। এখন ভূত হয়ে গিয়ে দৌড়ানোর ক্ষমতা আরও বেড়ে গেছে ওদের।

'মুসা,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল কিশোর, 'পিস্তল! ভুলে গেছ?'

সামনে একটা পার্ক। সেটাতে ঢুকে পড়ল মুসা। একটা বেঞ্চের দিকে এগোল।

লাফ দিয়ে গিয়ে বেঞ্চটায় উঠল সে। রবিন আর কিশোরকেও উঠতে বলে পিস্তলের জন্যে পকেটে হাত দিল। আছে তো ওটা? নাকি দৌড়াতে গিয়ে সেদিনের মত পড়ে গেছে?

ধক করে উঠল বুক। নেই!

অন্য পকেটে হাত দিল। না না, আছে। একটানে বের করে আনল পিস্তলটা।

রবিন আর কিশোরও বেঞ্চে উঠে দাঁড়িয়েছে।

তিন দিক থেকে এগিয়ে আসছে তিন-কন্যা।

হি হি হি! হাসছে তিনজনেই।

'আর বেশিক্ষণ হাসা লাগবে না,' দাঁতে দাঁত চেপে বলল মুসা। 'দেখাচ্ছি মজা!'

হাত সোজা করে পিস্তল তুলে ধরল সে। রবিনও পিস্তল তাক করল।

'একেবারে কাছে না এলে গুলি করবে না,' মুসা বলল। 'মিস যেন না হয়।'

সামান্য কুঁজো হয়ে এক-পা এক-পা করে এগিয়ে আসছে তিনকন্যা। হাসছে, হি হি হি!

রেঞ্জের মধ্যে আসতেই চেঁচিয়ে উঠল মুসা, 'ফায়ার!'

দুজনেই ট্রিগার টিপল। পিস্তলের মুখ থেকে পানির দুটো ধারা বেরিয়ে গিয়ে লাগল দুই ইবলিসের শরীরে। কুঁকড়ে গেল ওরা। পরক্ষণে সরে গেল পেছনে। বাজের ভূতটার মত।

তৃতীয় ভূতটাকে গুলি করল মুসা। মিস হলো। ভালমত নিশানা করে আবার ট্রিগার টিপল। কয়েক ফোঁটা পানি গড়িয়ে পড়ল নলের মুখ দিয়ে।

সর্বনাশ! পানি ফুরিয়ে গেছে!

গুলি করে ওটাকে পিছিয়ে যেতে বাধ্য করল রবিন। কিন্তু বাকি দুটো ভূত আবার এগিয়ে আসতে আরম্ভ করেছে।

'মুসা, চুপ করে আছ কেন?' ভূতগুলোর দিকে তাকিয়ে থেকে বলল রবিন। 'গুলি করো। ধরে ফেলল তো!'

'আমার পানি ফুরিয়ে গেছে,' মুসা বলল।

দ্রুত আরও কয়েকবার গুলি করল রবিন। কিছুটা পিছিয়ে গেল আবার তিন-কন্যা।

রবিনের পিস্তলের পানিও ফুরাল। নলের মুখ দিয়ে কয়েকটা ফোঁটা গড়িয়ে পড়ল কেবল।

'কি হবে এখন!' ফিসফিস করে বলল ও। টার্গেট প্র্যাকটিস করে পানি শেষ করেছে বলে চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করছে এখন।

ঝড়ের গতিতে ভাবনা চলেছে কিশোরের মাথায়। ওর হাতে কোন অস্ত্র নেই। ভূতগুলোকে ঠেকানোর উপায় খুঁজছে।

হি হি হি!

এগিয়ে আসতে শুরু করেছে আবার তিন-কন্যা। সামনে কুঁজো হয়ে পা পা করে এগোচ্ছে বেঞ্চের দিকে। আবছা আলোতেও চকচক করছে ওদের ভয়াবহ ধারাল দাঁত। আঙুলের নখগুলো যেন আরও লম্বা হয়েছে। ঈগলের নখের মত বাঁকানো।

আচমকা বলে উঠল কিশোর, 'রবিন, তোমার দিকেই বেশি নজর

ওদের। এক কাজ করো, লাফ দিয়ে নেমে দৌড় মারো। ওই চায়ের দোকানটার পেছন দিয়ে ঘুরে চলে যাও বাচ্চাদের স্কুলটার দিকে। দেখি ওরা তোমার পিছু নেয় কিনা।'

'যদি নেয়?'

'দৌড়াতে থাকবে। সরিয়ে নিয়ে যাবে ওদের। এই সুযোগে আমি আর মুসা পিস্তলে পানি ভরে আনার ব্যবস্থা করব। স্কুলটার কাছে দেখা করব আমরা। দাও, তোমার পিস্তলটা দাও। আমি নামো বললেই নেমে দৌড় মারবে।'

নীরবে পিস্তলটা কিশোরের হাতে তুলে দিল রবিন।

'নামো!' চেঁচিয়ে উঠল কিশোর।

একটা মুহূর্ত দ্বিধা করল রবিন। লাফ দিয়ে নামল মাটিতে। ওকে ধরার জন্যে তিন দিক থেকে ঘিরে এল তিন-কন্যা। বাউলি কেটে ওদের পাশ দিয়ে শাঁ করে বেরিয়ে চায়ের দোকানটার দিকে দৌড় দিল সে।

ওর পিছু নিল তিন ইবলিস। কয়েক পা গিয়ে থমকে দাঁড়াল একটা। ফিরে তাকাল। যখন দেখল মুসা আর কিশোর দাঁড়িয়ে আছে, পায়ে পায়ে ফিরে আসতে লাগল আবার।

মুসাকে বলল কিশোর, 'এবার তোমার পালা। এটাকে সরাও।'

লাফ দিয়ে বেঞ্চ থেকে নেমে পড়ল মুসা। ধরার জন্যে হাত বাড়িয়ে দিল খুদে ইবলিসটা। পাশ কাটিয়ে দৌড় মারল মুসা। ছুটল রবিন যেদিকে গেছে তার উল্টো দিকে।

পিছু নিল ইবলিসটা।

ফিরে তাকিয়ে ওটাকে আসতে দেখে আরও জোরে দৌড়াতে লাগল মুসা। ঢুকে পড়ল একটা গলিতে।

অত সকালে কেউ বেরোয়নি। রাস্তাটা নির্জন। এপাশ ওপাশ তাকিয়ে লুকানোর জায়গা খুঁজতে লাগল সে। দৌড় থামাল না।

একটা বাড়ি চোখে পড়ল। হকিনসদের বাড়ি। বাড়ির পেছনে বড় বড় ঝোপ। রাস্তা থেকে নেমে এক দৌড়ে গিয়ে ঝোপের মধ্যে ঢুকল সে। শুয়ে পড়ল চিত হয়ে। বাইরে থেকে কেউ আর দেখতে পাবে না ওকে।

বুকের মধ্যে পাগল হয়ে গেছে যেন হৃৎপিণ্ডটা। এত জোরে ধক-ধক করছে, মনে হচ্ছে ফেটে যাবে। একপাশে মাথা কাত করে তাকাল রাস্তার দিকে।

আবছা আলোয় কিছু চোখে পড়ল না। কোন শব্দও নেই। তারপর শোনা গেল, হি হি হি!

গলিতে ঢুকল খুদে ইবলিসটা। এগিয়ে আসতে লাগল ধীর পায়ে। হাসছে একঘেয়ে, কলজে শুকিয়ে দেয়া হাসি।

খানিকটা পানি পেলে হত! ইস্, কি গাধা আমি!—নিজেকে গালাগাল করছে মুসা। শুধু শুধু পানি নষ্ট করলাম!

কাছে চলে এসেছে ভূতটা। এদিক তাকাচ্ছে, ওদিক তাকাচ্ছে, কিন্তু

একটিবারের জন্যেও মুসার দিকে তাকাচ্ছে না। কারণটা বুঝল না ও।

ঝোপের পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল খুদে ইবলিস। হাঁচি পেল মুসার। কোনমতেই ঠেকাতে পারল না। নাক-মুখ চেপে ধরল। তাতেও লাভ হলো না। হ্যাঁচচো করে উঠল। নীরবতার মাঝে এত জোরে হলো শব্দটা, ওর মনে হলো বোম ফেটেছে।

থমকে দাঁড়াল ভূত। ফিরে তাকাল। আবছা আলোতে ঝিক করে উঠল চোখা দাঁত।

চুপ করে মরার মত পড়ে রইল মুসা।

জ্বলন্ত চোখ মেলে ওকে খুঁজল ওটা। দেখতে পেল না। আশ্চর্য! কি ধরনের ভূত? ঝোপের মধ্যে দৃষ্টি চলে না নাকি? না চললেই ভাল।

মুসার ঝোপের দিকে রোবটের মত শূন্য দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে ঘুরে দাঁড়াল ইবলিসটা। পা বাড়াল সামনে।

যাক, বাঁচা গেল—ভাবল মুসা, আমি এখন নিরাপদ! রবিনের জন্যে চিন্তা হলো। ওর পেছনে গেছে দুটো ইবলিস। ওকে সাহায্য করতে যাওয়া দরকার। খানিকটা পানি পেলে...

মনে পড়ল হকিনসদের বাগানের কলটার কথা। বাগানে পানি দেয়ার জন্যে কলের মুখে একটা পাইপ বাঁধা থাকে। ওটা থেকে পানি নেয়া যাবে।

হামাগুড়ি দিয়ে ঝোপ থেকে বেরোল সে। আপন মনে হি হি করতে করতে এগিয়ে চলেছে খুদে ভূতটা। এদিকে ফিরল না আর।

বাড়িটার দিকে তাকাল মুসা। কাউকে দেখা গেল না। এত ভোরে ঘুম ভাঙেনি কারও, বাগানে বেরোয়নি।

কলটা আছে অন্যপাশে। বাড়ির পাশ ঘুরে সামনের দিকে চলে এল। চোখে পড়ল কলটা। পাইপটা বাঁধা আছে। বাগানে ঢুকে এখন পিস্তলের চেম্বার ভর্তি করে নিলেই হলো।

বাগানে ঢুকে কলের চাবি ধরার জন্যে হাত বাড়াল সে। মাঝপথে থেমে গেল হাতটা। ভয়ঙ্কর এক চিৎকার বুকের রক্ত হিম করে দিল ওর।

এগারো

চিৎকার করেছে একটা কুকুর। কুকুরের ডাক অনেক শুনেছে মুসা, কিন্তু এ রকম আর শোনেনি। ওর মনে হলো নরক থেকে ডেকে উঠেছে কোন ভয়ানক পিশাচ। দেখতে পেল না ওটাকে।

হকিনসদের বাড়িতে কুকুরের ডাক, তারমানে নিশ্চয় কমান্ডার। আর কোন কুকুর নেই ওদের। মোলায়েম স্বরে ডাক দিল, 'কমান্ডার! লক্ষ্মী ছেলে! কোথায় তুই?'

জবাব দিল না লক্ষ্মী ছেলে। বেরোলও না আড়াল থেকে।

পনেরো সেকেন্ড অপেক্ষা করল মুসা। কুকুরটার আচরণ সেদিন মোটেও সুবিধের মনে হয়নি। আজও কি ওরকমই করবে?

শোনা গেল চাপা গরগর।

না, স্বাভাবিক শব্দ নয়! ওটা বেরোনোর আগেই পিস্তলে পানি ভরে নেয়ার তাগিদ অনুভব করল সে। পানি নিয়ে কেটে পড়া উচিত।

কলের দিকে পা বাড়াল মুসা। এক পা এগিয়ে থেমে গেল।

জোরাল হলো গরগর।

আরেক পা বাড়াল মুসা।

খাবারের খালি টিনের একটা স্তূপের ওপাশ থেকে উঁকি দিল কমান্ডারের মাথা। দাঁত খিঁচিয়ে রেখেছে। বেরিয়ে আছে লম্বা, চোখা দাঁতগুলো। অস্বাভাবিক দাঁত। সাধারণ কুকুরের এমন হয় না।

অনেক বড় লাগছে ওকে। স্বাভাবিক অবস্থায় এত বড় নয় সে। ওর ভাবভঙ্গিতে কুকুরের চেয়ে বরং নেকড়ের স্বভাব এখন প্রকট। তারমানে গেছে ওটাও ভূত হয়ে।

খুদে ইবলিসটা তার কাছে না আসার কারণ এতক্ষণে বুঝতে পারল মুসা। ঝোপের ভেতরে তাকে দেখেছে ওটা ঠিকই। আক্রমণ করেনি। কাছাকাছি তার চেয়ে শক্তিশালী আরেকটা ভূত আছে বলে। হয় ইচ্ছে করেই কুকুরটার হাতে তুলে দিয়ে গেছে, নয়তো ভয় পেয়ে শিকার ফেলে কেটে পড়েছে। ভূতও তাহলে ভয় পায়! এই সাংঘাতিক মুহূর্তেও হাসি পেল মুসার।

আবার গরগর করে উঠে এক পা এগোল কমান্ডার। চোখ দুটো চুনি পাথরের মত টকটকে লাল।

পিছিয়ে গেল মুসা। কুকুর পছন্দ করে ও। সহজেই পটিয়ে ফেলতে পারে। কমান্ডারের সঙ্গেও তার খাতির আছে। নরম স্বরে বলল, 'এমন করছিস কেন? ঘরে যা!'

জবাবে দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে গাঁক করে উঠল কমান্ডার। এক পা এগোল। মুখটাকে নিচু করে রেখেছে। ঠেলে বেরিয়ে এসেছে কাঁধের হাড়।

মতলব ভাল না কুকুরটার। আর দাঁড়িয়ে থাকতে সাহস করল মুসা। ঘুরে দিল দৌড়।

ভয়ঙ্কর এক হাঁক ছেড়ে কুকুরটাও পিছু নিল তার।

দিশেহারার মত এদিক ওদিক তাকাল মুসা। বাগানের একধারে একটা ম্যাপল গাছ জন্মে আছে। ছুটল ওটার দিকে।

দৌড়ে সাধারণ কুকুরের সঙ্গে পারাই অসম্ভব ব্যাপার, আর এটা তো ভূতুড়ে কুকুর। মরিয়া হয়ে বাগানের ওপর দিয়ে লাফাতে লাফাতে ছুটল মুসা। প্রাণ বাঁচানোর তাগিদ। তার ধারণা দৌড়ে বিশ্ব রেকর্ড করে ফেলছে। পেছন ফিরে তাকানোর দরকার নেই, ডাক শুনেই বুঝতে পারছে তীরগতিতে ছুটে আসছে কুকুরটা।

গাছটার কাছে পৌঁছে গেল সে। ফিরে তাকিয়ে সময় নষ্ট করল না। লাফ দিয়ে ধরে ফেলল নিচের ডালটা। এক দোলা দিয়ে উঠে গেল ওপরে।

খটাস করে দাঁতে দাঁতে বাড়ি লাগার শব্দ হলো। লাফিয়ে উঠে কামড়ে দেয়ার চেষ্টা করেছে কমান্ডার। আর একটা মুহূর্ত দেরি হলেই মুসার পায়ে লাগত কামড়। অল্পের জন্যে বেঁচেছে। তাড়াতাড়ি আরও কয়েক ডাল ওপরে উঠে গেল সে।

একটা কাজই করতে হবে এখন, চুপচাপ বসে থাকা। সূর্য ওঠার অপেক্ষায়। তখন আর মন্ত্র কাজ করবে না। আবার স্বাভাবিক কুকুরে পরিণত হবে কমান্ডার। সহজেই নেমে বাড়ি চলে যেতে পারবে মুসা।

মনে পড়ল রবিনের কথা। ওর কি হলো? স্কুলটায় পৌঁছে গেছে? আর কিশোর? সে কোথায়?

গাছের নিচে একনাগাড়ে গরগর করছে কমান্ডার। মাঝে মাঝে হাঁক ছাড়ছে, দাঁত কিড়মিড় করছে। ভাগ্যিস কুকুর গাছে উঠতে পারে না! ওঠার সব রকম চেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হচ্ছে ওটা। ভূত হয়েও গাছে ওঠার ক্ষমতা অর্জন করতে পারেনি। চোখ দুটো জ্বলছে জ্বলন্ত কয়লার মত।

নাহ্, নিশ্চিন্তে বসে থাকা আর যাচ্ছে না। উসখুস করতে লাগল মুসা। রবিনকে সাহায্য করতে হবে। কিশোরের কি অবস্থা তাই বা কে জানে!

গাছে ওঠার জন্যে লাফালাফি করছে কমান্ডার। একেক লাফে তিন-চার হাত শূন্যে উঠে যাচ্ছে। মাটিতে পড়ে সোজা হওয়ার জন্যে খানিকটা সময় নিচ্ছে। তারপর আবার লাফ।

ডাল ধরে ঝুলে পড়ল মুসা। কুকুরটা আবার লাফ দিতেই আলগোছে ছেড়ে দিল হাত। ধুপ করে মাটিতে পড়ল ওটার আগে। পড়েই দৌড়।

মাটিতে পড়ে সোজা হতে একটা সেকেন্ড সময় নিল কমান্ডার। ওপরে তাকিয়ে দেখে মুসা নেই। শব্দ শুনে বুঝল কোথায় আছে। ঘাউ করে বিকট হাঁক ছেড়ে সেও পিছু নিল।

যেদিক দিয়ে বাগানে ঢুকেছিল মুসা, সেদিকে ছুটল। চোখে পড়ল কলটা। চকিতে বুদ্ধি খেলে গেল মাথায়। মোড় নিয়ে ছুটল কলের দিকে।

নিচু হয়ে তুলে নিল পাইপের মাথাটা। কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে ছিল বলে পেঁচিয়ে গেছে রবারের পাইপ। ছাড়ানোর সময় নেই। হ্যাঁচকা টানে মাথাটা ফুট দুয়েক বের করে আনল সে। আরেক হাতে মোচড় দিল কলের চাবিতে।

এসে গেছে কমান্ডার। ঝাঁপ দিতে তৈরি হচ্ছে।

জ্যান্ত সাপের মত নড়ে উঠল পাইপটা। ফিনকি দিয়ে পানি বেরিয়ে এল মুখ থেকে। ঘুরে গেল মুসা। তাক করে ধরল কুকুরটার দিকে।

তীরবেগে নাকে-মুখে পড়ল পানির ধারা। আর্ত চিৎকার করে উঠল কমান্ডার। কুকুরকে এ রকম বীভৎস চিৎকার করতে আর কখনও শোনেনি মুসা। ঘাড়ের রোম দাঁড়িয়ে গেল ওর।

পিছিয়ে গেল কমান্ডার। সামলে নিয়ে আবার হামলা করতে এল।

এবার ওর মুখ সই করে পানি ছিটাল মুসা। ভিজিয়ে দিল গা-মাথা।

আগের বারের মতই আরেকটা চিৎকার করে আবার পিছিয়ে গেল কমান্ডার। তবে আর এগোল না। লেজ গুটিয়ে কুঁই কুঁই করতে করতে বাগান

পার হয়ে চলে গেল বাড়ির পেছনে।
চাবি ঘুরিয়ে পানির জোর কমাল মুসা। পাইপের মুখের কাছে পিস্তলটা ধরে ওটার চেম্বার ভর্তি করে নিল।
কুকুরটা যেদিকে গেছে তার উল্টো দিকে ছুটল সে। আর ভয় করে না। হাতে আছে পানি ভরা পিস্তল।
একছুটে রাস্তা পার হয়ে মাঠে নামল। কোণাকুণি ছুটল স্কুলের দিকে। কানে এল একটা পরিচিত শব্দ, 'হল্ট! ঝামেলা!'
মাঠ পেরিয়ে এসে চৌরাস্তার মাথায় ফগকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল মুসা। হেলমেট পরা। লেজ নাচাচ্ছে বানরের মত।
ভূতেদের ঈদ লেগে গেল নাকি আজ! সব ক'টাই বেরিয়ে আসছে! রবিন আর কিশোরের কি অবস্থা? ভূতের হাতে ধরা পড়ল না তো? যে হারে বেরোচ্ছে পিশাচের দল!
চট করে ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল মুসা। ওকে দেখলেই শিম্পাঞ্জীর মত তিড়িং করে লাফ দেবে ফগ। ডিগবাজি খেয়ে ছুটে আসবে ধরার জন্যে।
দেখতে পেল না ফগ। আপনমনে রাস্তা ধরে এগিয়ে চলল। সোজা স্কুলটার দিকে।
কঁচাক!
থমকে দাঁড়াল মুসা।
সুপারমার্কেটের কাছ থেকে বেরিয়ে এসেছে শুঁয়া-দানব ফ্র্যাঙ্ক হেয়ার। ঘিনঘিনে সবুজ শরীর বাঁকিয়ে শুঁয়াপোকার মত কিলবিল করতে করতে ছুটে আসছে। দাঁত খিঁচাল ওটা। তেকোনা ভয়াল দাঁতগুলো দেখাল মুসাকে।
পিস্তল তাক করে ট্রিগার টিপল মুসা। মুখে লাগল পানি। বিদ্যুতের শক খেল যেন ওটা, শরীরটাকে ঝাঁকি দিয়ে পিছিয়ে গেল।
আরেকবার গুলি করল মুসা। শুঁয়াপোকার মত শরীরের ঠিক মাঝ বরাবর লাগল পানি।
ঝট করে শরীর গুটিয়ে ফেলল দানবটা। একটা সেকেন্ড বিরতি দিয়ে আস্তে আস্তে সোজা করল। মুসার দিকে এগোতে সাহস করল না আর। যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকে চলে গেল আবার।
চারপাশে তাকাল মুসা। আর কোন ভূতকে আসতে দেখল না।
দুটো ব্লক পেরোলেই স্কুলটা। ছুটল আবার। চলে এল স্কুলের কাছে।
আলো ফুটেছে আরেকটু। রবিনকে দেখল না।
'রবিন!' চিৎকার করে ডাকল মুসা।
সাড়া নেই।
কোথায় গেল ও? স্কুল-বাড়িটা নেহায়েত ছোট নয়। কোথায় লুকিয়েছে রবিন? ধরে নিয়ে গেল না তো হেমিংদের খুদে ইবলিসগুলো? নাকি অন্য কোনটায় ধরল?
'বাঁচাও! বাঁচাও!' চিৎকার শোনা গেল স্কুলের পাশে বাচ্চাদের খেলার

মাঠটা থেকে।

পিস্তল হাতে দৌড় দিল মুসা।

রবিনকে দেখা গেল। একটা স্লাইডের মাথায় চড়ে বসে আছে। ওকে ধরার জন্যে লোহার মই বেয়ে উঠছে দুটো খুদে ইবলিস। আরেকটা দাঁড়িয়ে আছে নিচে।

সবচেয়ে ওপরের ইবলিসটাকে লাথি মেরে ফেলে দেয়ার চেষ্টা করল রবিন।

নিচে থেকে থাবা মারল ইবলিসটা। বাঁকা নখ দিয়ে পা আঁকড়ে ধরতে পারলে টেনে রবিনকে নিচে ফেলে দেবে।

পিস্তল তুলে এগিয়ে গেল মুসা।

আবার লাথি মারতে গিয়ে পা ফসকাল রবিন। তাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেল কাত হয়ে। ভাগ্য ভাল, মাটিতে না পড়ে পড়ল স্লাইডের ওপর। পিছলে নেমে আসতে শুরু করল। হি হি করে হাসছে মাটিতে দাঁড়ানো তৃতীয় ইবলিসটা। রবিনকে ধরার জন্যে হাত বাড়াল।

বারো

স্লাইডের কিনার ধরে পতন ঠেকানোর চেষ্টা করছে রবিন। ধরে রাখতে পারছে না। পিছলে গেল হাত। আবার থাবা মারল অন্য পাশে। খামচে ধরল আরেক কিনার।

হুড়াহুড়ি করে মই বেয়ে নামতে শুরু করল ইবলিস দুটো। দুই ধাপ নেমেই হাত ছেড়ে দিয়ে লাফিয়ে নামল মাটিতে। ছুটে গিয়ে তৃতীয় ইবলিসটার গা ঘেঁষে দাঁড়াল। রবিন নিচে নামলেই ধরবে।

আবার ওপরে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা শুরু করল রবিন। একটা ইঞ্চিও এগোতে পারল না। জুতোই রাখতে পারছে না স্লাইডে, পিছলে যায়। আবার গেল হাত ছুটে। শাঁ করে নেমে চলে এল অনেকখানি। ওর গোড়ালি খামচে ধরল একটা ইবলিস।

হি হি হি! হাসছে ওরা। পাগলের মত হেসে চলেছে, হি হি হি।

পেছন থেকে পিস্তল তাক করে ধমকে উঠল মুসা, 'সরো!'

ফিরে তাকাল একটা ইবলিস।

ওর মুখে গুলি করল মুসা।

কুঁকড়ে গেল ওটা।

আরেকটাকে সই করে আবার গুলি করল মুসা।

সরে যেতে শুরু করল তিন ইবলিস। রবিনকে ছাড়ল না। পা ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে চলল। ভূত হয়ে শক্তি অনেক বেড়ে গেছে ওগুলোর।

'ছাড়ো ওকে!' চিৎকার করে উঠল মুসা।
হি হি হি! হাসছে ওরা।
খেপার মত লাফ দিয়ে গিয়ে সামনে পড়ল মুসা। এক এক করে গুলি করতে লাগল একেকটার মুখ সই করে। আরও কয়েক সেকেন্ড রবিনকে ধরে রাখল ওরা। তারপর ছেড়ে দিয়ে লাফিয়ে সরে দাঁড়াল। পানি থেকে বাঁচার জন্যে দু'হাতে মুখ ঢাকল।
ঘুরে এসে পেছন থেকে মুসাকে ধরার চেষ্টা করল একটা ইবলিস।
গুলি করে ওটাকে সরিয়ে দিল সে।
চিৎকার শোনা গেল পেছনে, 'হল্ট! ঝামেলা! ঝামেলা!'
ফিরে তাকাল মুসা। ওর দিকে তেড়ে আসছে ফগ।
লাফিয়ে একপাশে সরে গেল মুসা। পুরোপুরি কাটাতে পারল না। ফগের কাঁধের ধাক্কা লাগল ওর গায়ে। হাত থেকে উড়ে চলে গেল পিস্তলটা।
তুলে আনার জন্যে দৌড় দিল সে। কিন্তু কাছে যাওয়ার আগেই ওটা তুলে নিল একটা ইবলিস।
ঘুরে দাঁড়িয়েছে ফগ। 'ঝামেলা! ওহ্, ঝামেলা!' বলে ডিগবাজি খেল একবার। তেড়ে এল।
'পালাও!' চিৎকার করে রবিনকে বলল মুসা।
দৌড় দিল দুজনে। ঘাসের ওপর দৌড়াতে তেমন অসুবিধে হলো না। কিন্তু আঙিনার পাকা চত্বরে উঠে আসতে পিছলে যেতে লাগল শিশিরে ভেজা জুতোর তলা। সড়াৎ করে পিছলে গিয়ে আছাড় খেল রবিন। ওকে উঠতে সাহায্য করল মুসা। আবার দৌড় দিতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। সামনে পথ রুদ্ধ।
উড়ে আসছে লাল ভূতটা। চোখ দুটো জ্বলছে।
কঁচাক!
ঝট করে পাশে ফিরে তাকাল মুসা। শরীর বাঁকিয়ে দ্রুত ছুটে আসছে শুঁয়া-দানব।
পেছনে শোনা গেল ঘেউ ঘেউ। লম্বা দাঁত বিকশিত করে ছুটে আসছে কমান্ডার।
উদভ্রান্তের মত চারপাশে তাকাতে লাগল মুসা। পালানোর পথ নেই। সব পথ আটকে দিয়ে এগিয়ে আসছে ভূতগুলো। খপ করে রবিনের একটা হাত চেপে ধরল সে। টেনে নিয়ে ছুটল বাড়ির সিঁড়ির দিকে। ধাপ বেয়ে উঠে এল বারান্দায়। সামনে যে দরজাটা পড়ল, জোরে ঠেলা মারল ওটাতে।
খুলল না। দরজা বন্ধ। এ সময় তালা দেয়া থাকে।
চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরে তাকাল সে। সিঁড়ির গোড়া থেকে সামান্য দূরে বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে রবিন। ধাপ বেয়ে উঠে আসতে আরম্ভ করেছে ভূতগুলো। বিকৃত হাসি, গরগর, ফোঁস-ফোঁস, তীক্ষ্ণ শিস, সব চলছে সমানে।
এক ধাপ করে ওঠে ওগুলো, আর এক পা করে পিছায় দুজনে। দরজায় গিয়ে ঠেকল পিঠ। আর পিছানোরও জায়গা নেই।

রবিনের দিকে ফিরল মুসা।

চোখ বন্ধ করে ফেলেছে রবিন। তাকাতে সাহস পাচ্ছে না। মরবে তো জানা কথাই। যা ঘটার চোখ বোজা অবস্থায় ঘটুক।

ঠিক এই সময় আকাশ থেকে যেন উড়ে এসে পড়ল একটা নীল বস্তু। মুসার পায়ের কাছে পড়ে ফটাৎ করে ফাটল। পানি ছিটকে পড়ল চারদিকে।

লাফিয়ে পিছিয়ে গেল ভূতগুলো। দ্বিধায় পড়ে গেছে।

উড়ে এল আরেকটা একই জিনিস। সিঁড়ির মাথায় পড়ে ফাটল। আবার ছিটকে গেল পানি।

চিৎকার করে সিঁড়ির গোড়ায় নেমে গেল সব কটা ভূত।

ফুলগাছের আড়াল থেকে বেরোল কিশোর আর ডুয়েন। দৃঢ় পায়ে এগিয়ে এল ভূতগুলোর দিকে। দুজনের হাতে দুটো পলিথিনের ব্যাগ। ভারী কিছু রয়েছে ওগুলোতে।

দুজনেই হাত ঢোকাল যার যার ব্যাগে। বের করে আনল দুটো নীল গোল জিনিস। চিনতে পারল মুসা আর রবিন। পানি ভরা ছোট বেলুন।

ভূতগুলোকে সই করে দুটো বেলুন ছুঁড়ে মারল দুজনে।

কুঁকড়ে গেল ভূতের দল। কোন্ দিকে যাবে ঠিক করতে পারছে না। বেসামাল হয়ে হুড়াহুড়ি করে উঠে আসতে শুরু করল আবার সিঁড়ি বেয়ে।

আরও দুটো বেলুন এসে পড়ল দানবগুলোর মাঝে। ছিটকে দুদিকে সরে গেল ওগুলো। সিঁড়ির দুই পাশ দিয়ে লাফিয়ে মাটিতে পড়তে শুরু করল।

সিঁড়িটা ফাঁকা হয়ে যেতেই দৌড়ে বারান্দায় উঠে এল কিশোর। ব্যাগ থেকে দুটো বেলুন বের করে রবিন আর মুসার হাতে দিয়ে বলল, 'মারো ব্যাটাদের!'

ডুয়েনও ওপরে উঠে এল।

হাসি ফুটেছে মুসা আর রবিনের মুখে। খানিক আগেও ওরা ছিল শিকার, প্রাণের ভয়ে অস্থির; এখন ওরা শিকারী। একের পর এক বোমা ছুঁড়ে মারতে লাগল ভূতগুলোকে সই করে।

পালাতে শুরু করল ভূতের দল। যে যেদিকে পারল দে দৌড়। লেজ নাচিয়ে লাফাতে লাফাতে ছুটল ফগ। বোমা হাতে পিছু নিল গোয়েন্দারা। হেসে অস্থির।

রবিন বলল, 'ইস্, একটা ক্যামেরা থাকলে হত এখন! ফগের ছবি তুলে রাখতে পারতাম। আমাদের সঙ্গে লাগতে এলেই দেখিয়ে দিতাম লেজটা!'

'তাহলে আর এ গাঁয়ে থাকত না ফগ,' হা হা করে হাসছে মুসা। 'সোজা পাহাড়ে গিয়ে সন্ন্যাসী হত।'

চলে গেল ভূতের দল।

সন্ন্যাসীর দিকে তাকাল মুসা, 'থ্যাংকস, ডুয়েন।'

'বাঁচার আশা ছেড়েই দিয়েছিলাম আজ!' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল রবিন।

'ধন্যবাদটা ওকে দাও,' কিশোরকে দেখাল ডুয়েন। 'ও গিয়ে খবর না দিলে কিছুই করতে পারতাম না। ছুটতে ছুটতে কুঁড়েতে গিয়ে হাজির। বলল,

ভূতে তাড়া করেছে। সাহায্য চাই। আত্মরক্ষার জন্যে সব সময় তৈরি থাকি আমি। এক ব্যাগ বোমা রেডি রেখেছিলাম। দুজনে মিলে তাড়াতাড়ি আরও এক ব্যাগ বানিয়ে নিয়ে ছুটলাম। দূর থেকেই শুনতে পাচ্ছিলাম তোমাদের চিৎকার।'

'এক্কেবারে সময়মত এসেছেন,' ধপ করে মাটিতে বসে পড়ল মুসা। 'আরেকটু দেরি করে এলে কি যে হত...'

'তোমাদের সাবধান থাকতে বলেছিলাম। বলিনি?'

'ছিলাম তো। পিস্তল নিয়ে বেরিয়েছি। তবে বোকামিও করেছি। অস্ত্র নিয়ে বেরিয়ে আর কোনদিন অহেতুক গুলি খরচ করব না...'

'কিন্তু এর একটা বিহিত দরকার,' ঝাঁঝাল কণ্ঠে বলল রবিন। 'ভোরবেলা বেরোলেই বিপদে পড়তে হবে, কাঁহাতক সহ্য করা যায়। শুধু আমরা নই, যে বেরোবে, সে-ই পড়বে।'

'আমার মনে হয় বিহিত একটা হয়ে যাবে,' কিশোর বলল। 'এ সবের কারণটা খুঁজে বের করেছি আমি।' পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বের করে দেখাল সে। তাতে গোল একটা চক্র আঁকা। ভেতরে অদ্ভুত সব নকশা। দুর্বোধ্য অক্ষরে কি সব লেখা। ডুয়েনকে দেখাল, 'এ জিনিস দেখেছেন কখনও?'

'দেখেছি,' মাথা ঝাঁকাল ডুয়েন। 'ব্ল্যাক ম্যাজিক যারা প্র্যাকটিস করে তারা এ সব আঁকে। যদ্দূর জানি এই সার্কেলের ওপর বসে প্রেতকে ডেকে আনে ওরা।'

'রবিনের চিঠি পড়েই সন্দেহ হলো, কোন প্রেতসাধকের কাজ,' কিশোর বলল। 'ছুটলাম লাইব্রেরিতে। রকি বীচ লাইব্রেরিতে ব্ল্যাক ম্যাজিকের ওপর যত বই পেয়েছি, সব ঘেঁটেছি। একটা বইতে পেলাম, এ সব নকশাকে বলে হেক্স সাইন। অনেক রকমের জাদু করা যায় এর সাহায্যে। ম্যাজিক চক দিয়ে গোপনে লোকের বাড়িতে বিশেষ ধরনের হেক্স এঁকে রেখে এলে কিছুটা সময়ের জন্যে তাকে ভূত বানিয়ে ফেলাও সম্ভব। তার প্রমাণ তো একটু আগেই পেলাম।'

'আমারও সন্দেহ ছিল, এ রকম কিছুই করছে কেউ। সেই লোকটাকে খুঁজে বের করতে হবে এখন।'

'তার আগে মানুষগুলো যাতে আর ভূত না হয়, তার ব্যবস্থা করতে হবে,' বলল কিশোর। 'আমি শিওর, যারা যারা ভূত হয়েছে, তাদের সবার বাড়িতে কোথাও না কোথাও হেক্স সাইন আঁকা আছে। মুছে ফেলতে হবে ওগুলো।' দুই সহকারীর দিকে তাকাল সে। 'যাবে মুছতে? ভয় পাচ্ছ? মুসা?'

'ভয়? নাহ্! চলো।'

ডুয়েন জিজ্ঞেস করল, 'আমাকে দরকার আছে আর?'

'না,' মাথা নাড়ল কিশোর। 'যা করেছেন, যথেষ্ট। অনেক ধন্যবাদ।'

'ধন্যবাদের আর কি আছে, নিজের উপকারই তো করলাম। ভূতের যন্ত্রণায় ভোরবেলা ঘর থেকে বেরোতে পারি না। কি হয়, জানিয়ো।'

রওনা হয়ে গেল ডুয়েন।

'কি দিয়ে মুছবে?' কিশোরকে জিজ্ঞেস করল রবিন।

'চকে আঁকা হলে পানি দিয়েই মুছে ফেলা যাবে। আর রঙ বা মার্কারে হলে,' পকেট থেকে একটা শিশি বের করল কিশোর। ঝাঁকি দিল। নেচে উঠল ভেতরের তরল পদার্থ। 'এ জিনিস দিয়ে মুছব। এর মধ্যে পেইন্ট থিনার আছে।'

প্রথমে হেমিংদের বাড়িতে রওনা হলো ওরা। সাইকেল ফেলে এসেছে। ওখানে পৌঁছে তিন বোনকে দেখল না কোথাও।

সাইকেলের সীটের নিচে গুঁজে রাখা একটা ন্যাকড়া বের করে নিল কিশোর। 'এখান থেকেই খোঁজা শুরু করা যাক।'

বাড়ির ভেতর ঢুকল তিন গোয়েন্দা। হেক্স সাইনটা পাওয়া গেল বারান্দার রেলিঙের একটা চারকোণা পিলারের গায়ে। ম্যাজিক মার্কার দিয়ে আঁকা।

পেইন্ট থিনার দিয়ে সহজেই মুছে ফেলা গেল ওটা।

এরপর বাজ নিউম্যানের পেট্রল পাম্পে গেল ওরা। একটা জানালার নিচে দেখতে পেল হেক্স সাইন। মুছল ওটা।

তারপর গেল ফগর‍্যাম্পারকটের বাড়িতে। ছাউনির দরজায় আঁকা সাইনটা মুছল। রওনা হলো সুপারমার্কেটে।

হেয়ার যে দোকানে চাকরি করে সেটার পেছনের দরজার পাশে আঁকা রয়েছে হেক্স সাইন। নেকড়ায় থিনার মিশিয়ে ডলতে ডলতে মুসা বলল, 'এখানে তো অনেক লোক কাজ করে। আর কেউ না হয়ে শুধু হেয়ার দানব হলো কেন?'

'নিশ্চয় সাঙ্কেতিক অক্ষরে ওর নাম লেখা হয়েছে নকশার মধ্যে,' জবাব দিল কিশোর। 'এটা করা যায়, বইতে লেখা আছে।'

হকিনসদের বাড়িতে রওনা হলো এরপর। কমান্ডারকে জাদুর প্রভাব-মুক্ত করতে হবে।

বাড়ির পেছন দিকে কুকুরের ঘর। সাইনটা ওখানেই আঁকা আছে, অনুমান করল কিশোর। হকিনসদের বাগানে ঢুকে ঘাস মাড়িয়ে সেদিকে এগোল তিনজনে।

বাড়ির এককোণ থেকে বেরিয়ে এল কমান্ডার। জাদুর প্রভাব কাটেনি ওর। গরগর করছে।

মুসা বলল, 'তোমরা গিয়ে সাইনটা খুঁজে বের করো। আমি ওকে আটকে রাখছি।' হাত নেড়ে কুকুরটাকে ডাকল সে। 'কমান্ডার, লক্ষ্মী কুকুর, আয় এদিকে।'

লক্ষ্মী কুকুর অলক্ষ্মীর মত জবাব দিল, 'গাররর!' দাঁতে দাঁত ঘষল।

ভয় পেয়ে গেল মুসা। কুকুরটাকে সময় দিয়ে ভুল করে ফেলেছে। ম্যাপল গাছটার কাছে যাওয়ার সময় নেই এখন। দৌড়েও বেশি দূর যেতে পারবে না। ধরে ফেলবে। কথা বলেই শান্ত রাখার চেষ্টা করল মুসা।

কিন্তু ভূত কি আর শান্ত হয়। নাক নিচু করে আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে

এগিয়ে আসতে শুরু করল।

কি করবে বুঝতে পারছে না মুসা। শেকড় গজিয়ে গেছে যেন পায়ে। নড়তে পারছে না।

আচমকা বিকট গর্জন করে লাফ দিল কুকুরটা।

লক্ষ্যচ্যুত করার জন্যে একপাশে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল মুসা। ঘাসের ওপর এক গড়ান দিয়ে সোজা হলো। কণ্ঠনালীতে কামড় বসানোর আগেই কুকুরটার গলা টিপে ধরতে প্রস্তুত।

কিন্তু ওকে অবাক করে দিয়ে হঠাৎ একেবারে শান্ত হয়ে গেল কমান্ডার। সুবোধ ভঙ্গিতে লেজ নাড়তে নাড়তে এগিয়ে এসে ওর গাল চেটে দিল। তারমানে সাইনটা খুঁজে পেয়েছে কিশোররা।

বাড়ির পাশ ঘুরে বেরিয়ে এল ওরা দুজনে। দূর থেকেই হেসে বলল কিশোর, 'কাজ হয়েছে দেখা যাচ্ছে। কুকুরের ঘরের বেড়ায় আঁকা ছিল হেক্স সাইন।'

কমান্ডারের পেট চুলকে দিচ্ছে মুসা। 'লক্ষ্মী কুকুর। আর তোকে ভূত হতে হবে না।'

'শুধু আর একজন বাকি,' রবিন বলল। 'মিসেস ডেনভার।'

কিশোর বলল, 'তোমরা মুছতে পারবে না?'

'না পারার কি আছে? তুমি যেতে চাও না তো?'

ক্লান্ত স্বরে বলল কিশোর, 'না। অনেক রাতে এসেছি। তারপর ভোররাতে ওঠা। ঘুম হয়নি। খুব টায়ার্ড লাগছে। বাড়ি গিয়েই শুয়ে পড়ব।'

রবিনের দিকে তাকাল মুসা, 'তোমারও আর কষ্ট করে আসার দরকার নেই। তুমিও বাড়ি চলে যাও। আমি একাই পারব।'

মুসার হাতে পেইন্ট থিনারের শিশিটা দিল কিশোর। 'দুপুর বেলা আসব তোমাদের বাড়িতে। থেকো। কথা আছে।'

সাইকেলে চেপে রওনা হয়ে গেল কিশোর।

রবিন চলে গেল তার সঙ্গে।

উল্টো দিকে সাইকেল চালাল মুসা।

মিসেস ডেনভারের বাড়িতে এসে সাইকেল নিয়ে ঢুকে পড়ল। পাশ দিয়ে ঘুরে চলে এল পেছন দিকে।

রান্নাঘরের জানালার নিচে হেক্স সাইনটা দেখতে পেল সে। মোছার জন্যে সবে হাত বাড়িয়েছে, বরফের মত শীতল, সাঁড়াশির মত কঠিন কয়েকটা আঙুল চেপে ধরল তার গলা।

তেরো

'মুসা, ও মু-সা!'

কানের কাছে সুর করে বলল একটা কিঁচকিঁচে তীক্ষ্ণ কণ্ঠ। আঙুলগুলো শক্ত হয়ে চেপে বসেছে। চাপ বাড়ছে ক্রমেই।

'মুসা, ও মু-সা!' আবার বলল কণ্ঠটা। আরও জোরে চেপে বসল আঙুল।

টেনে ছাড়ানোর চেষ্টা করল মুসা। পারল না। ইস্পাতের মত কঠিন। চোখের সামনে লাল-নীল তারা দেখতে পাচ্ছে ও। অবশ হয়ে আসছে হাত-পা। অক্সিজেনের জন্যে আকুলি-বিকুলি করছে ফুসফুস।

হঠাৎ ঢিল হয়ে গেল মিসেস ডেনভারের আঙুল।

পা দুটো শরীরের ভার ধরে রাখতে পারছে না। হাঁটু ভাঁজ হয়ে মাটিতে পড়ে যেতে যেতে কোনমতে সামলে নিল মুসা। ফিরে তাকাল।

গাছপালার ভেতর দিয়ে ভোরের প্রথম সূর্যরশ্মি এসে পড়েছে মিসেস ডেনভারের গায়ে। চুলে জট নেই আর তাঁর, এলোমেলোও নয়। চোখ দুটো স্বাভাবিক। মুসার দিকে তাকিয়ে হাসলেন, 'আজ তো পত্রিকা দেয়ার শেষ দিন তোমার?'

মাথা ঝাঁকাল মুসা। গলা ব্যথা করছে। হাত বোলাল আহত জায়গায়।

'কাল রাতে অনেক কুকি বানিয়েছি। এক মিনিট দাঁড়াও, নিয়ে আসি।'

ভেতরে চলে গেলেন মিসেস ডেনভার। এই সুযোগে সাইনটা মুছতে শুরু করল মুসা। সেও মোছা শেষ করল, মিসেস ডেনভারও বেরোলেন। হাতে একটা কাগজের পোঁটলা। মুসাকে দিলেন।

'থ্যাংক ইউ, মিসেস ডেনভার।'

*

বাড়ি ফিরে সোজা বিছানায় গিয়ে উঠল মুসা। দুই সেকেন্ডের মধ্যেই ঘুম।

'মুসা! মুসা!' ডাক শুনে ঘুম ভেঙে গেল ওর। চোখ মেলে দেখল বিছানার কাছে বিলি দাঁড়িয়ে। বেড়ানো শেষ করে ফিরে এসেছে। 'আরে আর কত ঘুমাবে? দুপুর তো হয়ে গেল।'

চোখ ডলতে ডলতে উঠে বসল মুসা। 'তুমি কখন এলে?'

'এই তো পনেরো মিনিট। বাড়ি ফিরে ব্যাগটা রেখেই আগে তোমার খোঁজ নিতে এলাম। তারপর, কেমন কাটালে এই কদিন? ঠিকঠাক মত পত্রিকা দিয়েছ তো?'

'পত্রিকা তো দিয়েছি। কিন্তু যা কাণ্ডটা হলো না!'

'কি কাণ্ড?'

'বললে বিশ্বাস করবে না।'

'কেন? নিশ্চয় সন্ন্যাসীটা কিছু করেছে। আমি জানতাম, সে করবে। ও জাদুকর। ভূত-প্রেত সব ওর গোলাম।'

'না, ডুয়েন খুব ভাল মানুষ।'

'মোটেও না। খুব খারাপ। ব্ল্যাক ম্যাজিক প্র্যাকটিস করে, আমি জানি।'

'প্রথম দিকে আমারও মনে হয়েছিল লোকটা খারাপ, কিন্তু পরে…'

'পরে কি? থামলে কেন?'

ভূত দেখার কথা বিলিকে বলতে চাইল না মুসা। বললে বিশ্বাস করবে না, হাসাহাসি করবে। যা তা বলে খেপাবে। হাত বাড়াল সে, 'তোমার কাজ করে দিয়েছি, এখন আমার টাকাটা দিয়ে দাও।'

কথা বাড়াল না বিলি। পকেট থেকে পঞ্চাশটা ডলার বের করে দিয়ে দিল। 'বললে না কিন্তু, ভোররাতে কি কাণ্ড হয়েছে।'

'না, কিছু না।'

'ভূতে তাড়া করেনি?'

'না।'

'তাহলে কাণ্ড হয়েছে বললে যে?'

'অমনি বললাম।'

'না, অমনি বলোনি। নিশ্চয় কিছু দেখেছ। মিসেস ডেনভার, ফ্র্যাঙ্ক হেয়ার, হকিনসদের কুকুরটা…'

আর মুখ বন্ধ রাখতে পারল না মুসা, 'ওরা যে ভূত হয় তুমি জানলে কি করে? তোমাকেও তাড়া করেছিল নাকি?'

'আমাকে করবে কেন? আমি কি ডরপোক? ভূতের নাম শুনলেই প্যান্ট খারাপ করি?'

রাগ হয়ে গেল মুসার, হাত নেড়ে বলল, 'তুমি এখন বিদেয় হও! আমি ঘুমাব!'

রাগ করল না বিলি। হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেল।

দুপুর বেলা কিশোর আর রবিন এলে তাকে সব কথা বলল মুসা।

শুনে গম্ভীর হয়ে গেল কিশোর। নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কয়েকবার। আচমকা মুখ তুলে বলল, 'এ সব কার শয়তানি, আন্দাজ করতে পারছি!'

'কার?' একসঙ্গে প্রশ্ন করল মুসা আর রবিন।

প্রশ্নের জবাব দিল না কিশোর। উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। 'মুসা, বিলি এ সময় কি করে? বাড়ি থাকে?'

'না। বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিতে যায়। দুপুরবেলা কোন সময়েই বাড়ি থাকে না সে। ওর বাবা-মা ঘরে থাকলেও না।'

উঠে দাঁড়াল কিশোর, 'এসো আমার সঙ্গে।'

'কোথায়?'

'বিলিদের বাড়িতে।'

দুই সহকারীকে নিয়ে বিলিদের বাড়িতে এল কিশোর। আঙিনায় ঢুকল। নির্জন। কেউ নেই। সদর দরজায় তালা। তবে বিলির ঘরের একটা জানালা খোলা পাওয়া গেল। শার্সি ভেজানো। ভেতর থেকে ছিটকানি লাগানো নেই।

ঘরে ঢুকল তিনজনে।

খুঁজতে আরম্ভ করল কিশোর।

অবাক হয়ে দেখছে মুসা আর রবিন। কি খুঁজছে ও, বুঝতে পারছে না।

পড়ার টেবিলের তিনটে ড্রয়ারের সবচেয়ে নিচের ড্রয়ারটায়, একেবারে ভেতরের দিকে জিনিসটা খুঁজে পেল কিশোর। একটা অনেক পুরানো বই।

পাতাগুলো হলদে হয়ে গেছে। আলগা হয়ে আছে সব।

জ্বলজ্বল করছে কিশোরের মুখ।

ভেতরে কি লেখা দেখার জন্যে দুদিক থেকে ঝুঁকে এল রবিন আর মুসা। হাঁ হয়ে গেল দেখে। নানা রকম হেক্স সাইন আঁকা।

বইটা রবিনের হাতে ধরিয়ে দিয়ে আবার খুঁজতে শুরু করল কিশোর। বিলির বিছানার গদির নিচে পাওয়া গেল একটা ম্যাজিক মার্কার। দেখাল অন্য দুজনকে। 'কার শয়তানি বুঝতে পেরেছ তো এখন?'

'কিন্তু বিলি এ কাজ করতে গেল কেন?' মুসার প্রশ্ন।

'মজা দেখার জন্যে। কারও কাছ থেকে ব্ল্যাক ম্যাজিক শিখেছে ও। আজেবাজে জায়গায় ঘোরে তো, নিশ্চয় কোন গুরু পেয়েছে। বই আর মার্কারটা জোগাড় করেছে তার কাছ থেকে। চুরি করে আনলেও অবাক হব না। লোকের বাড়িতে হেক্স সাইন এঁকে রেখে এসেছে। দেখতে চেয়েছে সত্যি কাজ হয় কিনা,' মুসার দিকে তাকাল কিশোর, 'নিজের সাহস হয়নি ভূতের সামনে যাওয়ার। তাই তোমাকে বাছাই করেছে। ভূত দেখে এলে তাকে বলবে। সে বুঝতে পারবে তার আঁকা হেক্স সাইনে কাজ হয়েছে। মাঝখান থেকে নাকানি-চোবানি খাওয়া যা যাবে, সব তোমার ওপর দিয়ে।'

'আর আমি গাধা ঠিক তার ফাঁদে পা দিয়েছি!'

'তাতে ভালই হয়েছে। টাকাটা পেলে।'

'আর ভূতের তাড়া যে খেলাম?'

'একটা দারুণ অভিজ্ঞতা হলো।'

'কিন্তু গ্রীনহিলস থেকে চলে গেল কেন বিলি?' রবিনের প্রশ্ন।

'এখানে থাকলে যদি কোন বিপদ ঘটে ওর, তাই বেড়ানোর ছুতো করে কেটে পড়েছিল। হয়তো ভেবেছিল, পনেরো দিন পর ফিরে এসে হেক্স সাইনগুলো চুপচাপ মুছে দিয়ে আসবে আবার। কেউ কিছু জানতে পারবে না।'

'এখন নিশ্চয় মোছা দেখে অবাক হবে। যাই হোক, আরেকটা কথা, ডুয়েনের বদনাম করল কেন?'

'ভেবেছে, কোন অঘটন যদি ঘটে যায়, সন্ন্যাসীকে সন্দেহ করবে লোকে, সে বেঁচে যাবে। গাঁয়ের লোকে ডুয়েনকে এমনিতেই একটু অন্য চোখে দেখে।'

'বিলি শয়তানটাকে ধরে একটা ধোলাই দেয়া দরকার!' দাঁতে দাঁত চাপল মুসা।

'না, ধোলাই নয়। ভাবছি, ওর ওষুধই ওকে ফিরিয়ে দেব।'

'মানে?'

'আমরাও ওকে ভূতের তাড়া খাওয়াব।'

হাঁ করে তাকিয়ে রইল মুসা। 'ভূত কি রেডি হয়ে আছে নাকি তোমার জন্যে?'

'আছে,' বুঝে ফেলেছে রবিন। চোখ বড় বড় করে বলল, 'হেক্স সাইন এঁকে রেখে এলেই হবে। কার বাড়িতে আঁকবে, কিশোর?'

'অন্যের নয়, আমাদের নিজেদের বাড়িতেই। যার যার ঘরে।'

আঁতকে উঠল মুসা, 'বলো কি! নিজেরা নিজেদের ভূত বানাব?'

'অসুবিধে কি? বইটাতে ভূত বানানোর কায়দা-কানুন সব লেখা আছে। বিলি যদি বই দেখে কাজটা করতে পারে, আমরা পারব না কেন? তবে নিরীহ ভূত হব আমরা, একেবারেই নিরীহ, যাতে আবার খুনটুন করে না বসি। শুধু বিলিকে একটু ভয় দেখানো, ব্যস, আর কিছু না।'

'কিন্তু,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল মুসা, 'আমাদের ভূত ছাড়াবে কে?'

'আমরাই ছাড়াব। এক রাতের জন্যে ভূত হব। কাল ভোররাতে বিলিকে ভয় দেখানো হয়ে গেলে সকালেই সাইন মুছে ফেলব।'

ভোররাতে কাগজ দিতে বেরিয়ে তিন গোয়েন্দার ভূত দেখে বিলির কি অবস্থা হবে, কল্পনা করে হো হো করে হেসে উঠল মুসা। বলল, 'হ্যাঁ, এইটাই ওর মত শয়তানের উপযুক্ত শাস্তি। আমাকে খালি প্যান্ট খারাপ করার কথা বলে তো, আজ ওর প্যান্ট খারাপ না করিয়ে আমি ছাড়ব না। জীবনে আর আমাদের সঙ্গে ওস্তাদি করতে আসবে না।'

অন্য দুজনও হাসতে লাগল।

বইটা দেখিয়ে রবিন বলল, 'কিন্তু এটার কি হবে? ডেঞ্জারাস বই। খারাপ লোকের হাতে পড়লে যে কি অঘটন ঘটতে পারে, সে তো নিজের চোখেই দেখলাম।'

'পুড়িয়ে ফেলব,' কিশোর বলল। 'অত বিপজ্জনক জিনিস টিকিয়ে রাখার কোন মানে হয় না। যে হেক্স সাইনটা আমাদের দরকার, সাদা কাগজে সেটা নকল করে নিয়ে বইটা পুড়িয়ে ফেলব। মাত্র একবার ব্যবহার করব সাইনটা। তারপর কাগজ আর মার্কারটাও নষ্ট করে ফেলব। যাতে কেউ কোনদিন আর হাতে না পায় এ সব বাজে জিনিস।'

***
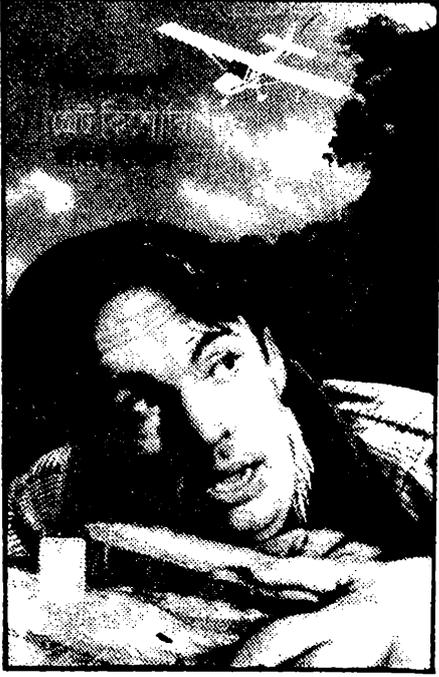
গ্রেট কিশোরিয়োসো

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৯

'একটা চীনা ধাঁধার সমাধান করতে চাও?' হাসিমুখে জিজ্ঞেস করলেন বিখ্যাত গোয়েন্দা ভিকটর সাইমন।

ও, এ জন্যেই এই জরুরী তলব। চেয়ারে হেলান দিল কিশোর। 'তা ধাঁধাটা কি আগে শুনি, তারপর বলব। আগেই বলে দিচ্ছি, স্যার, জটিল না হলে বিশেষ আগ্রহ নেই আমার।'

মুচকি হাসলেন মিস্টার সাইমন, 'তাহলে ধরেই নিতে পারি, কাজটা তুমি করছ।'

'তারমানে খুব জটিল, বলতে চাইছেন?'

'শোনো আগে, বুঝতে পারবে। গোড়া থেকেই শুরু করি, নাকি?'

'করুন। বুঝতে সুবিধে হবে।'

মাথা ঝাঁকালেন মিস্টার সাইমন। 'একটা দেবতাকে নিয়ে ঘটনা। সবুজ রঙের এক একচোখো দেবতা, চোখটা লাল।'

'দেবতারা সাধারণত একচোখোই হয়, পক্ষপাতিত্বের কথা বলছি আমি। তা এই বিশেষ দেবতাটি কে?'

'নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না এখনও। তবে খুব মূল্যবান।'

'এর বিশেষত্বটা কি?'

'কপালের একমাত্র চোখটা। অনেক বড় একটা চুনিপাথরে তৈরি।'

চেপে রাখা নিঃশ্বাসটা ফোঁস করে ছাড়ল কিশোর। 'সেই পুরানো কাহিনী। কবে যে লোকে বুঝবে, দেবতার চোখ সাধারণ কাঁচ দিয়ে তৈরি করাটাই নিরাপদ! তাহলে আর অন্য ধর্মের লোকে বেদি থেকে তুলে নিয়ে যাবার লোভ করবে না।...দেবতার শরীরটা কি দিয়ে তৈরি? সোনা?'

'না, পান্না। বিশাল এক আস্ত পাথর কেটে তৈরি। কম করে হলেও দুই পাউন্ড ওজনের।'

'কোনখানে জন্ম হয়েছিল এই পান্না-দেবতার? নাকি একচোখো চুনি বলব?'

'নাম দেয়ার ব্যাপারে তুমি ওস্তাদ,' আবার হাসলেন মিস্টার সাইমন। 'পান্না-দেবতাটা ভাল। সহজ। শুনতেও ভাল লাগে। জন্মস্থান নিয়ে বিশেষজ্ঞরা একমত হতে পারছেন না।'

'আপনি এখন চাইছেন, ওই দেবতাকে খুঁজে বের করি আমি?'

'হ্যাঁ।'

'কোথায় আছে ওটা কেউ নিশ্চয় জানে না?'

'জানলে কি আর বলতাম। পৃথিবীর যে কোনখানে এখন থাকতে পারে ওটা।'

'চমৎকার। জন্মস্থান কোথায় জানা নেই, কাদের দেবতা জানা নেই, পৃথিবীর যে কোনখানে থাকতে পারে...ভাল। রহস্যটা জটিলই। কিন্তু কোন সূত্রই কি দিতে পারেন না? গোড়া থেকে বলবেন বলেছিলেন?'

'বলছি। লস অ্যাঞ্জেলেস থেকে শুরু করা যাক। কুখ্যাত ওল্ড গ্যারিবাল্ড লেনের নাম শুনেছ?'

মাথা কাত করল কিশোর, 'হ্যাঁ। শুধু রোববারে খোলে। রাস্তার একমাথায় আপনার হাতঘড়িটা চুরি গেলে আরেক মাথার চোরাই মালের দোকানে গিয়ে কিনতে পারবেন ওখানে।'

'এখন আর অত খারাপ নেই। পুলিশ রেইড করে করে অনেক কমিয়ে দিয়েছে। যাকগে...এক রোববারে জন হারডেস্টি নামে এক সাধারণ ডক শ্রমিক ওল্ড গ্যারিবাল্ডের মার্কেটে গেল স্ত্রীর জন্যে একটা জন্মদিনের উপহার কেনার জন্যে। এ দোকান সে-দোকানে উঁকি দিতে দিতে অদ্ভুত একটা জিনিসের ওপর নজর পড়ল তার। বাড়িতে ম্যানটলপীসে সাজিয়ে রাখলে ভালই লাগবে কল্পনা করে বিশ ডলারে কিনে নিয়ে গেল ওটা। বাড়িতে তার কাছে পড়ে থাকল বহু বছর। দামী জিনিস, জানতই না জন। ও ভেবেছে আসন গেড়ে বসা সবুজ কাঁচের তৈরি একটা উদ্ভট মানুষের মূর্তি। কপালের বড় লাল চোখটাও সাধারণ কাঁচে তৈরি। মাথার ভেতরে বা চোখের পেছনে কোনখানে ফোকর-টোকর আছে, যেটা দিয়ে আলো আসে, জ্বলজ্বল করে জ্বলে চোখটা। পরিবারের লোকেরা নাম রেখেছিল ওল্ড জো। বাচ্চারা কান্নাকাটি করলে ওদের হাতে তুলে দিয়ে কান্না থামানো হতো অনেক সময়। ক্রিসমাসের সময় কেকের ওপর বসিয়ে দিয়ে মজা করত।'

'হ্যাঁ, এ ধরনের ঘটনা ঘটে,' কিশোর বলল। 'এই সেদিনই একটা ম্যাগাজিনে পড়লাম—জনের মতই আরেক লোক স্ত্রীকে একটা কালো পাথরের মালা কিনে উপহার দিয়েছিল। মাত্র তিরিশ ডলার দিয়ে চোরাই মালের দোকান থেকে কিনেছিল। বহু বছর ওরা বুঝতে পারেনি অনেক দামী কালো মুক্তার মালা ওটা। যখন জানল, বিক্রি করতে নিয়ে গিয়ে তো ভিরমি খেয়ে পড়ার জোগাড় হয়েছিল লোকটার। তিরিশ ডলারের মালা বেচে এসেছে তিন লাখ ডলারে। সে-জন্যেই ছাপা হয়েছে ম্যাগাজিনে।'

'ওই মালার মতই অবস্থা হয়েছিল ওল্ড জো'র বেলাতেও। একদিন জন তার এক বন্ধুকে দাওয়াত করে আনল একসঙ্গে বসে মদ খাওয়ার জন্যে। সেই লোক মূর্তিটা হাতে তুলে নিয়ে দেখতে দেখতে মজা করে বলল, এত দামী জিনিস এ ভাবে হেলাফেলা করে রেখেছ। কথাটা মাথায় ঢুকে গেল জনের। দিন কয়েক পরে একটা বাজারের ব্যাগের মধ্যে ভরে মূর্তিটা নিয়ে গেল এক নামকরা জুয়েলারের দোকানে।'

'দাম কত জিজ্ঞেস করল নিশ্চয়ই?' আগ্রহ আর কৌতূহল এখন তুঙ্গে উঠে গেছে কিশোরের।

'না, অত বোকা না জন। জানত, জিনিসটা সত্যি সত্যি দামী হয়ে থাকলে, সে তাড়াহুড়া করলে দাম কম দিতে চাইবে দোকানি। তাকে ঠকানোর চেষ্টা করবে। সে জিজ্ঞেস করল, মূর্তিটা পরিষ্কার করে দিতে ওরা কত টাকা নেবে। সোজা ম্যানেজারের ঘরে ঢুকে গেল তার অ্যাসিসট্যান্ট। খানিক পর হন্তদন্ত হয়ে ম্যানেজার নিজেই বেরিয়ে এল। ওর চোখ দেখেই যা বোঝার বুঝে ফেলল জন। শক্ত হয়ে গেল মনে মনে। ম্যানেজার যখন জানতে চাইল, "মূর্তিটা কোথায় পেলেন?" শীতল কণ্ঠে জবাব দিল জন, "সেটা আপনার জানার দরকার নেই।" ম্যানেজার জিজ্ঞেস করল, "বিক্রি করবেন?" সামান্য দ্বিধা করে জন বলল, ভাল দাম পেলে করবে। তবে জিনিসটা তার নয়, তার স্ত্রীর। স্ত্রীকে জিজ্ঞেস না করে কিছু করতে পারবে না। ম্যানেজার তাকে পরদিন অবশ্য-অবশ্যই মূর্তিটা আবার নিয়ে যেতে বলে দিল। তখন ওটার দাম জানাবে।

'পরদিন গিয়ে হাজির হলো জন। প্রথমবারেই দেড় লাখ ডলার বলে ফেলল ম্যানেজার। তার অতি আগ্রহ দেখে আরও শক্ত হয়ে গেল জন, যদিও বুকের মধ্যে কাঁপুনি শুরু হয়ে গেছে তার। দরাদরি করে শেষে দুই লাখ ডলারে রাজি হলো।

'দুই লাখ ডলারের চেক পকেটে নিয়ে প্রায় উড়তে উড়তে বাড়ি ফিরে এল জন। মূর্তিটা তারপর দিনই বিক্রি করে দিল ম্যানেজার। কততে, সেটা জানা যায়নি। তবে নিশ্চয় মোটা লাভে।'

'হুঁ। জনও খুশি, ম্যানেজারও খুশি। তারপর?'

'জানাজানি হয়ে গেল কথাটা। এ সব নিয়ে যারা গবেষণা করে, তারা লাগল পেছনে। প্রথমেই খোঁজ করতে লাগল, মূর্তিটা ওল্ড গ্যারিবাল্ড লেনে গেল কি করে?' থামলেন মিস্টার সাইমন।

'কি করে গেল?' জানার জন্যে অস্থির হয়ে উঠল কিশোর।

'অনেক পেছনে ফিরে যেতে হয় তাহলে। হয়তো জানা আছে তোমার, আঠারোশো শতাব্দীতে এখনকার মিয়ানমার অর্থাৎ অতীতের বার্মা আক্রমণ করেছিল চীনারা। দখল করে সেখানে বসে যুদ্ধ শুরু করেছিল ভারতে ইংরেজদের বিরুদ্ধে। বহু বছর ধরে চলেছে যুদ্ধ। প্রচুর ভুগিয়েছে ইংরেজদের। এ জন্যে যে লোকটাকে বিশেষ ভাবে চিহ্নিত করা হয়, তার নাম থীবাউ, তৎকালীন বার্মার রাজা। যুদ্ধ শেষ হয় আঠারোশো ছিয়াশি সালে। বার্মার রাজধানী মান্দালয়ে প্রবেশ করে ইংরেজ সৈন্য, একটা চুক্তি হয় দু'পক্ষের মধ্যে। কিংবদন্তী আছে, ধনরত্নের স্তূপ ছিল রাজার প্রাসাদে।'

গুঙিয়ে উঠল কিশোর, 'আরেকটা গুপ্তধনের কাহিনী!'

'ঘাবড়ানোর কারণ নেই, দেবতার আগে ওগুলো খুঁজতে যেতে বলব না আমি তোমাকে।...যাই হোক, প্রাসাদে ঢুকে কোন ধনরত্ন পায়নি ইংরেজ বাহিনী, ওরা অন্তত তা-ই বলেছিল। থেকে থাকলেও হাওয়ায় মিলিয়ে গিয়েছিল যেন সে-সব। অফিসিয়ালি এটা জানানো হলেও অনেকেই বিশ্বাস করে না সেকথা, তাদের ধারণা মেরে দেয়া হয়েছে। লুট করে নিয়েছিল ইংরেজ বাহিনী।'

'ওসব কি এরপর কোনদিন আর পাওয়া গিয়েছিল?'

'না। ইংরেজরা যতই বলুক লুট করেনি, কিন্তু আমার বিশ্বাস হয় না। ওরা কোথাও কোন সম্পদ পেয়ে স্বেচ্ছায় ছেড়ে দিয়ে এসেছে, এ কথা অন্তত আমার জানা নেই। এক সময় ভারতবর্ষ থেকে সম্পদের পাহাড় লুট করে এনেছিল। ওল্ড জো'র অতীত খুঁজতে যাওয়া বিশেষজ্ঞদের ধারণা, থিবাউয়ের প্রাসাদে ছিল ওটা। এক ফাঁকে টুক করে ব্যাগে ভরে ফেলেছিল কোন এক ইংরেজ সৈনিক। দেশে নিয়ে গিয়েছিল। এ কথা বিশ্বাস করার কারণ, আমেরিকায় আসার আগে শেষবার ওটাকে দেখা গেছে লন্ডনের ইস্ট এন্ডে পেটিকোট লেনের আরেক চোরাই মার্কেটে। শুধু রোববারে বসে ওই মার্কেট। এখন আসা যাক, মূর্তিটা কোনখানে তৈরি হয়েছে, সে-প্রশ্নে। বার্মা এক সময় চুনি পাথরের জন্যে বিখ্যাত ছিল। আর চীনারা ওস্তাদ কারিগর, বিশেষ করে পান্না কেটে মূর্তি বানানোয় ওদের জুড়ি নেই। তাতে মনে হয়, এশিয়া থেকেই এসেছে মূর্তিটা।'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর।

'কোনখান থেকে এসেছে,' মিস্টার সাইমন বললেন, 'সেটা আর এখন বড় কথা নয়, উধাও হয়ে গেছে, এটাই হলো আসল কথা। জেন হারডেস্টির কি হলো, শোনো; মূর্তি বিক্রির হপ্তাখানেক পরেই গাড়ির নিচে চাপা পড়ে মারা গেল। টাকা আর ভোগ করতে পারল না। তাতে আপাতদৃষ্টিতে মন হয়, পরোক্ষভাবে মূর্তিটাই তার মৃত্যুর জন্যে দায়ী। অভিশপ্ত। কুখ্যাত সেই হোপ ডায়মন্ডের মত।'

চুয়াল্লিশ ক্যারাট ওজনের দুর্লভ নীল একটা হীরা হোপ ডায়মন্ড, জানে কিশোর। বহুকাল ধরে লোকের বিশ্বাস ছিল, যে-ই ওটার মালিক হবে, অপঘাতে মৃত্যু ঘটবে তার। ফ্রান্সের রাজা ষোড়শ লুই তাঁর রানী মেরি অ্যান্তনিকে দিয়েছিলেন ওই পাথর। গিলোটিনে শিরশ্ছেদ করে মরতে হয়েছে দুজনকেই। ১৯১১ সালে ম্যাকলিন নামে এক ইংরেজ ষাট হাজার পাউন্ড দিয়ে প্যারিস থেকে কিনে এনেছিল ওটা। কয়েক দিন পরেই খুন হলো তার ছেলে। এমনি অনেক দুর্ঘটনার কারণ হয়েছে পাথরটা।

'ঘটনাগুলো অদ্ভুতই,' বলল সে, 'কিন্তু অভিশাপ-টভিশাপ বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না আমার। পাথরের এ ধরনের কোন ক্ষমতা থাকতে পারে না। আসল কথা হলো, এ সব পাথরের যারা মালিক হয়, তারা অতিরিক্ত ধনী; আর ধনীদের শত্রুও বেশি। অন্য কোন কারণে খুন হয়, দোষ পড়ে পাথরের। সে যাই হোক, পান্না-দেবতা আসলে কার আদলে তৈরি? বুদ্ধ?'

'না। এই একটা তথ্য সব ধারণার মধ্যে প্যাঁচ লাগায়। বিশ্লেষণ করলে বার্মা বা এশিয়ার কোনও দেশে তৈরি বলে আর মনে হয় না। মূর্তিটা যে কোন দেবতার মত করে তৈরি, বের করা যায়নি।'

'হুঁ, সে-কারণেই ঠিক করে বলা সম্ভব হচ্ছে না ওটার জন্মস্থান কোনখানে।'

'হ্যাঁ।'

মৃদু হাসল কিশোর। 'এবং এখন আর কেউ জানে না কোন দেশে চলে

গেছে ওটা।'

'না।'

'এবার উধাও হলো কি করে?'

'সেটা আরেক কাহিনী। শুনতে চাও?'

'শোনা তো উচিত। বুঝতে পারব না নাহলে।'

'এক কাপ কফি খাওয়া দরকার, গলা শুকিয়ে গেছে। তুমি খাবে?'

'কফি খাব না। কমলার রস।'

ভিয়েতনামী বাবুর্চি নিসান জাং কিমকে ডাক দিলেন মিস্টার সাইমন।

দুই

কফি আর কমলার রস আনতে চলে গেল কিম।

'জন বিক্রি করার পর বেশ কয়েকবার মূর্তিটা হাত বদল হয়েছে,' মিস্টার সাইমন বললেন। 'দাম চড়তে চড়তে অবিশ্বাস্য পর্যায়ে চলে গেছে। শেষবার বিক্রি হয়েছে নিলামে, পঞ্চাশ লাখ ডলারে। অবশ্য আসল দাম এত নয় ওটার; দাম বাড়িয়েছে সংগ্রাহকেরা।'

নিজের অজান্তেই শিস দেয়ার ভঙ্গিতে ঠোঁট গোল হয়ে গেল কিশোরের, তবে শিসটা বেরোল না। 'অনেক সংগ্রাহক ভিড় করেছিল নিশ্চয়ই?'

'তা করেছিল। তবে শেষ পর্যন্ত টিকে ছিল মাত্র দুইজন।'

'তাদের মধ্যে একজন নিশ্চয় মূর্তিটা পাওয়ার জন্যে বেশি পাগল হয়েছিল, যার হাতে পড়েছে। কে সে?'

'সাউথ আমেরিকান এক মাল্টি-মিলিয়নিয়ার, নাম ডন পিজ্‌মো হুয়ান গনজালেস। বাড়ি চিলির স্যান্টিয়াগোতে। ওখানে বিশাল জমিদারি আছে তাঁর। তবে ব্যবসার কাজে বেশির ভাগ সময়ই ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশে ঘুরে বেড়ান।'

'এ রকম একটা দেবতার কি প্রয়োজন পড়ল তাঁর?'

'খোদাই জানে। তবে অনেক কোটিপতিরই সংগ্রহের বাতিক আছে। হয়তো গনজালেসেরও আছে। এত বেশি টাকা হয়ে যায় এ ধরনের লোকদের, সে-টাকা দিয়ে কি করবে বুঝে উঠতে পারে না।'

'আমার মনে হয় জেদ আর অহঙ্কারও এর পেছনে কাজ করে,' কিশোর বলল। 'কোন কিছু কেনার ইচ্ছে হলে সেটা তাকে পেতেই হবে, যে কোন মূল্যেই হোক। নিলাম ডাকতে গিয়ে সস্তা জিনিসের দামও অতিরিক্ত বাড়িয়ে দেয়। তা ছাড়া বিজ্ঞাপন আর নাম ছড়ানোর নেশাও আছে অনেকের। খবরের কাগজে নাম তোলার জন্যে টাকা খরচ করে বেড়ায়। হুয়ান গনজালেসের বেলায়ও তেমন কিছু থাকতে পারে। কিন্তু খোয়াল কি করে মূর্তিটা? আমি যদি এত দামী একটা জিনিসের মালিক হতাম, খুব সাবধানে রাখতাম সেটাকে,

যাতে খোয়া না যায়।'

'গনজালেসও সাবধান কম হননি,' সাইমন বললেন। 'রহস্যটা এখানেই। তবে সত্যি সত্যি চুরি হয়ে যেতে পারে মূর্তিটা, এটা বোধহয় ভাবেননি। হয়তো ভেবেছেন চোরে নিয়ে কি করবে? যে ভাবে বিজ্ঞাপন হয়ে গেছে, বেচতে পারবে না। বেচতে গেলেই ধরা পড়বে।'

'চোরাই মার্কেটে বেচবে। সবাই তো আর সৎ নয়। গোপনে কেনার মত সংগ্রাহকও আছে। আর তা-ও যদি না পারে, দেবতার চোখটা খুলে নিয়ে বিক্রি করে দেবে। অল্প হোক বেশি হোক চোরের পুরোটাই লাভ, যা পাবে তা-ই।'

'তাতে দাম অবশ্য একেবারেই কমে যাবে। আস্ত বিক্রি করলেও। চুনি পাথর একবার কাটার পর আবার কাটতে গেলে টেকে না, ভেঙে চুরচুর হয়ে যায়,' মিস্টার সাইমন বললেন। 'এ সব কথা নিশ্চয় জানা আছে গনজালেসের। সেজন্যেই হয়তো আমেরিকায় রেখে স্বস্তি পাননি। কেনার সঙ্গে সঙ্গে স্যান্টিয়াগোতে তাঁর বাড়িতে পাঠানোর ব্যবস্থা করলেন।'

'কিভাবে?'

'প্লেন ভাড়া করে।'

তাকিয়ে রইল কিশোর। 'প্লেন! অনেক খরচের ব্যাপার।'

'মূর্তিটার দামের তুলনায় কিছু না।'

'কোটিপতি হওয়ার এই এক সুখ। যা ইচ্ছে করা যায়।'

'সুবিধেগুলো ভোগ করতে না পারলে, কিংবা না করলে অফুরন্ত টাকা জমিয়ে রাখার কি মানে?'

'সে-কথাই তো বলছি।'

'একটা এইট-সীটার প্লেন ভাড়া করেছিলেন তিনি, শুধু মূর্তিটার জন্যে। একটা চিলিয়ান এয়ার অপারেশন কোম্পানির প্লেন। চিলিয়ান এমব্যাসির এক কর্মকর্তা আর তাঁর পরিবারকে নিয়ে এসেছিল প্লেনটা, খালিই ফিরে যাচ্ছিল, ওটাকেই ধরলেন হুয়ান গনজালেস। মূর্তিটা পাঠানোর ব্যবস্থা করলেন তাতে করে। গনজালেস নিজে যেতে পারলেন না সঙ্গে, ইয়োরোপে জরুরী ব্যবসার কাজ ছিল। এয়ার কোম্পানির ওপর তেমন ভরসা ছিল না তাঁর, সে-জন্যে সঙ্গে একজন বিশ্বস্ত লোক দিয়েছিলেন। ওই লোকটাও চিলিয়ান কিংবা পেরুভিয়ান হবে–ঠিক জানা যায়নি, দক্ষিণ আমেরিকায় ফিরে যেতে চাইছিল, খুশি হয়েই প্যাকেটটা নিতে রাজি হলো।'

'প্যাকেট মানে তো মূর্তির প্যাকেট?'

'তা ছাড়া আর কি।'

'মূর্তিটার বীমা করানো ছিল?'

'ছিল। একটা আমেরিকান কোম্পানির কাছে।'

'কত টাকার?'

'এক কোটি।'

'কিনল পঞ্চাশ লাখে, বীমা করাল এক কোটির–কেমন না ব্যাপারটা?'

'কেমন আর কি? হুয়ান গনজালেস মনে করেছেন, এক কোটিই দাম

হওয়া উচিত ওই মূর্তির। বীমা কোম্পানিও করতে রাজি হয়ে গেছে।'

'নিশ্চয় বিরাট প্রিমিয়ামের লোভে?'

'কোন সন্দেহ নেই তাতে। গনজালেসও টাকা দেয়ার ব্যাপারে কার্পণ্য করেননি। এত দামের জিনিস, প্লেনটা অ্যাক্সিডেন্ট করলে খোয়া যেতে পারে। সাগরে পড়ে গেলে তো উদ্ধার করার আশা একেবারেই শেষ।'

'লোক কেমন এই হুয়ান গনজালেস?'

'আমার সঙ্গে দেখা হয়নি। তবে যতদূর জেনেছি, ভদ্রলোক।'

'স্প্যানিশ নিশ্চয়?'

'তা তো বটেই। তাঁর পূর্বপুরুষরা স্পেন থেকেই চিলিতে গিয়েছিল। গনজালেস তো দাবি করেন পনেরোশো একত্রিশ সালে পিজারো যখন ওই অঞ্চল দখল করেন, তখন তাঁর সঙ্গে ছিল একজন বিখ্যাত যোদ্ধা—একজন কনকুইস্টাডোরেস, যিনি হুয়ান গনজালেসের পূর্বপুরুষ। সত্যি হতেও পারে। যদিও কালক্রমে খাঁটি স্প্যানিশ রক্ত আর থাকেনি ওখানে, স্থানীয়দের সঙ্গে মিশে গেছে স্বাভাবিকভাবেই...'

ঘরে ঢুকল কিম। ট্রে'টা ছোট টিপয়ে নামিয়ে রেখে চলে গেল।

কাপটা তুলে নিলেন সাইমন। কমলার রসের গ্লাসটা নিতে ইশারা করলেন কিশোরকে।

কাপে ঘন ঘন কয়েকবার চুমুক দিয়ে পিরিচের ওপর নামিয়ে রাখলেন তিনি। 'দেড় মাস আগে লস অ্যাঞ্জেলেস থেকে মূর্তি নিয়ে রওনা হয়েছিল প্লেনটা। আর্জেন্টিনার বুয়েনস এয়ারেসে পৌঁছল নিরাপদেই। তেল নেয়ার জন্যে নামল ওখানকার আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে। ওখান থেকে যাবে স্যান্টিয়াগোতে। যেতে হবে অ্যান্ডিজ পর্বতমালার ওপর দিয়ে। তবে আবহাওয়া ভাল ছিল। আর ওপথে বহুবার যাতায়াত করেছে পাইলট, পথ তার ভালমত চেনা। ইয়োরোপিয়ান আর আমেরিকান প্লেনগুলোও নিয়মিত যাতায়াত করে ওই রুটে। গণ্ডগোলের কোন কারণ দেখতে পায়নি সে।'

'তারমানে প্লেনটা পৌঁছায়নি জায়গামত?'

'না। বুয়েনস এয়ারেস থেকে রওনা দেয়ার পর গায়েব। স্যান্টিয়াগোতে পৌঁছায়নি।'

'পর্বতে পড়লে খুঁজে বের করা কঠিন। খোঁজাখুঁজি নিশ্চয় অনেক হয়েছে?'

'তা তো হয়েছেই। প্লেনটার কি হয়েছে কেউ বলতে পারে না। যাত্রার শুরুতে গ্রাউন্ড কন্ট্রোলের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল পাইলটের। সবই ঠিক আছে জানাচ্ছিল সে। হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল সঙ্কেত পাঠানো, কেটে গেল যোগাযোগ। প্লেনটা যে কোম্পানির ছিল সেই কোম্পানি চিলিয়ান এয়ার ফোর্সকে সঙ্গে নিয়ে অনেক খোঁজাখুঁজি করেছে, কোন হদিসই করতে পারেনি।'

'এখন কি অবস্থা?'

'খুব মন খারাপ হয়ে গেছে হুয়ান গনজালেসের।'

'তার চেয়েও বেশি মন খারাপ হয়েছে নিশ্চয় প্লেনের ক্রুদের আত্মীয়-স্বজনদের। প্লেনে মোট কতজন লোক ছিল?'

ক্রু ছিল চারজন। দুজন পাইলট, একজন নেভিগেটর—একই সাথে রেডিও অপারেটরের দায়িত্বও পালন করছিল সে, আর একজন এয়ার হোস্টেস।'

'কি বলছেন সেনর গনজালেস?'

'কোন ব্যাপারে?'

'মূর্তিটা খোয়া যাওয়ার ব্যাপারে?'

'চোর-ডাকাতের হাত আছে।'

'এ ধারণার পেছনে নিশ্চয় কোন কারণ আছে?'

'থাকলেও বলছেন না সেটা। তবে সহজে হাল ছাড়ার বান্দা নন হুয়ান গনজালেস। আর নন বলেই হয়তো কোটিপতি হতে পেরেছেন।'

খালি গ্লাসটা নামিয়ে রাখল কিশোর। 'এখন আসল কথাটায় আসা যাক। আমাদের কাজটা কি?'

'আমাকে এসে ধরেছে বীমা কোম্পানি। কিছু একটা করতেই হবে। বলে দিয়েছি, আমার সময় নেই। অনেক ঘোরাঘুরির ব্যাপার। চাপাচাপি করে কোনমতেই রাজি করাতে না পেরে শেষে অনুরোধ করেছে এমন কাউকে ঠিক করে দিতে, যার ওপর নির্ভর করতে পারি আমি। বলেছি, লোক আছে; তবে ওরা করবেই কথা দিতে পারি না, ওদের সঙ্গে আলোচনা করে জানাব।'

'তারমানে আমাদের কথা বলেছেন আপনি,' চিন্তিত ভঙ্গিতে নিচের ঠোঁট কামড়াল কিশোর। 'কিন্তু আমিও তো একা। রবিন গেছে ক্যাম্পিঙে, তার মামাকে সাহায্য করতে। আর মুসার যা অবস্থা!' মিস্টার সাইমনের দিকে তাকাল সে, 'ওমরভাইকে নেয়া যেতে পারে। অ্যাসাইনমেন্টটা যে ধরনের, প্লেন লাগবেই; মুসা আর রবিন থাকলেও তাকে নিতে হতো। বলে দেখতে পারি, রাজি হয় কিনা। খরচাপাতি সব বীমা কোম্পানিই দেবে, তাই না?'

'খুশি মনে। মূর্তিটা খুঁজে না পেলে কত টাকা চলে যাচ্ছে ওদের কল্পনা করেছ? শুধু খরচ না, বেশ ভাল একটা কমিশনও দেবে বলেছে পারিশ্রমিক হিসেবে। শুধু বীমা কোম্পানিই না, হুয়ান গনজালেসও মোটা টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছে। তোমাকে অবশ্য টাকার কথা বলে লাভ নেই...'

'তবে ওমরভাই টাকা ছাড়া কাজ করবেন না।'

'ওর পেশাই এটা, করবে কেন? আমিও তো করি না।'

'ঠিক আছে, বলব। আর আমার তো যাওয়ার খুবই ইচ্ছে। ছুটির মধ্যে একা একা বসে থাকতে ভালও লাগছে না। পরের টাকায় দক্ষিণ আমেরিকাটা ঘুরে আসতে পারলে মন্দ কি। একটা জটিল রহস্যের সমাধানও হয়ে যাবে।'

হেসে ফেললেন মিস্টার সাইমন, 'তারমানে ধরেই নিয়েছ, করে ফেলবে?'

'অ্যাঁ!' কিশোরও হাসল, 'তা করব। মূর্তিটা পাই বা না পাই, কি হয়েছে ওটার, এটা অন্তত বের করেই ছাড়ব। কিন্তু যাব যে, চিলিয়ান সরকার কি দেশের মধ্যে বিদেশীদের এ ভাবে ঘোরাঘুরি করতে দেবে?'

'যাতে দেয়, সে-ব্যবস্থা করবেন হুয়ান গনজালেস। তাঁর দেশে তিনি খুব দামী মানুষ।'

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল একবার কিশোর। 'আপনার পরামর্শ কি?

কোনখান থেকে তদন্ত শুরু করতে বলেন আমাকে?'

'বাড়ির কাছ থেকে শুরু করাই তো ভাল।'

'যেমন?'

'আসল কথাটা হলো, প্লেনটা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না কেউ। বীমা কোম্পানি আর গনজালেস, দুই পক্ষই শুধু মূর্তি পেলেই খুশি।'

'কিন্তু মূর্তির জন্যেই প্লেনটাকে দরকার। আটলান্টিক আর প্রশান্ত মহাসাগরের মাঝখানের এক বিশাল এলাকা চক্কর দিতে হবে আমাদের,' আনমনে বিড়বিড় করল সে। 'তিন হাজার বর্গমাইলের বেশি নোনা পানি আর বিরাট পর্বতমালার আশেপাশে দুই হাজার বর্গমাইল গ্রীষ্মমণ্ডলীয় জঙ্গল চুঁড়ে বের করতে হবে একটা ছোট্ট বিমানকে।'

'অসম্ভব মনে হচ্ছে?' ভুরু নাচালেন মিস্টার সাইমন। চোখে হাসি চিকচিক করছে।

অন্য কেউ নয়, স্বয়ং কিশোর পাশাকে চ্যালেঞ্জ করে বসেছেন তিনি।

ঝট করে মাথা সোজা হয়ে গেল গোয়েন্দাপ্রধানের। অন্যমনস্কতা দূর হয়ে গেল নিমেষে। দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের কণ্ঠে বলল, 'পৃথিবীতে অসম্ভব বলে কিছু নেই, স্যার!'

'তা ঠিক,' মাথা ঝাঁকালেন মিস্টার সাইমন, 'মনের জোর, দেখার ক্ষমতা আর করার ইচ্ছে থাকলে সবই করা সম্ভব। কিছু ভাবলে?'

'হ্যাঁ।'

'কি?'

'পুরো ব্যাপারটাই গোলমেলে।'

'যেমন?'

'সাধারণ চুরি নয় এটা, অবশ্য যদি চুরির ঘটনা হয়ে থাকে।'

'চুরি হয়েছে আমি কিন্তু এ কথা বলিনি।'

'কিন্তু হুয়ান গনজালেস ভাবছেন।'

'বলে যাও।'

'একটা জিনিস কেউ কেন চুরি করবে যদি জানে কোনদিন সেটা বের করতে পারবে না? খাটের তলা থেকে গোপনে বের করে মাঝে মাঝে দেখার জন্যে এতবড় ঝুঁকি আর টাকা খরচের মধ্যে পাগলেও যেতে চাইবে না।'

'আসল কথা বলো।'

'কেউ একজন চায় মূর্তিটা, পাগলের মতই চাইছে। কেন? আচ্ছা, আরও একটা প্রশ্ন, কে? সেই লোকটা হতে পারে যে গনজালেসের সঙ্গে নিলাম প্রতিযোগিতায় হেরে গেছে। টাকার জোরে গনজালেসের সঙ্গে পারেনি, তাই বাঁকা পথে হাসিল করার চেষ্টা করেছে মূর্তিটা।'

'তারমানে বলতে চাইছ প্লেন অ্যাক্সিডেন্টটা স্বাভাবিক দুর্ঘটনা নয়?'

'সে-রকমই তো মনে হয়, তাই না?'

'এ ধারণা হলো কেন তোমার?'

'গনজালেসের ধারণার কথা শুনে। গণ্ডগোল আছে বলে কি বোঝাতে

লোকাচ্ছেন তিনি? আমার বিশ্বাস, যতখানি বলেছেন, তার চেয়ে অনেক বেশি জানেন তিনি।'

'মূর্তিটা পাওয়ার জন্যে তিনি মরিয়া। তথ্য লুকাবেন কেন? জানলে তো এবং জানিয়ে দেয়ার কথা যাতে খুঁজে বের করা যায়।'

'এইটাই তো হলো প্রশ্ন। কেন বলছেন না? কারও ভয়ে? কেউ প্রভাব খাটাচ্ছে তাঁর ওপর? মূর্তির অভিশাপের কথা বলছি না আমি। রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ থাকতে পারে। তাঁর মত টাকাওয়ালা প্রভাবশালী লোকের ওপর প্রভাব বিস্তার করার ক্ষমতা একমাত্র রাজনীতিকেরই থাকতে পারে। হুয়ান গনজালেসের সঙ্গে কথা বলতে পারলে সবচেয়ে ভাল হত। কোথায় পাওয়া যাবে তাঁকে?'

'জানি না। চলে তো যাওয়ার কথা ইয়োরোপে। চিলিয়ান এমব্যাসি বলতে পারবে। আমার ধারণা, তিনি কোথায় যান না যান, ওদেরকে জানিয়ে যান। কবে আমেরিকায় ফিরবেন, তা-ও হয়তো বলতে পারবে এমব্যাসি।'

'তাহলে এক্ষুণি লাফ দিয়ে গিয়ে বিমানে চড়ে পৃথিবীর আরেক মাথায় ছোটার চেয়ে আগে গিয়ে এমব্যাসিতেই খোঁজ নেয়া যাক। কি বলেন?'

'যা ভাল বোঝো। তবে সাবধান, কিশোর! আমিও তোমার সঙ্গে একমত, স্বাভাবিক দুর্ঘটনা নয় এটা। মূর্তির পেছনে লেগেছে কেউ, কোন কারণে। আর এ সব ক্ষেত্রে যা হয়–রক্তপাত। কখন যে কে এসে পেছন দিক থেকে পিঠে ছুরি মেরে দেবে, টেরও পাবে না।'

'জানি, স্যার, সাবধানেই থাকব। অসময়ে নিজের প্রাণটা কে আর খোয়াতে চায়!'

তিন

'কিছু করার আগে এই কোটিপতি ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলে নিতে চাই আমি,' কিশোর বলল। 'চিলিয়ান এমব্যাসির ওরা নাকি বলতে পারবে তিনি কোথায় আছেন, কবে ফিরবেন। তবে দেখা হলেও তিনি সহযোগিতা করবেন কিনা বলা যাচ্ছে না।'

'যদি না করেন?' ওমরের প্রশ্ন।

'তাহলে তাঁর দেবতা তিনি নিজেই খুঁজুনগে।'

'আমার কিছু করতে হবে নাকি?'

'আপনি একবার এয়ারপোর্টে গিয়ে যদি প্লেনটার ব্যাপারে খোঁজ নেন, ভাল হয়। কাদের প্লেন, ক'জন লোক গিয়েছিল, এ সব।'

'ঠিক আছে, যাব।'

'আমি যাচ্ছি।'

ওকিমুরো কর্পোরেশনের অফিস থেকে বেরিয়ে এল কিশোর। একটা

ট্যাক্সি নিয়ে চিলিয়ান এমব্যাসিতে রওনা হলো। সেখানে এসে অবাক হয়ে শুনল, আগের দিনই নাকি ফিরে এসেছেন হুয়ান গনজালেস। হোটেল পামপায় উঠেছেন। হোটেলটার মালিক চিলির নাগরিক। গনজালেসের সঙ্গে ইনটারকমে যোগাযোগ করে কিশোরকে সোজা তাঁর ঘরে পাঠিয়ে দিল রিসিপশনিস্ট।

একজন স্প্যানিশ-সাউথ আমেরিকান কোটিপতি হিসেবে ডন পিজ্‌মো হুয়ান গনজালেসকে যে রকম হবে আশা করেছিল কিশোর, বেশভূষা আর চেহারায় অনেকটা সে-রকমই তিনি। ষাটের কাছাকাছি বয়েস। পরনে অনেক দামী কালো স্যুট, গায়ে ধবধবে সাদা শার্ট। বিশালদেহী নন, আবার খাটোও নন। আভিজাত্য যেন ফুটে বেরোচ্ছে চলনে-বলনে, চেহারায়। ক্লীন শেভড। কালো চুল। এই বয়েসেও চামড়ায় ভাঁজ নেই, পুরানো হয়ে যাওয়া হাতির দাঁতের মত রঙ। কালো চোখের অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে তীক্ষ্ণবুদ্ধি আর আত্মবিশ্বাসের ছাপ।

পরিষ্কার ইংরেজিতে কিশোরকে বললেন, 'এসো।' চোখের ইশারায় চেয়ার দেখালেন। 'বসো।'

'থ্যাংক ইউ, স্যার,' ভদ্রতার সঙ্গে জবাব দিয়ে চেয়ারে বসল কিশোর। 'আমি একজন গোয়েন্দা। মিস্টার ভিকটর সাইমন পাঠিয়েছেন। আপনার হারিয়ে যাওয়া মূর্তিটাকে খুঁজে বের করার জন্যে।' তিন গোয়েন্দার কার্ড, ওকিমুরো কর্পোরেশনের কার্ড, পুলিশের প্যাডে লেখা পুলিশ চীফ ইয়ান ফ্লেচারের প্রশংসাপত্র আর ভিকটর সাইমনের লেখা একটা চিঠি বের করে দিল সে।

মনোযোগ দিয়ে সব ক'টাই পড়লেন গনজালেস। 'হুঁ,' মাথা দোলালেন, 'বয়েস কম বলে হেলা করা যাবে না।' ফিরিয়ে দিলেন কাগজগুলো। 'মিস্টার সাইমনের কাছে নিশ্চয় সব জেনেছ।'

'অন্তত তিনি যতটুকু জানেন। পান্নায় তৈরি মূর্তিতে বিশাল চুনি পাথরের চোখ বসানো, পুরানো একটা দেবমূর্তি, প্রাচ্য থেকে এসেছে।'

'পুরানো, ঠিক; দেবতাও বলতে পারো, তবে প্রাচ্য থেকে আসেনি। অন্তত জন্মস্থানটা ওখানে নয়।'

গনজালেসের জবাব অবাক করল কিশোরকে। 'কি করে জানলেন?'

'কি করে জানলাম, জানার দরকার নেই তোমার। জানি, এটুকু বিশ্বাস করতে পারো। ফিরে পাওয়ার জন্যে প্রচুর খরচ করতে রাজি আছি। যদি শুনি, কোনদিন আর পাওয়া যাবে না ওটা, সাগরের নিচে হারিয়ে গেছে, কিছু মনে করব না। কিন্তু কোনমতেই চাই না অন্য কারও হাতে পড়ুক। সে-জন্যেই এত দাম উঠে যাওয়ার পরেও কিনে আটকে ফেলেছিলাম।'

এই কথাটাও অবাক করল কিশোরকে। 'আপনার এই মনোভাবের নিশ্চয় কোন কারণ আছে, স্যার?'

'ব্যাপারটা ব্যক্তিগত। এখন বলো, আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছ কেন?'

'কোন এক জায়গা থেকে তো তদন্ত শুরু করতে হবে আমাকে। এখান থেকেই করলাম। আপনার নাকি ধারণা, ব্যাপারটার মধ্যে গণ্ডগোল আছে।

সত্যি?'

'হ্যাঁ।'

'তারমানে প্লেন দুর্ঘটনাটা স্বাভাবিক দুর্ঘটনা নয়?'

'সেটা শুধু আমার সন্দেহ। কোন প্রমাণ দিতে পারব না।'

'সন্দেহ করারও নিশ্চয় কারণ আছে?'

'সাধারণ চুরি নয় এটা।'

'কি করে জানলেন?'

দ্বিধা করলেন গনজালেস। 'অনুভূতি বলছে।'

'গণ্ডগোল শব্দটা ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত,' কিশোর বলল। 'আপনার কি মনে হচ্ছে প্লেনটা হাইজ্যাক করা হয়েছে? হরহামেশা হচ্ছে আজকাল।'

'অসম্ভব নয়। অনেক লোক আছে দামী জিনিস দেখলে কেড়ে নেয়ার জন্যে পাগল হয়ে যায়।'

'তা হয়।'

'নিলামে যে লোকটা আপনার শেষ প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল, তাকে চেনেন?'

'মুখ দেখিনি। পেছনে বসে ছিল।'

কিশোরের মনে হলো, কিছু যেন গোপন করে গেলেন গনজালেস। প্রশ্ন করল, 'এ ধরনের জিনিস সংগ্রহ করার বাতিক আছে তার, তাই না?'

ফাঁদে ধরা দিলেন না গনজালেস। 'থাকতে পারে।'

'কারও ওপর সন্দেহ হয় আপনার?'

আড়ষ্ট হয়ে গেলেন গনজালেস। 'না।'

কথা আদায়ের জন্যে ভিন্ন রাস্তা ধরল কিশোর। 'চিলিতে মূর্তিটা পাঠানোর জন্যে একজন লোক ঠিক করেছিলেন আপনি, কুরিয়ার।'

'করেছিলাম।'

'নাম কি তার?'

'জানার দরকার আছে?'

'আছে।'

'প্লেনের সঙ্গে সঙ্গে সে-ও তো ধ্বংস হয়ে গেছে।'

'প্লেনটা যে সত্যি ধ্বংস হয়েছে, তারই তো কোন প্রমাণ নেই।'

'ওই লোককে সন্দেহ করার কোন কারণ নেই। সে কারও কাছে বিক্রি হবে না। পুরোপুরি বিশ্বাস না করলে এই দায়িত্ব দিতাম না আমি তাকে।'

'আপনি কিন্তু আমার প্রশ্নের জবাব দেননি, স্যার। নাম কি তার?'

'মার্সেল ব্রিজাক।'

'আইরিশ নাকি?'

'এক সময় তা-ই ছিল।'

'বুঝলাম না।'

'ওর পূর্বপুরুষ ছিল বিখ্যাত আবনার ব্রিজাক, চিলিয়ান আর্মির কমান্ডার, উনিশ শতকে, স্প্যানিশ রয়্যালিস্টদের বিরুদ্ধে যখন বিদ্রোহ করে চিলি। যুদ্ধে জেতার পর গদি দখল করে। কিন্তু স্বৈরাচার বলে গদি থেকে জোর করে টেনে

নামানো হয় তাকে। গদি হারিয়ে পেরুতে চলে যায়। মারা যায় ওখানেই।'

'ও, তারমানে আপনার পুরোপুরি বিশ্বাসের পাত্র মার্সেল ব্রিজাক একজন পেরুভিয়ান?'

'না। পরের দিকে ব্রিজাক পরিবারের কিছু লোক চিলিতে ফিরে আসে। ওখানেই বসবাস শুরু করে। ভালমত চিনি আমি ওদের। মার্সেল ব্রিজাককে তো বটেই। আমেরিকায় কাজ সেরে স্যান্টিয়াগোতে ফিরে যাচ্ছিল সে। প্যাকেটটা আমাদের বাড়িতে পৌছে দেয়ার অনুরোধ করি তাকে।'

'প্যাকেটটা কি ধরনের?'

'মলাটের ছোট প্যাকেট। বাদামী কাগজে মোড়া। সুতো দিয়ে বাঁধা।'

'এত দামী জিনিস এই সাধারণ প্যাকেটে?'

'দামী জিনিস নেই ওতে, এটা বোঝানোর জন্যেই। এটা অবশ্য নতুন চালাকি নয়। বহুবার বহুজনে করে চোর-ডাকাতকে ফাঁকি দিয়েছে।'

'প্যাকেটে কি আছে জানত নাকি ব্রিজাক?'

'নিশ্চয়। আমিই বলেছি। বললাম না, পুরোপুরি বিশ্বাস করতাম।'

'জিনিসটা পাঠানোর জন্যে বেশি তাড়াহুড়া করেছিলেন আপনি।'

'হ্যাঁ, করেছিলাম। কাজের প্রয়োজনে নানা জায়গায় দৌড়াদৌড়ি করতে হয়। এখানে কোথায় ফেলে যাব?'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'হুঁ, বুঝতে পারছি। আপনার সময় নষ্ট করছি, স্যার। আপনি বললেন, মূর্তিটা প্রাচ্য থেকে আসেনি। তাহলে কোনখান থেকে এল?'

'চিলি।'

চোখ বড় বড় হয়ে গেল কিশোরের। 'অবাক করলেন। বিশেষজ্ঞরা শুনলেও অবাক হবে, আমি শিওর।'

এতক্ষণে হাসি ফুটল গনজালেসের ঠোঁটে। 'ওদের কথা বাদ দাও, বিশ্বাস কোরো না। ওরা ভঙ্গি করে দেখায় কত না মহাপণ্ডিত একেকজন, আসলে কিচ্ছু জানে না। কোন জিনিসের ব্যাপারে কিছু বুঝতে না পারলেই প্রাচ্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়। ওরা ভুলে যায়, কিংবা জানেই না, পৃথিবীর অন্য দেশে আরও পুরানো সভ্যতা ছিল। ইয়োরোপিয়ানরা আমেরিকা আবিষ্কারের বহু আগে থেকে এখানে সভ্যতা ছিল। শিল্পে, সংস্কৃতিতে উন্নত ছিল। ইয়োরোপিয়ানরা এসে ধ্বংস করেছে সে-সভ্যতা। মেরে, ধরে, যুদ্ধ করে করে সাফ করেছে। তবে সবাইকে শেষ করতে পারেনি, কিছু কিছু রয়েই যায়। পালিয়ে গিয়ে বেঁচে যায় তারা।'

'ইনকাদের কথা বলছেন?'

'ওরা তো পরে এসেছে। ইনকাদের আগেই অনেক বড় সভ্যতা গড়ে উঠেছিল দক্ষিণ আমেরিকায়। এখন সে-সব খবর বেরোচ্ছে ধীরে ধীরে। বড় বড় কারিগর ছিল তাদের। সোনা আর পাথরের কাজ জানত। লোহা চিনত না।'

'আর এই মূর্তিটা...'

'সাধারণ পুতুল মনে কোরো না ওটাকে, মহাশক্তিধর এক দেবতার মূর্তি।'

'আপনি দেবতার শক্তিতে বিশ্বাস করেন?'
'ইনডিয়ানরা করে।'
'মূর্তিটা যে চিলিতে তৈরি হয়েছিল, আপনি শিওর?'
'হ্যাঁ। আমি ওদেশের লোক। দেশের প্রাচীন ইতিহাস নিয়ে পড়াশোনা করেছি। ওখানকার প্রাচীনতম ভাষার ওপর মাস্টার ডিগ্রি নিয়েছি। দক্ষিণ আমেরিকার প্রাচীন সভ্যতার ওপর নিজেকে একজন বিশেষজ্ঞ বলে দাবি করতে পারি, যদিও সেটা করতে যাচ্ছি না। ওদের বংশধর যারা এখনও বেঁচে আছে তাদের সঙ্গে কথা বলেছি আমি। যে দেবতার পূজা করে ওরা, তার নামও বলতে পারি। দেবতার নাম আতু-হুয়া, অর্থাৎ সিয়েরার দেবতা, আর সিয়েরা মানে হলো পর্বত। দক্ষিণ আমেরিকার সীমানা এখনকার মত ছিল না তখন। চিলিও এখনকার চেয়ে অনেক বড় দেশ ছিল।'
'আতু-হুয়াকে চিনতে পেরেই কেনার জন্যে অস্থির হয়ে গিয়েছিলেন?'
'কেনার একটা কারণ বলতে পারো।'
'আরও কারণ আছে তারমানে?'
'আছে, তবে সেটা নিয়ে আলোচনা করতে চাই না। তোমার তদন্তের জন্যে তার কোন প্রয়োজন নেই। তোমার আর কিছু জানার আছে?'
'মার্সেল ব্রিজাকের সম্পর্কে। খাঁটি ইয়োরোপিয়ান রক্ত?'
'শত শত বছর ধরে কারও পরিবার কোনও দেশের বাসিন্দা হয়ে গেলে কি আর রক্ত খাঁটি থাকে? স্থানীয়দের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। দক্ষিণ আমেরিকার পুরানো লোক প্রায় কেউই খাঁটি রক্তের নেই, মেসটিজো হয়ে গেছে—মেসটিজো মানে মিশ্র রক্ত। মার্সেল ব্রিজাকও তাই।'
'তাহলে ধরে নিতে পারি তার রক্তে ইনকা, কিংবা আরও পুরানো রক্ত রয়েছে।'
'থাকতে পারে। তাতে লজ্জার কিছু নেই। এ প্রশ্ন কেন?'
'না, মনে হলো পূর্বপুরুষদের দেবতার প্রতি অতি আগ্রহ জেগে উঠতে পারে মার্সেল ব্রিজাকের।'
'জাগতেই পারে। স্বাভাবিক। তাই বলে সে ওটাকে গাপ করে দেবে না, এটুকু বিশ্বাস তার ওপর আমার আছে।'
এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে কিশোর বলল, 'তাহলে, স্যার, আর যদি কিছু বলার না থাকে আপনার, অহেতুক আপনার মূল্যবান সময় নষ্ট করব না। ধরে নিতে পারি, হারানো মূর্তিটা খোঁজায় এখনও আগ্রহী রয়েছেন আপনি।'
'না থাকার নতুন কোন কারণ কি ঘটেছে?'
গনজালেসের কণ্ঠস্বর দ্বিতীয়বার তাঁর দিকে ফিরে তাকাতে বাধ্য করল কিশোরকে। ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে এল।

*

ওকিমুরো কর্পোরেশনের অফিসে ফিরে দেখে ওমর বসে আছে।
'জানলে নাকি কিছু?' জিজ্ঞেস করল ওমর।
'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর, 'অনেক কথাই বলেছেন ডন গনজালেস,

তবে আরও কিছু বলতে পারতেন।'

'কিছু গোপন করেছেন মনে হয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

'কেন?'

'এই প্রশ্নটা তো আমারও। রাজনীতির গন্ধ লাগছে আমার নাকে। মূর্তিটা কিভাবে তাতে জড়িত, বুঝতে পারছি না। দক্ষিণ আমেরিকান রাজ্যগুলো যে কেমন, সে তো জানেনই। যখন-তখন বিদ্রোহ।...আপনি এয়ারপোর্টে কিছু জেনেছেন?'

'তেমন কিছু না। তবে একটা কথা বোধহয় আগ্রহী করবে তোমাকে।'

'কি?'

'গনজালেসের কুরিয়ারই একমাত্র লোক ছিল না, আরও একজন যাত্রী ছিল প্লেনটায়।'

'কি বললেন!' খবরটা ধীরে ধীরে হজম করল কিশোর, 'আরও কেউ ছিল? একজনের ভাড়া করা প্লেনে অন্য যাত্রী?'

'হ্যাঁ।'

'গনজালেস জানেন এ কথা?'

'জানলে নিশ্চয় বলতেন তোমাকে।'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'তা বলতেন। তিনি যা গোপন করেছেন, এই যাত্রীর ব্যাপারটার সঙ্গে সেটার বোধহয় কোন সম্পর্ক আছে। প্রথম থেকেই সন্দেহ আমার, ভেতরে অন্য ব্যাপার আছে। একটা কথা বলতে চাননি কোনমতেই, কেন হারানো মূর্তিটা উদ্ধার করতে তিনি এত আগ্রহী। তাতেই বোঝা হয়ে গেছে, অ্যানটিক ভ্যালুর চেয়ে দাম বেশি মূর্তিটার, অন্য কোন কারণে। তা এই যাত্রীটি কে? নাম জানতে পেরেছেন?'

'হ্যাঁ। এ ব্যাপারে কোন রাখ-ঢাক নেই। তাঁর নাম প্রফেসর আলমাডো। চিলিয়ান বিশেষজ্ঞ। প্রাচীন আমেরিকান সভ্যতার ওপর গবেষণা করেন। এখানে এসেছিলেন কোন এক সোসাইটিতে লেকচার দিতে, তারপর বাড়ি ফেরার জন্যে উতলা হয়ে ওঠেন। এয়ারলাইন কোম্পানি খুশি হয়েই তাঁকে প্লেনে তুলে নিয়েছে। ওদের ধারণা, আলমাডোকে প্লেনে তুললে মাইন্ড করবেন না গনজালেস, কিংবা করলেও কিছু বলবেন না। ভদ্রতা রক্ষা করবেন।'

'তারমানে বাকি সবার সঙ্গে তিনিও গায়েব হয়ে গেছেন।'

'না, তিনি বহাল তবিয়তেই আছেন।'

'কি করে?'

'বুয়েনস এয়ারেসে নেমে জরুরী কথা বলতে চলে যান এক আত্মীয়ের বাড়িতে। পরে অন্য প্লেনে বাড়ি ফিরে যাবার কথা। কিছু কিছু লোকের ভাগ্য প্রায় অলৌকিকভাবেই বাঁচিয়ে দেয় তাদেরকে।'

'হ্যাঁ, এতটাই অলৌকিক, যেন তাদের তৃতীয় নয়ন আছে। সেই চোখ দিয়ে ভবিষ্যৎটা দেখে ফেলে।'

'তোমার ধারণা আগে থেকেই জানা ছিল তাঁর, প্লেনটার ভাগ্যে কি

ঘটবে?'

'ধারণা নয়, দৃঢ় বিশ্বাস।' ফোনের দিকে হাত বাড়াল কিশোর।

'কাকে করবে?'

'ডন গনজালেসকে, যদি হোটেলে পাওয়া যায়। আবার কথা বলতে হবে তাঁর সঙ্গে। যতই খুঁড়ছি, ততই দুর্গন্ধ বেরোনো শুরু করেছে কেসটা থেকে!'

চার

পামপা হোটেলে ফোন করে হুয়ান গনজালেসের ঘরে লাইন দিতে অনুরোধ করল কিশোর। তিনি রিসিভার তুললে বলল, 'কিশোর পাশা বলছি, স্যার। একটা নতুন কথা জানতে পারলাম এইমাত্র। ফোনে বলা যাবে না। দয়া করে কি আবার একটু সময় দেবেন আমাকে? বেশিক্ষণ লাগবে না।'

গনজালেসকে ধন্যবাদ দিয়ে রিসিভার নামিয়ে রাখল সে। ওমরকে জানাল, 'যেতে বলেছেন। আপনি থাকুন। আমার আসতে দেরি হবে না।'

পনেরো মিনিটেই হোটেলে পৌঁছে গেল সে। তার কথা রিসিপশনিস্টকে জানিয়ে রেখেছেন গনজালেস। আসার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ঘরে পৌঁছে দেয়া হলো।

'হ্যাঁ, বলো, নতুন করে কি প্রশ্ন আবার মাথায় উদয় হলো?' হাসি হাসি কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'দুটো প্রশ্ন, স্যার,' কিশোর বলল। 'আপনি কি জানতেন ওই প্লেনটায় মার্সেল ব্রিজাক ছাড়াও আরও একজন যাত্রী ছিলেন?'

বদলে গেল গনজালেসের মুখের ভাব। 'না,' তীক্ষ্ণ হয়ে গেছে কণ্ঠস্বর, 'জানতাম না।'

'আমারও তাই ধারণা। জানলে তখনই বলতেন। দ্বিতীয় প্রশ্ন, আলমান্ডো নামে কাউকে চেনেন?'

ভ্রূকুটি করলেন গনজালেস। বিস্মিত মনে হলো তাঁকে। 'হ্যাঁ, চিনি। কেন, কি হয়েছে?'

'এই ভদ্রলোকটিই প্লেনের দ্বিতীয় যাত্রী ছিলেন।'

কিশোরের দিকে তাকিয়ে আছেন গনজালেস। কথা বলছেন না।

'ভাবলাম, আপনাকে জানানো দরকার,' অস্বস্তি বোধ করছে কিশোর। খবরটা শুনে গনজালেস এতটা চমকে যাবেন ভাবেনি। 'আমার প্রশ্ন শেষ, স্যার।' যাওয়ার জন্যে ঘুরতে গেল সে।

'এক মিনিট, কিশোর,' হাত তুললেন গনজালেস। 'এই লোকটা, আলমান্ডো, প্লেনটার নিখোঁজ হওয়ার সময় কি ছিল তাতে?'

'না। শুনলাম, বুয়েনস এয়ারেসে নেমে গেছেন একজন আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা করার জন্যে।'

'হুঁ, দেখা করার জন্যে তো বটেই।'
'কেন, দেখা কি করতে পারেন না?'
'বাদ দাও ওসব কথা,' তাড়াতাড়ি চাপা দিতে চাইলেন গনজালেস, 'ও কিছু না!...খবরটা জানানোর জন্যে ধন্যবাদ, কিশোর।'
'সত্যি কি আর কিছু বলার নেই আমাকে আপনার, স্যার?'
'না, নেই।'
'তাহলে আর একটা প্রশ্নের শুধু জবাব দিন–এই আলমাডো ভদ্রলোকেরও কি দেবতার প্রতি আগ্রহ...'
কিশোরের কথা শেষ হওয়ার আগেই বলে উঠলেন গনজালেস, 'আমার চেয়ে কম আগ্রহ নেই তাঁর, এটুকু বলতে পারি।'
'নিলামে আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী কি তিনিই ছিলেন?'
অন্যদিকে মুখ ফেরালেন গনজালেস, 'বলেছিই তো তোমাকে, তার মুখ দেখিনি...'
'চেনা লোকের কথা শুনেও তাকে চেনা যায়, মুখ দেখার দরকার হয় না।'
জবাব দিলেন না গনজালেস।
'স্যার, আপনি বোধহয় ভুলে যাচ্ছেন, আপনার হয়েই কাজ করছি আমি; আপনার হারানো মূর্তি উদ্ধারের চেষ্টা করছি। আপনার দেয়া যে কোন তথ্য আমার কাজে সাহায্য করবে।'
'আর কিছু বলার নেই আমার।'
'ঠিক আছে,' ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর, 'আর বিরক্ত করব না আপনাকে। তবে যাওয়ার আগে আরেকটা ব্যাপারে শিওর হয়ে নিতে চাই, আপনি কি চান আতু-হুয়াকে সত্যিই বের করে আনি আমি?'
'চিরকালের জন্যে যদি হারিয়ে গিয়ে থাকে, তো যাক, কেয়ার করি না আমি; তবে অন্য কারও হাতে পড়ুক এটা কোনমতেই চাই না।'
'তাহলে তো আপনার বীমার টাকা দাবি করা উচিত।'
'প্রিমিয়াম দিয়েছি, দাবি করাটা আমার আইনগত অধিকার।'
'তারমানে আপনি জানতেন, মূর্তিটা হারিয়ে যেতে পারে, কিংবা চুরি হতে পারে, সে-জন্যেই বীমা করিয়েছিলেন।'
'হ্যাঁ, জানতাম।'
'বীমা কোম্পানিকে জানিয়েছিলেন যে বড় রকমের ঝুঁকি নিতে যাচ্ছে ওরা?'
'আমি জানাতে যাব কেন? তারা কিভাবে ব্যবসা করবে সেটা তারা বুঝবে।'
'তা ঠিক।...আপনার সঙ্গে আবার দেখা করতে চাইলে কি এখানেই করব?'
'এখানে আর থাকছি না। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব স্যান্টিয়াগো রওনা হব।'
অবাক হলেও সেটা প্রকাশ করল না কিশোর। গনজালেসের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে হোটেল থেকে বেরিয়ে এল। ফিরে এল সোজা ওকিমুরো কর্পোরেশনের অফিসে।

ওমর অপেক্ষা করছিল তার জন্যে। দেখেই বলে উঠল, 'কথা হলো?'
'হলো।'
'কি বুঝলে? ভাল?'
'মোটেও না,' চেয়ারে বসতে বসতে বলল কিশোর। 'বললাম না যতই খুঁড়ছি, দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে। যতখানি জানানো হয়েছে আমাদের, তারচেয়ে অনেক বেশি কিছু রয়েছে এর ভেতরে। কোন কারণে সব কথা আমাদের বলছেন না গনজালেস। আলমাডো ওই প্লেনের যাত্রী হয়েছিলেন শুনে তো কেঁপে উঠলেন রীতিমত। তারপরেও মুখ খুললেন না।'
'কি করবে ঠিক করলে?'
'মিস্টার সাইমনের সঙ্গে দেখা করতে যাব। তাঁকেও কিছু প্রশ্ন আছে আমার। আপনি থাকুন। আমি আসি। একসাথে লাঞ্চ করব।'

*

মিস্টার সাইমনকে বাড়িতেই পাওয়া গেল। ডেস্কে বসে কাজ করছেন। কিশোরকে ঢুকতে দেখে কলম রেখে মুখ তুলে তাকালেন। 'কেমন এগোচ্ছে?'
'ভালই, স্যার।'
'বলো, কি খবর।'
'সারাটা সকাল কথা বলে কাটালাম। পানি এতটাই ঘোলা, তলার কিছু দেখা যায় না। শুরু থেকেই কেসটাকে গোলমেলে মনে হয়েছিল আমার, এখন শিওর হয়ে গেছি। মূর্তি হারানোর পেছনে বড় কোন ব্যাপার রয়েছে, সেনর গনজালেস যতই হালকা ভাবে বোঝানোর চেষ্টা করুন না কেন আমাদের।'
'গনজালেসের সঙ্গে দেখা করেছ?'
'হ্যাঁ। ইয়োরোপ থেকে ফিরেছেন।'
'কি বললেন?'
'যা বলেছেন, সেটা কিছু না; যা বলেননি সেটাই আসল। এর পেছনে কি আছে, সব জানেন তিনি, কিন্তু কোন কারণে গোপন রেখেছেন।'
'আশ্চর্য! আমাদের সহযোগিতা না করলে তাঁর কাজ করে দেব কি করে?'
'সে-কথাটা যদি তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, ভাল হয়, স্যার। আমি বহুভাবে চেষ্টা করেছি, আমাকে তো বললেন না। তবে আমি যা বুঝেছি, পান্না-দেবতার চুরিটা সাধারণ চুরি নয়। একজনের বেশি যুক্ত রয়েছে এতে। আর আমার ধারণা, কারা কারা রয়েছে, গনজালেস জানেন।'
'কি কি জেনেছ, বলো তো আমাকে।'
গনজালেসের সঙ্গে যা যা কথা হয়েছে, জানাল কিশোর। তারপর বলল, 'আমার দৃঢ় বিশ্বাস, রাজনৈতিক গণ্ডগোল এর মূল কারণ।'
'হুঁ,' চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা দোলালেন মিস্টার সাইমন। 'কল্পনাও করিনি, আলমাডোর যোগাযোগ রয়েছে এ কেসে।'
'তারমানে শুনেছেন তাঁর কথা?'
'চিলিয়ান এমব্যাসির সেক্রেটারি যোগাযোগ করেছিলেন আমার সঙ্গে।

আমাকে অনুরোধ করলেন, আলমাভো আমেরিকায় আছে নাকি খোঁজ করে বের করে দিতে।'

'জানিয়ে দিন এখন, নেই। দেশে ফিরে গেছেন।...আমি এখন নিশ্চিত, প্লেনটা স্যান্টিয়াগোতে নিয়ে যাওয়ার কোন ইচ্ছেই ছিল না ওদের। তাহলে মূর্তিটাকে তুলতই না ওই প্লেনে। একটা কথা বলব, স্যার?'

'বলো।'

'মূর্তিটা খুঁজতে যাওয়ার কি আর আসলে কোন দরকার আছে? যাঁর মূর্তি, তিনিই ইনটারেস্টেড নন।'

'কিন্তু বীমা কোম্পানি ইনটারেস্টেড। অনেক টাকা যাবে তাদের।'

'টাকার ব্যাপারেও আগ্রহী মনে হলো না গনজালেসকে।'

'কিন্তু তার অর্থ এই নয় তিনি টাকাটা দাবি করবেন না।'

'মূর্তি বহনে ঝুঁকি আছে, এটা গোপন রেখেছিলেন তিনি কোম্পানির কাছে। এদিক থেকে আটকে দিতে পারে কোম্পানি। বাতিল করে দিতে পারে ক্লেইম।'

'গোপন রেখেছিলেন, এ কথাটা কি প্রমাণ করতে পারবে কোম্পানি?'

'করা কঠিন,' একমত হলো কিশোর। 'ঝুঁকি আছে জানতেন, এটা স্রেফ অস্বীকার করবেন গনজালেস।'

'তারমানে যত যা-ই করুক, টাকা না দিয়ে পার পাবে না কোম্পানি। বাঁচার একটাই পথ আছে ওদের, মূর্তিটা খুঁজে বের করা। গনজালেসের আগ্রহ না থাকলেও ওদের ষোলো আনা আছে। এক কোটি ডলার মুখের কথা নয়।' কিশোরের মুখের দিকে তাকালেন সাইমন, 'প্লেনটাকে আগে খুঁজে বের করতে হবে তোমাদের।'

'যদি যেদিকে গেছে বলা হয়েছে সত্যি সেদিকে গিয়ে থাকে।'

'যদি না যায়?'

'পৃথিবীর যে কোন জায়গায় থাকতে পারে এখন ওটা।'

'প্লেনটা বেশি বড় না, তেলও বেশি বহন করতে পারবে না। যেদিকেই যাক, তেলের জন্যে ঘন ঘন নামতে হবে ওটাকে। রেকর্ড থাকবে। কোনদিকে গেছে জানাটা সহজ না হলেও অসম্ভব হবে না।'

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল একবার কিশোর। সাইমনের কথার জবাব দিল না।

'সেনর গনজালেসকে কেমন লোক মনে হলো তোমার?' জানতে চাইলেন সাইমন।

'নিখুঁত ভদ্রলোক।'

'একশো ভাগ শ্বেতাঙ্গ?'

'এতটা বোধহয় নন। কিছুটা অন্য রঙ নিশ্চয় আছে। আমার ধারণা, মেসটিজো। কেন?'

'চিলিয়ান সেক্রেটারি জানিয়েছেন, আলমাভোর মিশ্র-রক্ত। মা ইনডিয়ান। ওখানকার প্রাচীন ইতিহাস আর স্থানীয় সংস্কৃতিতে ভাল দখল থাকার কথা।

ভাবছি, মিশ্র হলে গনজালেসও তাঁর চেয়ে কম যাবেন না।'

'পান্না-দেবতাকে নিয়ে কাড়াকাড়ি করবেন?'

'দুজনের সংস্কৃতি এক হলে তাই তো করার কথা।'

নড়েচড়ে বসল কিশোর। 'আলমাভোকে চেনেন তিনি, এটা বোঝা গেছে। নামটা বলতেই চমকে উঠলেন। জানার জন্যে নানা ভাবে চেষ্টা করেছি, কোনমতেই মুখ খুললেন না।'

'তাহলে তাঁকে ছাড়াই চলতে হবে আমাদের। একটাই উপায় আছে। স্যান্টিয়াগোতে গিয়ে তদন্ত করা। চিলিয়ান সেক্রেটারির সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলেছি। তিনি বললেন, কোন অসুবিধে হবে না। সব ব্যবস্থা করে দেবেন। স্যান্টিয়াগোতে যাতে সাহায্য পাও, সে-ব্যবস্থাও করে দিতে পারব আমি। আমার পরিচিত একজন আমেরিকান বিজনেস এজেন্ট আছে, ফোনে বলে দেব তাকে। সাধ্যমত সাহায্য করবে তোমাদের। আর্জেন্টিনায়ও কোন অসুবিধে হবে না তোমাদের, সেক্রেটারি বলেছেন।'

পাঁচ

ওয়েস্টার্ন আর্জেন্টিনার চব্বিশ হাজার ফুট ওপর দিয়ে উড়ে চলেছে ওকিমুরো কর্পোরেশনের মারলিন বিমানটা। গন্তব্য চিলির স্যান্টিয়াগো। সামনে ফুটে উঠেছে অ্যান্ডিজ পর্বতমালার বরফে ঢাকা সারিবদ্ধ চূড়াগুলো। মনে হচ্ছে যেন পৃথিবীর শেষ সীমানায় পৌঁছে গেছে ওরা, তার ওপাশে আর কিছুই নেই, শুধুই শূন্যতা।

অনেক কিছু পেরিয়ে এসেছে ওরা। সবুজ বনানী, একরের পর একর আখ খেত, কমলার ঝোপ, হ্রদ, নদী। ওগুলোর পর থেকে শুরু হয়েছে বিখ্যাত পামপা–মাইলের পর মাইল বিস্তৃত ঘাসে ঢাকা অঞ্চল। পামপারও শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেছে এখন। সামনে দেখা যাচ্ছে শুকনো, ধূলিধূসর, পাথুরে উপত্যকা।

অ্যান্ডিজের বিস্ময়কর, দম আটকে দেয়া সৌন্দর্য পেরিয়ে এল ওরা নিরাপদেই। দুপুরের সামান্য পরে ল্যান্ড করল লস ক্যারিলোসের ধুলোয় ঢাকা ল্যান্ডিং গ্রাউন্ডে। চমৎকার উষ্ণ আবহাওয়া। চিলি শব্দটা এসেছে ইনডিয়ানদের ভাষা থেকে, এর মানে 'ঠাণ্ডা'। অথচ মজার ব্যাপার হলো ক্রান্তীয় অঞ্চল ওটা, গরম। চিলিতে কথা বলার কোন অসুবিধে নেই। ইংরেজি পড়ানো হয় এখানকার স্কুলগুলোতে। জাতীয় ভাষা স্প্যানিশ। কিন্তু এত বেশি ইংরেজি শব্দ যুক্ত হয়ে গেছে সাধারণ লোকের ভাষার মধ্যে, মজা করে কে যেন ভাষাটার নামই দিয়ে ফেলেছিল 'স্প্যাংলিস'।

এয়ারপোর্ট কর্তৃপক্ষকে কাগজ-পত্র দেখাল ওমর। পার্কিঙের জায়গা জোগাড় করতে অসুবিধে হলো না। বেশ সহজই মনে হলো কাজগুলো। এত সহজেই সব হয়ে যাচ্ছে দেখে যে কোম্পানির বিমান হারিয়েছে, তাদের হেড

অফিসে গিয়ে খোঁজ-খবর নেয়ার কথাটাও ভেবে ফেলল কিশোর। তবে চিন্তা-ভাবনা করে আপাতত বাদ দিল পরিকল্পনাটা। খোঁজ নিতে গেলেই লোক জানাজানি হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। কিছুই না দেখে, কিছু না বুঝে সেটা করতে যাওয়াটা বোকামি হবে।

'ওমরভাই, কি করা যায় এখন?'

'আপাতত পেট ভরানো। এখানকার কাবাব আর কিডনির পুডিং শুনেছি চমৎকার। টেস্ট করে দেখা যেতে পারে। তারপর থাকার জায়গার ব্যবস্থা করব। এবং তারপর বেরোব মিস্টার জনসনের সঙ্গে দেখা করতে। বহুকাল ধরে আছেন এখানে। নিশ্চয় এখানকার অনেক কিছুই তাঁর জানা।'

'ঠিক আছে, তাই করা যাক,' রাজি হয়ে গেল কিশোর।

ট্যাক্সি ডাকল ওমর। স্যান্টিয়াগোর ট্রাফিক আইন মোতাবেক উইন্ডস্ক্রীনে সাদা চিহ্ন আঁকা। হোটেল সান্টা লুসিয়ায় নিয়ে যেতে বলল। এয়ারপোর্টে জিজ্ঞেস করে জেনে নিয়েছে, ভাল হোটেল, কিন্তু খরচ খুব বেশি নয়।

বিশ মিনিটেই পৌঁছে গেল হোটেলে। রুম ভাড়া নিল। গোসল সেরে রেস্টুরেন্টে এল খাওয়ার জন্যে।

'তাড়া নেই,' ওমর বলল কিশোরকে। মেন্যু দেখে কাবাব বাদ দিয়ে ওখানকার জনপ্রিয় ডিশ ক্যাজুয়েলা ডি অ্যাভি'র অর্ডার দিল। নানা রকম সব্জি আর মুরগীর মাংস ভরা এক ধরনের ক্যাসিরোল এটা। 'এখন লাঞ্চের সময়। মিস্টার জনসনকে না-ও পাওয়া যেতে পারে। এয়ারপোর্টে জিজ্ঞেস করে জেনে নিয়েছি। দোকানপাট, অফিস, সব একটা থেকে চারটে পর্যন্ত বন্ধ থাকে।'

'বাহ্, অনেক খবরই নিয়েছেন দেখছি।'

'নতুন দেশে গেলে আগেভাগেই যতটা সম্ভব নিয়ম-কানুন জেনে নিলে সুবিধে হয়।'

খাওয়ার পর কফির অর্ডার দিল ওমর। সিগারেট ধরাল। কিশোর নিল কোল্ড ড্রিংকস। ধীরে-সুস্থে খেয়েদেয়ে, রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে বুলভার ক্যালিস আহুম্যাডায় রওনা হলো। রাস্তাটা শহরের কেন্দ্রে।

অফিস খুলেছে। রিসিপশনিস্টকে বলতেই সঙ্গে সঙ্গে পৌঁছে দিল মিস্টার জনসনের অফিসে। বোঝা গেল ওদের আসার খবর পেয়েছেন তিনি। নির্দেশ দিয়ে রেখেছেন।

ধূসর-চুল, ক্লীন শেভ করা ষাট বছর বয়েসী একজন ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন ডেস্কের ওপাশ থেকে। হাত বাড়িয়ে দিলেন। 'রাস্তা তাহলে ঠিক মতই খুঁজে পেয়েছেন,' হাসিমুখে বললেন তিনি। 'বসুন।' ওমরকে বলে কিশোরকেও বসতে ইশারা করলেন। 'চা, কফি, কোক?'

'না, লাগবে না,' মাথা নাড়ল কিশোর, 'লাঞ্চ করেই এসেছি আমরা।'

ওমরের দিকে তাকালেন, 'সিগারেট?'

'দিন। তাহলে আমাদের আসার খবর পেয়ে গেছেন।'

'হ্যাঁ, ভিকটর ফোন করেছিল। এখন বলুন, কিভাবে সাহায্য করতে পারি আপনাদের?'

কিশোরের দিকে তাকাল ওমর, 'তুমিই বলো।' জনসনের দিকে তাকাল সে, 'মিস্টার জনসন, ও কিশোর পাশা। মিস্টার সাইমন নিশ্চয় বলেছেন ওর কথা।'

হেসে মাথা ঝাঁকালেন জনসন। 'হ্যাঁ। এত প্রশংসা করল...আসলে বয়েসটা কিছু না, ব্রেনটাই আসল। যদিও বয়েসের কারণে এই মিশনের প্রধান বলে ওকে মেনে নিতে কষ্টই হয়...সত্যি কথাটাই বললাম, কিছু মনে কোরো না।'

'না না,' মাথা নাড়ল কিশোর। হাসল। পরক্ষণে গম্ভীর হয়ে গেল, বড়দের মত। 'মিস্টার জনসন, মিস্টার সাইমন আমাদের আসার উদ্দেশ্যটা আপনাকে জানিয়েছেন?'

'বুয়েনস এয়ারেস আর স্যান্টিয়াগোর মাঝে উধাও হয়ে যাওয়া একটা প্লেনে একটা মূল্যবান প্যাকেটের কথা বলেছে। এখানকার ইংরেজি পত্রিকা সাউথ প্যাসিফিক মেইলে হারানো প্লেনটার কথা পড়েছি। এর বেশি কিছু জানি না।'

'প্যাকেটে কি ছিল জানেন?'

'না।'

'কার কাছে যাচ্ছিল জানেন?'

'না। পত্রিকায় এ সব কোন কথাই লেখেনি। শুধু প্লেনটার কথা লিখেছে। ভাগ্যিস, সীটগুলো বেশির ভাগই খালি ছিল। নইলে আরও কিছু লোকের প্রাণ যেত।'

প্রসঙ্গ বদল করল কিশোর, 'স্থানীয় ব্যাপার-স্যাপার সব নিশ্চয় আপনার জানা?'

'তা তো বটেই। চল্লিশ বছর ধরে আছি। তরুণ বয়েসে এসেছিলাম এখানে। এত ভাল লেগে গেল দেশটা, রয়ে গেলাম। এবং থাকার জন্যে কোনদিন এতটুকু পস্তাইনি। চিলিই এখন আমার আসল বাড়ি।'

'ডন পিজ়্মো হুয়ান গনজালেস নামে কাউকে চেনেন?'

'নিশ্চয়। তাঁর সঙ্গে ব্যবসাও আছে আমার। এখানকার খুব নামী মানুষ।'

'দু'চার কথায় বলুন না তাঁর সম্পর্কে।'

'খুবই নির্ভরযোগ্য লোক। কেন?' ভুরু উঁচু হয়ে গেল জনসনের। 'তোমাদের আসার সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক আছে? তিনি কিছু করবেন, বিশ্বাস হয় না আমার...'

'করেনওনি,' বাধা দিল কিশোর। 'প্লেনে প্যাকেটটা তিনিই দিয়েছিলেন, মার্সেল ব্রিজাক নামে একজন লোকের হাতে। আমেরিকায় জরুরী কাজ সেরে বাড়ি ফিরছিলেন তিনি। তাঁকে চেনেন?'

'নাম শুনেছি। শান্ত, নির্বিরোধী ভদ্রলোক। ব্যবসার চেয়ে প্রত্নতত্ত্ব আর ইতিহাসেই বেশি আগ্রহী। ডন গনজালেস নিশ্চয় তাঁকে ভালমতই চেনেন। কারণ তিনিও ইতিহাসের ভক্ত। তবে এ ব্যাপারে তাঁর চেয়ে ব্রিজাকের জ্ঞান বোধহয় বেশি।'

'প্লেনে আরেকজন যাত্রী ছিলেন, শেষ মুহূর্তে উঠেছিলেন। ডন গনজালেস

জানতেন না। তাঁকে গিয়ে যখন বললাম, চমকে উঠলেন। কিন্তু ওই ভদ্রলোকের সম্পর্কে কোন কথা বলতে চাইলেন না।'

'কি নাম ভদ্রলোকের?' তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল জনসনের কণ্ঠ।

'আলমান্ডো।'

'আহ্! তিনিও কি নিখোঁজ হয়েছেন নাকি?'

'না। বুয়েনস এয়ারেসে নেমে গিয়েছিলেন।'

'খারাপ হলো।'

'মানে?'

'গনজালেসের চমকে ওঠার কারণটা বুঝতে পারছি। শুধু তিনিই নন, আলমান্ডো চিলিতে ফিরে না এলে অনেকেই খুশি হবে-আমিও তাদের একজন।'

'কেন?'

'লোকটা গোলমাল পাকানোর ওস্তাদ।'

'তারমানে অনেক কিছু জানেন আপনি।'

'জানি। মস্ত ধনী। চিলির নাইট্রেটের খনির দিকে তার বিরাট লোভ। এটা এ দেশের প্রধান রপ্তানী-দ্রব্যগুলোর একটা।'

'তাতে কি হয়েছে?'

'স্থানীয় রাজনীতিতেও তার প্রচণ্ড আগ্রহ।'

'তাতেই বা কি হয়েছে?' চুপচাপ সিগারেট টানছিল এতক্ষণ ওমর, রাজনীতির কথা উঠতে প্রশ্ন না করে আর পারল না।

উঠে দরজার কাছে চলে গেলেন মিস্টার জনসন। দরজা খুলে বাইরে উঁকি দিয়ে করিডরটা দেখলেন। আস্তে করে আবার লাগিয়ে দিয়ে ফিরে এসে বললেন, 'সাবধান থাকা দরকার। আমি চাই না আমার কথা আর কেউ শুনে ফেলুক। কথাগুলো বলাই বোধহয় উচিত হচ্ছে না, তবু বলছি, আলমান্ডোকে এখানকার লোকে আগুন বলেই জানে। যে পদার্থ দিয়ে তৈরি হয় স্বৈরাচাররা··· হিটলার আর মুসোলিনির মত। ও একজন পুরোপুরি হাফ-কাস্ট, মা ইনডিয়ান; তাতে সিয়েরার নেটিভদের মধ্যে তার বিরাট জনপ্রিয়তা।'

'তাতেই বা গোলমালটা কোথায়,' কিশোর বলল, 'বুঝতে পারছি না।'

'ও ভয়ঙ্কর লোক। নিষ্ঠুর, উচ্চাভিলাষী। যদি কোনমতে ক্ষমতায় চলে যায়, দেশের জন্যে সেটা সাংঘাতিক ক্ষতির কারণ হবে। দেশটাকে ওলট-পালট করে দেবে।'

'কেন করবে?'

'তা জানি না। তবে এখানকার অনেক মিশ্র রক্তের মানুষের মত তার মধ্যেও শয়তান বাস করে। হীনম্মন্যতায় ভোগে। তার ধারণা, খাঁটি শ্বেতাঙ্গরা তাকে দেখতে পারে না। অথচ খাঁটি ইনডিয়ানদের এই হীনম্মন্যতা নেই···দেশটাকে দু'ভাগে ভাগ করে ফেলতে চাইছে সে-শ্বেতাঙ্গ আর ইনডিয়ান। সবাই মিলেমিশে থাক, এটা চায় না। সুন্দর, শান্ত একটা দেশ, খুব আরামে আছি আমরা, মোটেও চাই না এ ধরনের ঘটনা ঘটে যাক, অশান্তি সৃষ্টি

হোক। নিশ্চয় জানো, দক্ষিণ আমেরিকায় বিদ্রোহ মানেই রক্তপাত, ভয়াবহ রক্তপাত। তবে এ সবে বোধহয় ইনটারেস্ট নেই তোমার।'

'ছেলেমানুষ ভেবে বলছেন তো?' হাসল কিশোর। 'আমরা এসেছি তদন্ত করতে। তদন্তের প্রয়োজনে সব কিছুতেই আগ্রহ দেখাতে হয়, দেখাচ্ছিও। অন্ধকারে হাতড়ে বেড়ালে রহস্য ভেদ করা যায় না। আপনার কথায় আলোর আভাস দেখতে পাচ্ছি আমি। আমার বিশ্বাস, ডন গনজালেস আলমান্ডোর রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষের কথা জানেন?'

'নিশ্চয়।'

'হুঁম! বুঝলাম। এ জন্যেই আলমান্ডোর নামটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে এ ভাবে চমকে উঠেছিলেন তিনি। তখনই বুঝেছি, কোন রহস্য আছে। কিন্তু আপনি যা বললেন, সেটা সেনর গনজালেসের বলতে বাধা ছিল কোথায় বুঝতে পারছি না।'

'রাজনীতির কথা শুনলে ভয় পেয়ে যদি তোমরা না আসো, হয়তো সে-জন্যে।'

'হুঁ। কিন্তু টাকা তো আলমান্ডোর অনেক আছে,' ওমর বলল, 'আর কি চায়?'

'ওই যে বললাম, ক্ষমতা। তা ছাড়া কিছু লোকের টাকার খাঁই মেটে না কোনদিন, আরও চায়, আরও চায়। আলমান্ডো ক্ষমতায় গেলে স্বৈরাচার হয়ে উঠবে, কোন সন্দেহ নেই। যেখান থেকেই টাকা আসছে দেখবে, সেখানেই খামচি মারবে। যতদিকে সম্ভব, ছড়িয়ে দেবে তার ব্যবসা।'

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটতে কাটতে মুখ তুলে তাকাল কিশোর। 'আপনার সঙ্গে কথা বলে ভালই হলো, স্যার। খোলাখুলি সব কথা বললেন। অনেক কথা জানতে পারলাম। আপনি আমাদের বিশ্বাস করেছেন, আমরাও আপনাকে বিশ্বাস করছি, সে-জন্যেই জানাচ্ছি কথাটা; হয়তো আমাদের মতই আপনার কাছেও জানাটা জরুরী।'

'অন্য দেশ থেকে এসে এখানকার এমন কি খবর জানাবে আমাকে, যেটা আমি জানি না?' একটা ভুরু উঁচু করলেন জনসন।

'স্যান্টিয়াগোতে পাঠানোর জন্যে কি জিনিস প্যাকেটে ভরে দিয়েছিলেন ডন গনজালেস, জানেন? আমেরিকা থেকে বিপুল টাকা দিয়ে নিলামে কেনা একটা জিনিস। যেটার জন্যে আরও কেউ আগ্রহী। পান্না কেটে বানানো একটা একচোখো মূর্তি, চোখটা তৈরি হয়েছে চুনি পাথর দিয়ে। আমেরিকান বিশেষজ্ঞদের ধারণা, এশিয়া থেকে এসেছে মূর্তিটা। কিন্তু গনজালেস সেটা মানতে পারছেন না। তিনি বলছেন, দক্ষিণ আমেরিকার প্রাচীন সভ্যতার সময়কার একটা সাংঘাতিক ক্ষমতাশালী দেবতার মূর্তি ওটা।'

তাকিয়ে রইলেন জনসন। 'দেবতার নামটা বলেছেন?'

'আতু-হুয়া।'

থমথমে নীরবতা বিরাজ করতে লাগল। অস্বস্তিকর। একভাবে তাকিয়ে আছেন জনসন। জিভ দিয়ে ঠোঁট ভেজালেন।

'আপনিও মনে হয় চমকে গেছেন, স্যার?' বেশিক্ষণ এই নীরবতা সহ্য করতে পারল না কিশোর।
'চমকে না গিয়ে উপায় আছে!'
'কেন জানতে পারি কি?'
সিগারেট টানা বাদ দিয়ে ওমরও স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে এখন জনসনের দিকে। কৌতূহলে কিশোরের মতই ফেটে পড়ছে।
লম্বা দম নিলেন মিস্টার জনসন। 'চিলি, বলিভিয়া, পেরু–তিন জায়গারই ইনডিয়ানদের বিশ্বাস, পাঁচশো বছর আগে স্প্যানিশ অনুপ্রবেশকারীরা তাদের দেবতা আতু-হুয়াকে কেড়ে নিয়েছিল বলেই ক্রমাগত তাদের পরাজয় হতে থাকে। ওদের বিশ্বাস, আবার যদি দেবতাকে ফিরিয়ে আনা যায়, সমস্ত ইয়োরোপিয়ান আর শ্বেতাঙ্গদের দেশ থেকে তাড়ানো সম্ভব হবে।'
'সব ইনডিয়ানরাই বিশ্বাস করে এ কথা?' জানতে চাইল কিশোর।
'অনেকেই করে।'
'ডন গনজালেস করেন?'
'হয়তো করেন না, আমারই মত। কিন্তু তাঁর বা আমার মত কয়েকজনের বিশ্বাস-অবিশ্বাসে তো কিছু হবে না। ব্যাপারটা কোন দিকে মোড় নেবে আঁচ করতে পারছ?'
'ইনডিয়ানদের খেপিয়ে তোলা যাবে।'
'সবাইকে সেটা পারবে না, তবে এখনও যারা বুনো রয়ে গেছে, কুসংস্কারে আচ্ছন্ন তাদের অবশ্যই পারবে। যে ওই দেবতাকে ফিরিয়ে আনতে পারবে, তাদের কাছে সে হবে মহাক্ষমতাশালী ব্যক্তি।'
'আলমাডোই সেই লোক।'
'হ্যাঁ।'
মাথা ঝাঁকাল কিশোর, 'এতক্ষণে আমার কাছে পরিষ্কার হয়েছে, কেন এত দামী একটা জিনিস সাগরের নিচে চিরতরে হারিয়ে যেতে দিতে রাজি আছেন গনজালেস, তবু কোনমতেই কারও হাতে পড়তে দিতে নন। কার হাতে, বুঝতে পারছেন?'
'পারছি।'
'তিনি আতু-হুয়াকে আলমাডোর হাতে পড়তে দিতে চাননি, তাই না?'
'হ্যাঁ।'
'কিন্তু এত বিপজ্জনক জিনিসটা চিলিতে ফেরত পাঠালেন কেন তিনি?'
'হয়তো ভেবেছেন, তাঁর কাছে থাকলে সবচেয়ে নিরাপদে থাকবে। যদি অন্য কোনভাবে ইনডিয়ানদের খেপিয়ে তোলার চেষ্টা করে আলমাডো, মূর্তিটা দেখিয়ে বোঝাবেন, তিনি তার চেয়ে ক্ষমতাশালী, তাঁর কথা শোনা উচিত ওদের। বিদ্রোহ ঠেকানোর চেষ্টা করবেন এ ভাবে।'
'আসল কথাটায় আসা যাক এ বার,' কিশোর বলল, 'মূর্তিটা কি এখন আলমাডোর হাতে পড়েছে, নাকি প্লেনের সঙ্গে সঙ্গে হারিয়ে গেছে?'
'সেটা এখন আমাদের এখানকার লোকের জন্যেও একটা বিরাট প্রশ্ন।

আতু-হুয়া নামটাই ডিনামাইট। দেবতাকে নিয়ে গিয়েছিল বলে স্প্যানিয়ার্ডদের এখনও ক্ষমা করতে পারেনি ইনডিয়ানরা। যদি শোনে দেবতা এখন চিলিতে, তাকে উদ্ধার করার জন্যে প্রাণের পরোয়া করবে না। এমনিতে ওরা পাহাড়েই বাস করে, কালেভদ্রে নেমে আসে রুকাস ছেড়ে–রুকাস হলো পাতার কুঁড়ে, কিন্তু দেবতার কথা শুনলে দলে দলে নেমে এসে প্রলয় কাণ্ড ঘটিয়ে দেবে।'

'কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না, এখানকার জিনিস ইংল্যান্ডে গিয়েছিল কিভাবে?'

'আমি অনুমান করতে পারছি,' জনসন বললেন। 'স্প্যানিশদের হাতে পড়ার পর অন্যান্য মূল্যবান জিনিসের সঙ্গে ট্রফি হিসেবে মূর্তিটাকেও জাহাজে করে স্পেনে পাঠিয়ে দিয়েছিল ওরা। তখনকার দিনে প্রায়ই ইংরেজ জলদস্যুদের কবলে পড়ত স্প্যানিশ গ্যালিয়ন। মূর্তি যেটাতে ছিল সেটাও নিশ্চয় ওদের কবলে পড়েছিল। সমস্ত জিনিস লুট করে নিয়েছিল জলদস্যুরা। নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিয়েছিল। তাদেরই কেউ মূর্তিটাকে ইংল্যান্ডে নিয়ে গিয়েছিল।'

কিশোরও একমত হলো জনসনের সঙ্গে। 'হ্যাঁ, এ ধরনের কিছুই ঘটেছিল।'

'যাকগে। সব তো শুনলে। এখন কি করতে চাও? আমার পরামর্শ যদি শোনো, মূর্তির কথা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও।'

'গেলেই ভাল হতো,' মুখ খুলল ওমর, 'বুঝতে পারছি। কিন্তু এতখানি এসে খালি হাতে ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে না। বীমা কোম্পানির অনেক টাকা খরচ করে ফেলেছি।'

'কি করবেন তাহলে?'

'জানি না। তবে আর যা-ই করি, দক্ষিণ আমেরিকার রাজনীতিতে জড়াতে যাচ্ছি না। ডন গনজালেস সব যদি খুলে বলতেন, আসার আগে দশবার চিন্তা করতাম।'

'আসবেন না জেনেই হয়তো চেপে গেছেন। আপনারা না এলে মূর্তিটা উদ্ধার করে দেবে কে?'

'তাঁর সঙ্গেই বরং দেখা করা দরকার। আমরা সব জেনে গেছি দেখলে বোধহয় আরও খোলাখুলি কথা বলবেন এখন। তাঁর বাড়িটা কোনখানে?'

'বাড়ির নাম ক্যাসা পিজ্‌মোরেল্ডা।'

'কোথায় ওটা?'

'আমাদের এ জায়গা আর এয়ারপোর্টের মাঝামাঝি।'

'আর আলমাভোর? তিনি কোথায় থাকেন?'

'একই রাস্তায়, স্যান্টিয়াগো থেকে মাইলখানেক বা কিছু বেশি হবে। বাড়িটা পাহাড়ের ওপরে। ওর বাড়ির নাম ক্যাসটেল আলমাভো। সহজেই চিনে ফেলবেন, ভুল হবে না, বাড়ির গেটে সব সময় একজন ইনডিয়ান দারোয়ান পাহারায় থাকে।'

'কেন?'

শ্রাগ করলেন জনসন। 'ওর চাকর-দারোয়ান সবই ইনডিয়ান।'

'কিন্তু কারণটা কি?'

'আমি হয়তো অনুমান করতে পারব। কিন্তু গিয়ে দেখলে আপনি নিজেই বুঝে যাবেন কেন রেখেছে।'

'ডন গনজালেস আর আলমান্ডোর মধ্যে সম্পর্ক কেমন?'

'ওপরে ওপরে ভদ্রতা রক্ষা করে চলে। তবে রাজনীতিতে যেহেতু দুজন দুই দলকে সাপোর্ট করে, গলায় গলায় ভাব থাকার কোনই কারণ নেই।'

'হুঁ, তা ঠিক,' সিগারেটের গোড়াটা অ্যাশট্রেতে পিষল ওমর। 'অনেক ধন্যবাদ, স্যার, আপনাকে। অনেক কথা জানালেন। সময় নষ্ট করলাম। উঠি এখন।'

'কিন্তু আমি সময়টাকে নষ্ট ভাবছি না। চলে আসবেন, যখন খুশি, যে কোন সমস্যা···আবার যদি আসেন খুশি হব।'

'আসব।'

ছয়

'কি বুঝলেন?' রাস্তায় বেরিয়ে জিজ্ঞেস করল কিশোর। হেঁটে ফিরে চলেছে হোটেলে।

'অনেক খবরই জানলাম, কেবল আসল খবরটা বাদে—প্লেনটার কি হয়েছে। গোলমেলে ওই দেবতাটা কোথায়, এই একটা প্রশ্নের জবাব পেলেই অনেক কিছু এখন পরিষ্কার হয়ে যেত; বুয়েনস এয়ারেস ছাড়ার পরেও কি প্লেনে ছিল ওটা, নাকি কোন কায়দায় হাতিয়ে নিয়েছেন আলমান্ডো? এ সব প্রশ্নের জবাব দিতে পারবেন একমাত্র মার্সেল ব্রিজাক। তাঁকে জীবন্ত খুঁজে পাওয়ার আশাও খুব ক্ষীণ। আতু-হুয়া এখন কোথায়, তার ওপর নির্ভর করছে চিলির ভাগ্য, ভাবনাটাও অস্বস্তিকর।'

'প্লেনটাকে দুর্ঘটনা ঘটাতে বাধ্য করা হয়েছে, এ সম্ভাবনাটা জোরাল হয়েছে আরও।'

মাথা ঝাঁকাল ওমর। 'যা বোঝা যাচ্ছে, দুটো শক্তিশালী দল রয়েছে এখানে। সবুজ দেবতাটা হচ্ছে দুটো দলের মধ্যে খুনোখুনি বাধিয়ে দেয়ার চাবিকাঠি। গোড়া থেকেই কাজটা পছন্দ হয়নি আমার। এখন আরও হচ্ছে না। আতু-হুয়া তো দেবতা না, একটা বোমা; সেই বোমা খুঁজে বের করে পকেটে ভরার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই আমার। প্রাণের ভয় আমি করি না, কিন্তু এ যে নোংরা কাজ।'

'চলে যখন এসেছি, ও সব ভাবলে এখন চলবে না, মূর্তিটাকে খুঁজে বের করতেই হবে আমাদের। বীমা কোম্পানি এখন আমাদের ওপর নির্ভর করে

আছে। ভয় পেয়ে খালি হাতে ফিরে গেলে তাদের কাছে মুখ থাকবে না মিস্টার সাইমনের।'

'ফাঁদে তো পড়েছি সেইখানটাতেই। বীমা কোম্পানি বাঁচাতে চাইছে তাদের এক কোটি ডলার। কিন্তু মূর্তিটা খুঁজে পেলে এ দেশটার যে সর্বনাশ হবে, তার দাম কত হবে ভেবে দেখেছ?'

'যাদের ভাবনা তারা ভাবুক। আমরা কি করতে পারি?'

'তাদের একজন ডন গনজালেস। তাঁর সঙ্গে কথা বলতে পারি। যদি তিনি বাড়ি থাকেন।'

'কোন ব্যাপারে কথা বলব?'

'যখন জানবেন, তিনি যা বলেছেন, তার চেয়ে বেশি জেনে গেছি আমরা, এর গোড়ায় কি আছে জানিয়ে দেবেন হয়তো। যত যা-ই হোক, এর শুরুটা তো তিনিই করেছেন।'

'নতুন আর জানার কি আছে? মূর্তিটা খুঁজে পাওয়া না গেলে বীমার টাকা দাবি করবেন তিনি। কোম্পানি টাকা দিতে বাধ্য হবে। আমাদের এ মিশনের কোন অর্থ থাকবে না। বরং আরেক কাজ করা যাক,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর। 'সেনর আলমাডোর সঙ্গে কথা বলি গিয়ে। যা জানি, তার বেশি কিছু যদি জানা থাকে কারও, তাঁর থাকবে।'

'থাকলেও বলবেন না। শুধু শুধু আমাদের উদ্দেশ্যটা ফাঁস করে দিয়ে আসব তাঁর কাছে।'

'ভেবে দেখুন। আর কি করার আছে আমাদের?'

মিনিটখানেক চুপচাপ হাঁটল ওমর। তারপর বলল, 'আমার মনে হয়, প্লেনটা ধ্বংসই হয়ে গেছে। নইলে কোথাও না কোথাও দেখা যাওয়ার খবর চলেই আসত।'

'ধ্বংস হয়ে গিয়ে থাকলেও বাঁচাবাঁচি নেই বীমা কোম্পানির। গনজালেস টাকা দাবি করতে পারবেন তখনও।'

'তা ঠিক। প্লেনটা পুড়লে মূর্তিটাও পুড়বে। পান্না হোক চুনি হোক, যে পাথরই হোক, ভয়ঙ্কর ওই আগুনের তাপ সহ্য করতে পারবে না।'

'গিয়ে যদি রিপোর্ট দিই আমরা, আতু-হুয়া ধ্বংস হয়ে গেছে, গনজালেসের ক্লেইম আরও জোরাল হবে,' কিশোর বলল। 'ওটা ঠেকাতেই পাঠানো হয়েছে আমাদের, বিপক্ষকে শক্ত করে দেয়ার জন্যে নয়।'

'তারচেয়েও বড় কথা, হাজার হাজার নিরীহ লোকের অকাল মৃত্যু ঠেকানো। ডন গনজালেসকে বোঝানো দরকার সেটা।'

'কে বোঝাবে? আমাদের কথা তিনি শুনবেন কেন? তা ছাড়া এক তরফাভাবে বীমা কোম্পানিরই বা পক্ষ নিতে যাব কেন আমরা? ওদের ব্যবসাই এটা, মানুষের ক্ষয়-ক্ষতির দায়িত্ব নেয়া। মোটা টাকা প্রিমিয়াম নিয়েছে, এখন টাকা দিতে এত গড়িমসি কেন? নেয়ার সময় তো খুব জলদি জলদি।'

'তা-ও ঠিক। সবদিকেই যুক্তি আছে। তর্কাতর্কিতে কিছু এগোবে না, বাদ দেয়াই ভাল। যা করার ভেবেচিন্তে সাবধানে করতে হবে এখন আমাদের।

জনসনের কাছে যা শুনলাম, সত্যি হলে আলমাডো আর গনজালেস দু'জনেই এখানে টেকা কঠিন করে তুলতে পারে আমাদের। থাকগে, বকর বকর করে লাভ নেই। আমাদের কাজ প্লেনটা খুঁজে বের করা। আজ আর বেরোতে পারব না। সময় নেই। কাল আবহাওয়া ভাল থাকলে বেরোব।'

হোটেলে ঢুকল ওরা। রিসিপশনিস্ট জিজ্ঞেস করল, 'সেনর শরীফ?'

'সি,' জবাব দিল ওমর।

একটা খাম বাড়িয়ে দিল ডেস্কের ওপাশে বসা লোকটা, 'আপনার।'

অবাক হলো ওমর। চট করে তাকাল একবার কিশোরের দিকে। খামটা নিল। খামের ওপরে তার নাম লেখা। মুখ ছিঁড়ে ভেতর থেকে বের করল এক টুকরো কাগজ। নীরবে চোখ বুলিয়ে বাড়িয়ে দিল কিশোরের দিকে।

কিশোরও পড়ল। ইংরেজি বড় হাতের অক্ষরে লেখা বাক্যটার মানে করলে দাঁড়ায়:

শুভাকাঙ্ক্ষীর পরামর্শ চাইলে বলব, বাড়ি ফিরে যান।

খামটা উল্টেপাল্টে দেখল কিশোর। ডাকঘরের ছাপ নেই। হাতে হাতে দিয়ে গেছে। রিসিপশনিস্টকে জিজ্ঞেস করল, 'কে দিয়ে গেছে?'

'জানি না, সেনর,' ভাবলেশহীন করে রেখেছে চেহারাটা। 'আমি তখন ডিউটিতে ছিলাম না।'

'কে ছিল?'

একই রকম ভাবলেশহীন ভঙ্গিতে জবাব দিল সে, 'তা-ও জানি না। কে নিয়েছে, সেটাও বলতে পারব না। ডেস্কের ওপর পড়ে থাকতে দেখলাম।'

ইচ্ছে করে কেউ যদি 'না জানে,' তার মুখ থেকে কথা আদায় করা কঠিন; আর এই লোকটাকে দেখে মনে হলো কথা বের করা অসম্ভব। চাপাচাপি করে লাভ হবে না। কিশোরের দিকে তাকিয়ে শান্তকণ্ঠে বলল ওমর, 'চলো, এক কাপ চা খাই।'

লাউঞ্জে এসে বসল দুজনে। ওয়েইটারকে চায়ের অর্ডার দিল ওমর। লোকটা চলে গেলে কিশোরের দিকে ফিরল, 'কি মনে হচ্ছে?'

'কেউ একজন আগ্রহ দেখাচ্ছে আমাদের প্রতি।'

'কে?'

'কি করে বলব?'

'আমরা কেন এসেছি, সেটা বেশি লোকে জানে না। খামটা যে পাঠিয়েছে, সে তাদের মধ্যে একজন। আমরা যখন বাইরে ছিলাম, তখন দিয়ে গেছে। মিস্টার জনসনকে বাদ দেয়া যায়; তাঁর অফিসে আমরা যাওয়ার আগে জানতেনই না আমরা এসেছি। এমন কেউ দিয়েছে যে আমাদের ল্যান্ড করতে দেখেছে, আমাদের ওপর নজর রেখেছে, আমার নাম জানে। গনজালেস নিশ্চয় লিখবেন না। কোন কারণ নেই। তাঁর পক্ষেই কাজ করছি আমরা। আমাদের বাড়ি চলে যেতে বলবেন না। একটা লোককেই সন্দেহ করা যায়।'

'আলমাডো।'

'হ্যাঁ। শেষবার তাঁকে দেখা গেছে বুয়েনস এয়ারেসে। তবে জনসনের সঙ্গে কথা বলে মনে হচ্ছে, এতদিনে তিনি বাড়ি ফিরে এসেছেন। আমাদের এখানে থাকাটা তাঁর পছন্দ নয়। যতই শুভাকাঙ্ক্ষী পরিচয় দিয়ে লিখুক, লেখক মোটেও আমাদের ভাল চায় না, সে-জন্যেই সরিয়ে দিতে চাইছে। রীতিমত হুমকি দেয়া হয়েছে।'

'ভয় দেখিয়ে তাড়াতে চাইছে?'

'তা ছাড়া আর কি? ভয় পাচ্ছে আমাদের–যদি সত্যি সত্যি প্লেন কিংবা মূর্তিটা খুঁজে বের করে ফেলি। নইলে চলে যেতে বলবে কেন?'

চা নিয়ে এল ওয়েইটার। চলে যাওয়ার পর কিশোর বলল, 'আর যা-ই করি, বাড়ি আমি কোনমতেই ফিরে যাচ্ছি না এখন।'

'আমিও না,' জেদ চেপে গেছে ওমরের।

'কিছু কিছু ব্যাপার মোটেও মিলছে না,' নিজেকে যেন বোঝাচ্ছে কিশোর। 'গনজালেস নিজে যতটা চাইছেন এখন মূর্তিটা, তারচেয়ে অনেক বেশি চাইছেন ওটা কারও হাতে না পড়ুক। ধরা যাক, প্লেনটা তিনিই গায়েব করেছেন; কেন করবেন? মূর্তিটাকেই বা তিনি পাঠাবেন কেন এখানে? ওটা বিপজ্জনক মনে হলে, ধ্বংস করে দিতে চাইলে কেনার পর নিজে নিজেই তো সেটা করতে পারতেন। একটা নৌকায় করে গিয়ে প্রশান্ত মহাসাগরে ফেলে দিয়ে আসতে পারতেন। আবার জনসনের কথা বিশ্বাস করলে, মূর্তিটা হাতে পেলে বিরাট ক্ষমতা পেয়ে যাবেন আলমাডো। প্লেন থেকে যদি হাতিয়ে নিয়ে থাকেন জিনিসটা, হয়েই তো গেল, তাঁর উদ্দেশ্য সফল; প্লেনটা গায়েব করতে যাবেন কোন কারণে?'

'হতে পারে, প্লেন গায়েব হওয়াটা পুরোপুরি কাকতালীয়। যে কোন মুহূর্তে, যে কোন জায়গায় প্লেন অ্যাক্সিডেন্ট অসম্ভব কোন ব্যাপার নয়।'

'তারপরেও প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে: বুয়েনস এয়ারেসে মূর্তিটা নিখোঁজ হলে সেটা জেনে যাওয়ার কথা মার্সেল ব্রিজাকের। সঙ্গে সঙ্গে তিনি গনজালেসকে জানাতেন সেটা। অন্তত এয়ারপোর্টে নেমে কর্তৃপক্ষের কাছে ডাকাতির অভিযোগ করতেন। করেননি। এর একটাই মানে, তখনও প্লেনেই ছিল মূর্তিটা। প্লেনটা ধ্বংস হয়ে গিয়ে থাকলে তিনিও মরে গেছেন, আমাদের প্রশ্নের জবাব পাওয়া যাবে না তাঁর কাছ থেকে। তবে আমার ধারণা, এ সব নয়, অন্য কোন ব্যাপার আছে। অন্য কিছু ঘটছে, যা আমরা জানি না।'

'কি করতে চাও তাহলে?'

'প্রথমত, আলমাডোর সঙ্গে দেখা করতে চাই, যা বলেছিলাম। অবশ্য যদি তিনি বাড়ি ফিরে থাকেন। আছেন কিনা তা-ও দেখা দরকার।'

'যদি থাকেন?'

'তাঁকে সরাসরি জিজ্ঞেস করব, চিঠিটা তিনি লিখেছেন নাকি, কেন লিখেছেন? চমকে যান কিনা দেখব।'

'কখন যেতে চাও?'

'এখনই। লোহা লাল থাকতে থাকতেই সেটাকে পেটানো উচিত, নইলে

সাইজ করা যায় না। আলমাডোর সঙ্গে দেখা হলেই বুঝতে পারব, পরবর্তীতে আমাদের সঙ্গে কি ধরনের আচরণ করবেন তিনি। শত্রুকে আগে থেকেই চিনে রাখা দরকার।'

চা শেষ করে সিগারেট ধরাল ওমর। 'বেশ। যা ভাল মনে করো। তবে একই রোডে থাকেন যখন আগে গনজালেসের সঙ্গে দেখা করে যাব কি যাব না, তাঁকে জিজ্ঞেস করলে ভাল হয় না?'

'কেন?'

'বিরোধী দলের কারও সঙ্গে দেখা করাটা বোধহয় ভালভাবে নেবেন না তিনি।'

'তাতে আমাদের কি? কার সঙ্গে কেন দেখা করব সে-জবাব আমরা তাঁর কাছে দিতে বাধ্য নই। তিনি আমাদের মক্কেল নন। বীমা কোম্পানির কাজ করছি আমরা, জবাবদিহি করতে হলে একমাত্র তাদের কাছেই করব।'

বাইরে বেরোতেই ট্যাক্সি পেয়ে গেল। ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করল ওমর, 'ক্যাসটেল আলমাডো চেনো, সেনর আলমাডোর বাড়ি?'

'সি, সেনর,' হাসিমুখে জবাব দিল ড্রাইভার।

'গুড। সেখানে যাব আমরা।'

'প্রন্টো, সেনর।'

গাড়িতে উঠল দুজনে।

কয়েক মিনিটেই গন্তব্যে পৌঁছে গেল। বিরাট এক প্রাসাদ তৈরি করা হয়েছে পুরানো স্প্যানিশ ঔপনিবেশিক স্টাইলে। রাস্তা থেকে বেশ কিছুটা দূরে। যে পথটা প্রাসাদে গেছে, তার দুই পাশে ঘন করে লাগানো হয়েছে সাইপ্রেস, গোলাপ, মিমোসা আর নানা রকম ফুলে ভরা গাছ এবং ঝোপ। সাদা গেটটা বন্ধ। সেন্ট্রি-বক্সে পাহারা দিচ্ছে একজন ইনডিয়ান দারোয়ান। ট্যাক্সি থেকে নেমে ড্রাইভারকে অপেক্ষা করতে রাজি আছে কিনা জিজ্ঞেস করল ওমর। হাসিমুখে রাজি হলো লোকটা।

গেটের কাছে এসে দাঁড়াল কিশোর আর ওমর।

সেন্ট্রি-বক্স থেকে বেরিয়ে এল দারোয়ান। কি চায় জিজ্ঞেস করল ওদের।

'সেনর আলমাডোর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি আমরা,' ওমর বলল, 'যদি তিনি বাড়ি থাকেন।'

'নাম?'

'ওমর শরীফ। আমেরিকার লস অ্যাঞ্জেলেস থেকে এসেছি।'

'দাঁড়ান।'

'কথা খুব কম বলে,' নিচুস্বরে মন্তব্য করল কিশোর।

'সে-রকমই শেখানো হয়েছে হয়তো। তাতে সময় কম নষ্ট হয়।'

সেন্ট্রি-বক্সে ঢুকল গিয়ে আবার দারোয়ান। হুক থেকে হাউজ-টেলিফোন নামিয়ে কথা বলতে লাগল। ভাষাটা বুঝতে পারল না ওরা। মিনিটখানেকের মধ্যেই বেরিয়ে এসে কোন কথা না বলে গেট খুলে দিল দুজনকে ঢোকার জন্যে।

'আমি তো ভেবেছিলাম,' ওমর বলল, 'ঢুকতে পারলেও অন্তত দু'তিন ঘণ্টা বসে থেকে তবে পারব। আমার ব্যাপারে কৌতূহলী মনে হচ্ছে সেনর আলমাভোকে!'

কেউ বোধহয় আড়াল থেকে নজর রাখছিল ওদের ওপর। কারণ সামনের দরজার সামনে আসার সঙ্গে সঙ্গে মাথার ওপরের একটা আলো জ্বলে উঠল। খুলে গেল দরজাটা। হাউস সারভেন্টের পোশাক পরা আরেকজন ইনডিয়ান দাঁড়িয়ে আছে দরজার ওপাশে। মাথা নুইয়ে সালাম জানাল ওদের। দামী আসবাবে সাজানো একটা হলে নিয়ে গেল। ঘরের অন্যপ্রান্তে দাঁড়ানো একজন ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন ওদের দেখে। পরিষ্কার ইংরেজিতে বললেন, 'আমার নাম আলমাভো। খুব খুশি হলাম আপনাদের দেখে। আসুন।'

সুন্দর করে সাজানো একটা বসার ঘরে ওদের নিয়ে গেলেন তিনি। সব কিছুতেই সুরুচির পরিচয় দেখা গেল। 'বসুন, প্লীজ। কিছু দেব? শেরি?' কিশোরের দিকে তাকাল, 'ঠাণ্ডা কিছু?'

'না না, থ্যাংক ইউ,' ওমর বলল।

কিশোরও মাথা নাড়ল। তাকিয়ে আছে আলমাভোর দিকে। দেখছে ভালমত। ছিপছিপে, ছোটখাট একজন মানুষ। ক্লীন শেভ করা। চামড়ার রঙ শ্বেতাঙ্গদের চেয়ে ময়লা, আবার ইনডিয়ানদের তুলনায় সাদা। মা ইনডিয়ান বলেই বোধহয় এমন হয়েছে। পোশাক যেমন অভিজাত, ব্যবহারটাও খুব ভদ্র। ভিন্ন ব্যবহার আশা করেছিল কিশোর।

সাত

চেয়ারে বসল ওমর। আলমাভোর দেয়া সিগারেট ধরাল। বলল, 'কিছু যদি মনে না করেন, একটা কথা জিজ্ঞেস করি। আমাদের দেখে খুশি হওয়ার কারণ?'

'আপনাদের একটা ফোন করব ভাবছিলাম,' দুজনকে অবাক করে দিয়ে বললেন আলমাভো। 'পরে ভাবলাম, পরেই করি। বহুদূর থেকে এসেছেন। একটু বিশ্রাম নিন, তারপর করা যাবে।'

'কি জন্যে ফোন করার কথা ভেবেছেন?'

'মনে হলো আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইবেন আপনারা। এখন বুঝতে পারছি, আমার অনুমান ঠিকই ছিল।'

'কেন আপনার মনে হলো, আমরা দেখা করব?'

'যে কারণে এ দেশে এসেছেন আপনারা।'

'তারমানে আপনি জানেন?'

'অনুমান করতে পারছি।'

এত খোলাখুলি আলোচনা আশা করেনি ওমর। 'আমি কেন আপনার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছি, সেটা তো জানি, কিন্তু বুঝতে পারছি না আপনি কেন

দেখা করতে চেয়েছেন?'

'বুঝতে পারবেন। মেহমান হয়ে এসেছেন আমার দেশে। ভালমন্দ দেখার একটা দায়িত্ব বোধ করছি। কোথাও গেলে, কারও সঙ্গে কথা বললে একটু সতর্ক হয়ে বলবেন। বাইরে থেকে যতটা শান্ত দেখছেন, পরিস্থিতি আসলে অতটা শান্ত নয়। বিপদে পড়ার আগেই বাড়ি চলে যেতে অনুরোধ করব আমি আপনাকে।'

'থ্যাংক ইউ। আপনার মূল্যবান পরামর্শের জন্যে অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু অনেক কষ্ট করে বহুদূর থেকে এসেছি আমরা। এই সুন্দর দেশটা না দেখে যেতে ইচ্ছে করছে না। একটা প্রশ্নের জবাব দেবেন? আমাদের আসার খবর আপনি জানলেন কি করে?'

'আমার এক বন্ধুর কাছে।'

'অবাক করছেন, সেনর। এখানকার খুব কম লোককেই চিনি আমরা। দয়া করে বলবেন কি, আমাদের প্রতি এত কৌতূহল কার?'

'নিশ্চয়। গোপন করার কোন প্রয়োজন দেখছি না। ডন হুয়ান গনজালেস ফোন করে আমাকে জানিয়েছে।'

চমকে গেল ওমর। আর যা-ই ভাবুক, এটা ভাবেনি। সামলে নিতে সময় লাগল। 'আপনার কাছে কেন এসেছি, বলি এখন; সব যখন এত খোলাখুলিই বলছেন, আমারও বলতে বাধা নেই।' পকেট থেকে খামটা বের করল সে। তাকিয়ে আছে আলমান্ডোর মুখের দিকে। কোন ভাবান্তর হয় কিনা দেখছে। ভেতরের কাগজটা খুলে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'এটা আপনি লিখেছেন?'

লেখাটা পড়লেন আলমান্ডো। চোখ বড় বড় হয়ে গেল। জোর গলায় বললেন, 'না, আমি লিখিনি।'

'থ্যাংক ইউ, সেনর। আমার প্রশ্নের জবাব পেয়ে গেছি।'

'আমি কেন এ ধরনের চিঠি লিখতে যাব বলুন?'

'একটু আগে মুখেও কিন্তু এ ধরনের কথাই বললেন–আমাদের দেশ ছেড়ে চলে যেতে।'

'সামনাসামনি কাউকে পরামর্শ দেয়া এক কথা, কিন্তু নাম-ঠিকানা গোপন করে হুমকি দেয়া আরেক। যদি চিঠিই লিখব, দেখা করতে চাইব কেন আপনাদের সঙ্গে?'

যুক্তি-সঙ্গত কথা। ওমর বলল, 'এত কথাই যখন হলো, কয়েকটা প্রশ্ন করলে জবাব দেবেন?'

'করুন, সেনর। আপনাকে আমি সত্যি সাহায্য করতে চাই।'

'থ্যাংক ইউ। ঠাণ্ডা খাব কিনা জিজ্ঞেস করেছিলেন তো। খাব। এক গ্লাস ঠাণ্ডা পানি।'

'শিওর।' সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে ফ্রিজ খুলে ঠাণ্ডা পানির বোতল বের করে আনলেন আলমান্ডো। দুটো গ্লাসও এনে রাখলেন টেবিলে।

'গোড়া থেকেই শুরু করি,' খালি গ্লাসটা নামিয়ে রেখে বলল ওমর, 'তাহলে বুঝতে পারব কোনখানে দাঁড়িয়ে আছি আমরা। ডন গনজালেসকে তো

আপনি চেনেন।'

'জন্ম থেকে। দুজনে এখানেই জন্মেছি। আমার প্রতিবেশী। অনেক ব্যাপারে একই রকম আগ্রহ দুজনের।'

'অল্প কিছুদিন আগে আমেরিকা থেকে একটা ছোট মূর্তি কিনেছেন আপনার প্রতিবেশী।'

'জানি। মূর্তিটা আমারও পছন্দ। নিলাম ডাকার সময় আমিও উপস্থিত ছিলাম। সাধারণ একটা কিউরিয়োর জন্যে ওর মত এত টাকা খরচ করতে আগ্রহী ছিলাম না আমি।'

আবার চমকানোর পালা ওমরের। এ রকম সহজ স্বীকারোক্তি আশা করেনি।

আলমান্ডো বললেন, 'গনজালেসের অনেক টাকা। কিন্তু তাই বলে একটা ইনকা-রেলিকসের জন্যে অত টাকা খরচ করাটা আমার কাছেও অবাক লেগেছে। সেটা যত প্রাচীনই হোক না কেন। আমিও তো একজন সংগ্রাহক।'

'ও, আপনিও তাহলে সংগ্রাহক?' আর কোন কথা খুঁজে পাচ্ছে না ওমর।

'আমার সংগ্রহ করা জিনিস দেখার ইচ্ছে হলে দেখতে পারেন।'

ঘরের চারপাশে চোখ বোলাল ওমর। বেশ কিছু অচেনা অদ্ভুত জিনিস, মগ, জগ, মূর্তি সাজিয়ে রাখা হয়েছে তাক আর কেবিনেটে; আলমান্ডো বলার আগে লক্ষই করেনি। কিশোর অবশ্য আগেই দেখেছে।

'তারমানে ডন গনজালেস কি কিনেছেন, আপনি জানেন,' ওমর বলল।

'জানি। একটা বহু প্রাচীন দেবতা, সম্ভবত শভিন সভ্যতার যুগের; দেবতার নাম আতু-হুয়া।'

ক্রমেই বিস্ময় বাড়ছে ওমরের। 'ব্যবসার কাজে আটকে যাওয়ায় নিজে আসতে পারেননি গনজালেস, অন্যের হাতে দেশে পাঠিয়েছেন মূর্তিটা; নিশ্চয় তা-ও জানেন?'

'জানি। তার পরিচিত এক লোকের কাছে দিয়েছিল মূর্তিটা।'

'ওই লোককে চেনেন?'

'চিনব না কেন? মার্সেল ব্রিজাক। একই সোসাইটির লোক আমরা। যদিও স্যান্টিয়াগো থেকে বেশ কিছুটা দূরে সিয়েরায় তার বাড়ি। সে-ও অ্যানটিক সংগ্রহ করে। প্রাচীন ফলকে খোদাই করা বিস্ময়কর কিছু লেখার অনুবাদ করেছে। ওই অক্ষর দিয়ে ইনডিয়ান ভাষায় একটা বইও লিখেছে।'

'প্যাকেটে কি ছিল, তিনি জানতেন?'

'হ্যাঁ।'

'কি করে জানলেন?'

'গনজালেস নাকি বলেছে, আমাকে তো তা-ই বলল।'

'সে-জন্যেই কি প্লেনে তাঁর পাশে সীট নিয়েছিলেন?'

'না। ওটা কাকতালীয়। জরুরী খবর গিয়েছিল আমার কাছে, বুয়েনস এয়ারেসে আমার ভাই ভীষণ অসুস্থ। সব কাজ ফেলে ভাইকে দেখতে ছুটলাম। প্লেনটা যাচ্ছে শুনে তাতেই উঠে পড়লাম। বুয়েনস এয়ারেসে সে-

জন্যেই নেমে গিয়েছিলাম।'

'আপনার ভাগ্য ভাল, তাই নেমে গিয়েছিলেন।'

'এখন তো তা-ই মনে হচ্ছে। তবে প্লেনটা পাওয়াতেও খুব উপকার হয়েছিল। আমার ভাইয়ের সঙ্গে শেষ দেখাটা হয়েছে। আমি যাওয়ার একটু পরেই মারা গেছে সে। তারপর তার সম্পত্তির ব্যবস্থা করতে হয়েছে আমাকে। বাড়ি ফিরতে অনেক দেরি হয়ে গেছে আমার।'

'ও।...হ্যাঁ, তা এই যে দেবতা, আতু-হুয়া, শৈল্পিক মূল্য ছাড়া আর কোন মূল্য আছে কি ওটার? সঙ্গে তো অনেক দামী একটা চুনি পাথরও আছে।'

'বিশ্বাস করা হয়, সাংঘাতিক অলৌকিক ক্ষমতা আছে মূর্তিটার। কিন্তু ওটা একেবারেই কুসংস্কার।'

'সবাই নিশ্চয় আপনার সঙ্গে একমত হবে না।'

হাসলেন আলমাডো। 'এটা একটা স্বাধীন দেশ, স্বাধীনভাবে চিন্তা-ভাবনা করার, কাজ করার অধিকার আছে; বেআইনী কিছু না করলেই হলো। আমি যা বললাম, সেটা আমার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। সেনর শরীফ, আমি আপনার সব প্রশ্নের জবাবই দিলাম, এখন আপনি যদি আমার প্রশ্নের জবাব দেন, খুশি হব।'

'বলুন?'

'আতু-হুয়ার ব্যাপারে আপনার ইনটারেস্টটা কি? কেন এসেছেন এ দেশে?'

'মূর্তিটার প্রতি ব্যক্তিগত ভাবে আমার কোন রকম আগ্রহ নেই। এসেছি স্রেফ টাকার জন্যে, কাজ করে দিতে পারলে কমিশন পাব। ডন গনজালেস ক্লেইম করলে অনেক টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে বীমা কোম্পানিকে। ওরাই আমাদের বহাল করেছে।'

'ও, গনজালেস করেনি?'

'না। কাজটা নেয়ার আগে তাঁর সঙ্গে দেখাই হয়নি আমাদের।'

'আপনাদের কাজ আতু-হুয়াকে খুঁজে বের করা?'

'কিংবা ওটার কি হয়েছে সে-ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া।'

'কি করে করবেন ভাবছেন?'

'আপাতত তথ্য জোগাড়ের চেষ্টা করছি। তাতে নিশ্চয় কোন বিপদ নেই? আমি এখনও বুঝতে পারছি না, মূর্তিটার ব্যাপারে আমরা খোঁজখবর করলে কার কি ক্ষতি?'

'ক্ষতিটা কি জানি না, তবে আপনাকে সফল হতে দিতে চায় না, এটা বোঝা যাচ্ছে।'

'কে, বলতে পারেন?'

শ্রাগ করলেন আলমাডো। 'আমাকে জিজ্ঞেস করে লাভ নেই। তবে মূর্তিটা খুঁজে বের করে যদি নিয়ে যেতে চান, কিছু কিছু মানুষ সেটা পছন্দ না-ও করতে পারে।'

'বের করে নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে আমাদের নেই। যাঁর জিনিস তাঁকে ফিরিয়ে দিলেই যথেষ্ট। তিনিও আর ক্লেইম করতে পারবেন না, বীমা কোম্পানিকেও টাকা দিতে হবে না। যাই হোক, আপনি কোন মানুষদের কথা

বলছেন?'

'ধরুন, আরুক্যানিয়ান ইনডিয়ানরা। প্রাচীন দেবতাকে ভোলেনি ওরা। ধর্মের অনেক কিছু এখনও ওরা আগের মতই পালন করে।'

'আপনি করেন?'

হেসে উঠলেন আলমান্ডো। 'আমি? আগেই বলেছি, আমি কুসংস্কার বিশ্বাস করি না।'

'তাহলে এর বেশি আর কোন সাহায্য আপনি করতে পারছেন না আমাদের?'

'আমার সাধ্যমত আমি করেছি।'

'ঠিক আছে, উঠি। আপনার অনেক সময় নষ্ট করলাম। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।'

'আরও কিছু করতে পারলে খুশি হতাম,' আলমান্ডোর কথাটা আন্তরিকই মনে হলো ওমরের।

দরজা পর্যন্ত ওদের এগিয়ে দিলেন তিনি। বিদায় দেয়ার আগে দুজনের সঙ্গেই হাত মেলালেন। বেরোনোর আগের মুহূর্তে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'একটা কথা জিজ্ঞেস করি, স্যার, দয়া করে ঠিক জবাবটা দেবেন–আপনার কি মনে হয় বীমার টাকার জন্যে নিজেই মূর্তিটাকে উধাও করে দিয়েছেন ডন গনজালেস?'

মুচকি হাসলেন আলমান্ডো। জোরে জোরে মাথা নাড়লেন। 'না। তার ঘোরতর শত্রুও অন্তত এই অপবাদ দিতে পারবে না। নিজে যদি করেই থাকে–তোমার যেটা সন্দেহ–তাহলে অন্য কোন কারণে করেছে। টাকার জন্যে নয়, এটুকু জোর গলায় বলতে পারি।'

'থ্যাংক ইউ, স্যার।'

*

ড্রাইভওয়ে ধরে ফিরে চলল ওরা। রাত হয়ে গেছে। তবে চাঁদের আলো আছে। ওমর জিজ্ঞেস করল, 'আর কি কিছু জিজ্ঞেস করার ছিল?'

'না, সবই তো করা হয়েছে। আর কি বাকি?'

'কি মনে হচ্ছে তোমার?'

মাথা নাড়তে নাড়তে কিশোর বলল, 'শুরুর চেয়ে আরও ঘোলাটে। কোন কারণে, কেউ আমাদের ভুল পথে নিয়ে যাচ্ছে। জেনেশুনে ইচ্ছে করেই হোক, বা অনিচ্ছাতে।'

'তারমানে কেউ মিথ্যে বলছে?'

'তা বলছি না এখনও। তবে যাদের সঙ্গে কথা বলেছি তারাও ভুল তথ্য পেয়ে থাকতে পারে।'

'আলমান্ডোর আচরণে বা কথায় কিন্তু কোন রকম সন্দেহ জাগে না তাঁর ওপর।'

'তা জাগে না। ইচ্ছে করে সত্যি কথা যদি না বলে থাকেন, তাহলে সেরা অভিনেতা বলে মেনে নিতে হবে তাঁকে। এমনই একটা পরিস্থিতিতে পড়লাম, কাউকেই বিশ্বাস করতে পারছি না।'

'তিনজনের মধ্যে কাকে অবিশ্বাস করব? গনজালেস, জনসন আর আলমাভো—এঁদের মধ্যে কোনজন আমাদের ভুল পথে চালিত করছেন? মার্সেল ব্রিজাকের সঙ্গে তো দেখাই হয়নি, সুতরাং তাঁর কথা বাদ।'

'জানি না। বুঝতে পারছি, আরও অনেক সময় দিতে হবে, ধৈর্য ধরতে হবে আমাদের।'

'গনজালেসের সঙ্গে দেখা করবে?'

'নাহ্, আজ রাতে আর যাচ্ছি না। নতুন আর কি বলবেন তিনি? আলমাভোর সঙ্গে আমাদের দেখা করতে যাওয়াটা ভাল চোখে দেখবেন না। শত্রুপক্ষও ভেবে বসতে পারেন, যদিও তাঁর ভাবা না ভাবায় কিছুই এসে যায় না আমাদের। তা ছাড়া আলমাভোর সঙ্গে যা যা কথা হলো, সেটা নিয়ে পর্যালোচনা করার, ভাবারও সময় দরকার। একটা কথা পরিষ্কার, জনসন বাদে বাকি তিনজন—গনজালেস, আলমাভো, মার্সেল ব্রিজাক, এঁদের মধ্যে একটা জিনিস কমন, তা হলো রেলিক বা পুরানিদর্শনের ব্যাপারে আগ্রহ। তিনজনেই সংগ্রাহক। তিনজনেই মূর্তিটাকে নিজের সংগ্রহে রাখতে চাইবেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। প্রশ্ন হলো, শুধুই কি ঐতিহাসিক কারণে, না কি রাখার আগ্রহের পেছনে আরও সাংঘাতিক কিছু আছে?'

'প্রচুর কথা বলেছি আজকে,' ওমর বলল, 'মাথাটা আর কাজ করছে না। আজকের মত চিন্তা-ভাবনা বাদ দিয়ে ঘুমাব। কাল সকালে উঠে বরং পর্বতের মধ্যে গিয়ে গরুখোঁজা খুঁজব।'

'যদি ওরা খুঁজতে দেয় আমাদের!'

'আবার সেই একই প্রশ্ন: কারা, কেন আমাদের ঠেকাতে চাইছে?'

'জানি না। তবে এখানে যে আমরা জনপ্রিয় হইনি, হবও না, সেটা বুঝতে পারছি। আমাদের খোঁজাখুঁজিকে নাক গলানো মনে করছে। ভয় দেখিয়ে আমাদের তাড়ানোর চেষ্টা করাটাই তার প্রমাণ।'

'ওসব করে জেদ বাড়াচ্ছে আরকি আমার। শেষ না দেখে যাব না আমি। এর পেছনে কারা আছে, কি কারণ, জানতেই হবে আমাকে। প্লেনটার কি হয়েছে, খুঁজে আমি বার করবই। ভাবছি, অদ্ভুত এই পর্বতের মধ্যে প্লেনটাকে যদি দেখেই ফেলি, যাব কিভাবে ওটার কাছে?'

গেট পেরিয়ে এল ওরা। ট্যাক্সিটা আছে। গেটের কাছে একটা বাক্সের ওপর বসে আছে ইনডিয়ান প্রহরী।

গাড়িটার দিকে দ্রুত এগোল কিশোর আর ওমর। ওদের দেখে গাড়ি স্টার্ট দিল ড্রাইভার।

পেছনের দরজার কাছে আগে পৌঁছল কিশোর।

পেছনে রয়েছে ওমর। হঠাৎ একটা নড়াচড়া চোখে পড়ল তার। রাস্তার উল্টোদিকে, ঝোপের মধ্যে। দুজন লোক বেরিয়ে এল ঝোপ থেকে। ওদের উদ্দেশ্য ভাল না, বুঝতে অসুবিধে হলো না ওমরের। স্পষ্ট দেখার মত আলো নেই, তবে চাঁদের আলোয় একজনের হাতের চকচকে জিনিসটা চিনতে পারল সে।

দরজা খুলে ফেলেছে কিশোর।

'সাবধান!' বলে এক ধাক্কায় তাকে ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়ে ওমরও ঢুকে পড়ল। ড্রাইভারকে বলল, 'জলদি চালাও!' একটানে দড়াম করে লাগিয়ে দিল দরজা।

আগে বাড়ল গাড়ি। পেছনে কারও দৌড়ে আসার শব্দ হলো। গর্জে উঠল আগ্নেয়াস্ত্র। পর পর দুবার। থ্যাক থ্যাক করে গাড়ির পেছনে আঘাত হানল বুলেট।

ঝট করে মাথা নোয়াল ওমর। চেপে নুইয়ে দিল কিশোরকে।

ড্রাইভারের বোধ-বুদ্ধি ভাল। কি করতে হবে বলে দিতে হলো না তাকে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে পড়েছে আরও, অভিজ্ঞতা আছে। লাফ দিয়ে গতি বেড়ে গেল গাড়ির। ক্ষেপা ঘোড়ার মত ছুটতে শুরু করল। আর গুলি হলো না। কিংবা হলেও শোনা গেল না, কোন কিছু আঘাত হানল না বডিতে।

কিশোরকে জিজ্ঞেস করল ওমর, 'লেগেছে নাকি?'

'না,' গম্ভীর স্বরে জবাব দিল কিশোর। 'আমাদের এখানে আসাটা যে কোন একজনের পছন্দ হচ্ছে না, সেটা এখন আরও স্পষ্ট।'

'আমারও তাই মনে হচ্ছে।'

'গুণ্ডা দুটোকে কে লেলিয়ে দিল আমাদের ওপর?' নিজেকেই প্রশ্নটা করল কিশোর।

'জানলে আরও অনেক প্রশ্নের জবাব জেনে যেতাম এতক্ষণে।'

'চেহারা দেখেছেন?'

'দেখেছি, তবে আবার দেখলে চিনতে পারব না। ভালমত দেখার সুযোগই পেলাম কখন?'

আধ মাইল তীব্র গতিতে চালিয়ে এল ড্রাইভার। তারপর গতি কমাল। পাশের কাঁচ নামিয়ে দিয়ে হাসি হাসি গলায় বলল, 'ঝোপের মধ্যে আপনাদের অপেক্ষাই করছিল তাহলে আপনাদের বন্ধুরা, সেনরিটোজ!' নিজের রসিকতায় নিজেই হাহ্ হাহ্ করে হাসল।

'তাই তো মনে হচ্ছে।' ড্রাইভারের কথার জবাবে কিশোরের দিকে কাত হয়ে নিচুস্বরে বলল ওমর, 'আমাদের পেছনে খাটাশ লেগেছে বোঝা যখন গেছে, আরও সাবধান থাকতে হবে। কেন লেগেছে, এখনও কিছু মাথায় ঢুকছে না আমার। তবে কারও পাকা ধানে মই দিতে শুরু করেছি নিশ্চয়, সে-কারণেই আমাদের সরিয়ে দেয়ার চিন্তা-ভাবনা শুরু হয়েছে। করুক, যা পারে। কাল সকালে প্লেন নিয়ে ওই প্লেনটা খুঁজতে বেরোচ্ছি আমি। পারলে ঠেকাক।'

আট

ওপর থেকে দেখলে মনে হয় কাজ অসমাপ্ত রেখে চলে যাওয়া হয়েছে। কিংবা

কেবল শুরু হয়েছে। এলোমেলো ছুঁড়ে ফেলে যেন স্তূপ করে রাখা হয়েছে পাথর। গিরিখাত হাঁ হয়ে আছে মারাত্মক কাটা ক্ষতের মত। আর উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত পর্বত-চূড়ার বরফের স্তূপকে দেখলে মনে হয় আকাটা হীরের বিশাল মালা। এই হলো অ্যান্ডিজ। আমেরিকা মহাদেশের মেরুদণ্ড। প্রায় পাঁচ হাজার মাইল লম্বা, আর একশো মাইল চওড়া পৃথিবীর বিশালতম এই পর্বতমালার উত্তর প্রান্তের পানামা অংশের নাম করডিলেরা আর দক্ষিণে রকি মাউনটেইন।

উঁচু শৈলশিরাগুলোর দুদিকেই ছোট-বড় মালভূমি। মাঝে মাঝে হালকা ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠছে, ঘোষণা করছে আগ্নেয়গিরির আক্ষেপ। পর্বতের উচ্চতা কোথাও তেরো হাজার ফুট, কোথাও বা উঠতে উঠতে হালকা মেঘমালা ভেদ করে উঠে গেছে দুই হাজার ফুট পর্যন্ত।

পর্বতের এ পাশ থেকে ওপাশে যাওয়ার গিরিপথ রয়েছে। পায়ে হেঁটে যাওয়া যায়। কিন্তু পথ এতই বন্ধুর, দুর্গম আর খাড়া, কোনমতে পা পিছলালে হাজার হাজার ফুট নিচে গিয়ে পড়তে হবে। সামনে অস্পষ্ট হয়ে থাকা রাস্তার চেহারা দেখেই ভয় পেয়ে অনেকে পিছিয়ে যায়, আর এগোতে চায় না। এত ওপরে বাতাস অতিরিক্ত হালকা বলে শ্বাস নেয়াও খুব কঠিন। বলা হয়, লৌহ-স্নায়ুর অধিকারী আর সবচেয়ে সুস্থদেহী, দুঃসাহসী মানুষই কেবল প্রচুর যন্ত্রণা সহ্য করতে পারলে এই পথ পাড়ি দিতে পারবে।

পর পর তিনদিন এই বিচিত্র পর্বতমালার ওপর উড়ে বেড়াল ওমর আর কিশোর। সামান্যতম চিহ্ন দেখা গেল না কোথাও হারানো বিমানটার। যতই সময় যাচ্ছে, ততই অসম্ভব মনে হচ্ছে খুঁজে বের করা।

উদ্ধারকারী দল কেন হাল ছেড়ে দিয়েছিল, বোঝা যাচ্ছে। খোঁজ পাওয়া গেলেও যেটা তোলা যাবে না–যেখানে ক্রু বা যাত্রী কারোরই বেঁচে থাকার ক্ষীণতম সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না, সেই ধ্বংসপ্রাপ্ত বিমানের জন্যে আরেকটা ভাল বিমানকে বিপদের মুখে ঠেলে দেয়ার ঝুঁকি নিতে চায়নি কর্তৃপক্ষ।

তিনদিনের মধ্যে দুইবার নিচে জীবনের চিহ্ন দেখতে পেল ওরা। প্রথমবার একটা মালভূমির ওপর একদল ভিকুনিয়া–একজাতের বুনো উট, দ্বিতীয়বার একটা সাদা কনডর। অনেক উঁচুতে বাস করা এই বিশাল শকুনটা প্লেন দেখে কৌতূহলী হয়ে দেখতে এল বোধহয় তার বাড়ি দখল করতে এল কিনা কেউ। কার এত বড় দুঃসাহস। প্লেনের এত কাছে দিয়ে উড়তে লাগল ওটা, ভয় পেয়ে গেল দুজনে। শুনেছে, বাড়ির কাছাকাছি কাউকে দেখলে রেগে যায় এই পাখিগুলো, অকারণেই আক্রমণ করে বসে। সময় থাকতে বিমানের নাক ঘুরিয়ে দ্রুত সরে চলে এল ওমর।

মাটিতে চিহ্ন দেয়া থাকলেও প্রায় সময়ই বোঝা যায় না আর্জেন্টিনার সীমানায় উড়ছে, নাকি চিলির। উড়তে উড়তে আচমকা পশ্চিম দিকে বিমানের নাক ঘুরিয়ে দিল ওমর, 'যথেষ্ট হয়েছে। এ ভাবে সারা জীবন উড়লেও কিছু বের করতে পারব না। সে-রকম সম্ভাবনা থাকলে চিলিয়ান এয়ার ফোর্সই বের করে ফেলত। ওদের চেয়ে আমাদের দক্ষতা বেশি ভাবার কোন কারণ নেই।'

'কি করবেন?'

'বাড়ি ফিরে যাব। গিয়ে বীমা কোম্পানিকে বলব, সরি, ভাই, পারলাম না।'

হেসে ফেলল কিশোর, 'আসল ওমর শরীফ কথা বলছে তো? মরুভূমির বেদুইন, নাকি তার ভূত?'

'মুসা নেই এখানে, অতএব ভূত বিশ্বাস করারও কোন প্রয়োজন নেই।'

'তবে একটা কথা ঠিক,' রসিকতা বাদ দিল কিশোর, 'বেকুবের মত এ ভাবে উড়ে বেড়ানোর কোন মানে হয় না। চলুন, ফিরেই যাই। ভাবনা-চিন্তা করে দেখব, কি করা যায়।'

চুপচাপ পশ্চিমে উড়ে চলল ওমর। অনেক উঁচু দুটো চূড়ার মাঝখান দিয়ে পথ। দুই পাশে পাহাড়ের দেয়াল। পথের নিশানা বলতে একটা আগ্নেয়গিরি। নির্দিষ্ট সময় বিরতি দিয়ে ভলকে ভলকে ধোঁয়া ছাড়ছে রেলের বাষ্পীয় ইঞ্জিনের মত।

কিছুদূর একভাবে উড়ে এসে নিচে নামতে শুরু করল ওমর। দশ হাজার ফুট উচ্চতায় নেমে এল। দম নেয়া সহজ হলো অনেকটা। নিচের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আচমকা চেঁচিয়ে উঠল কিশোর, 'রাখুন তো! নড়াচড়া দেখলাম মনে হলো!'

'কোথায়?'

'ওই যে লম্বা মালভূমিটা, চূড়ার সামান্য নিচে; দেখছেন না? লনের মত লাগছে?'

জায়গাটা চোখে না পড়ার কোন কারণ নেই। আশেপাশে যতদূর চোখ যায়, এ রকম জায়গা ওই একটাই। পর্বতের গা থেকে কেটে বের করা একটা তাকের মত। লম্বালম্বি একপাশ থেকে চূড়া পর্যন্ত উঠে এসেছে পাহাড়ের খাড়া দেয়াল, আরেক পাশ থেকে নেমে গেছে যেটা সেটাও খাড়া, দেখলে ভয় লাগে; কোথায় যে নেমে গেছে দেখা যায় না, হারিয়ে গেছে নীলচে কুয়াশায়। তাকটার বেশির ভাগই সবুজ, উদ্ভিদের লক্ষণ; নিচে নেমে যাওয়া কিনারটা লালচে–মাটি বেরিয়ে থাকার কারণে হতে পারে। এ ধরনের ছোট-বড় তাক আরও অনেক দেখেছে ওরা।

কিশোর বলল, 'কিনারের ওই লাল জায়গাটাতে কে যেন হাত নাড়ছে মনে হচ্ছে না? নড়ছে তো বটেই।'

'কোন ইনডিয়ান হতে পারে। চিনচিলা শিকারে এসেছে।'

'আমার কাছে ইনডিয়ানের মত লাগছে না। ওই যে, আবার হাত নাড়ছে।'

'তাতে কিছু বোঝা যায় না। প্লেন দেখলে অনেকেই হাত নাড়ে, বিশেষ করে লোকালয় থেকে এত দূরে, এ রকম জায়গায়। আমরা খুঁজছি প্লেন, মানুষ নয়। তবু, ঠিক আছে, বলছ যখন আরেকটু নেমেই দেখি।'

নাক নিচু করে তাকটার দিকে উড়ে গেল ওমর। গতি কমিয়ে তাকের সমান্তরালে সাবধানে উড়তে লাগল। পর্বতের ভেতরে ওড়া সাংঘাতিক বিপজ্জনক। বাতাসের কোন স্থিরতা নেই। বহু জায়গায় রয়েছে ঘূর্ণিবায়ু। বাতাসের সেই স্রোতে পড়লে সোজা নিয়ে গিয়ে হয়তো আছড়ে ফেলবে

পর্বতের গায়ে।

'তুমি দেখো, আমি ওড়ার দিকে মনোযোগ দিই,' ওমর বলল। টানটান হয়ে গেছে তার স্নায়ু। এক হাত থ্রটলে, অন্য হাত কন্ট্রোল কলামে। 'দেখা যাচ্ছে কিছু? আর নিচে নামতে পারব না।'

'একজন লোক।'

'কি ধরনের লোক?'

'বলা কঠিন। তবে শ্বেতাঙ্গ বলেই মনে হচ্ছে। বসে পড়েছে এখন। কম্বল কিংবা চাদরের কোনা নাড়াচ্ছে। সাহায্য চাইছে মনে হয়। কি করা যায়?'

'কিছুই না,' জবাব দিতে দেরি করল না ওমর।

'একজন মানুষ বিপদে পড়েছে।'

'বেশি নিচে নামতে গেলে তারচেয়ে বেশি বিপদে পড়ব আমরা।' তাকের একশো ফুট ওপরে নেমে চলে এসেছে বিমান। বাম্প শুরু করেছে। মারাত্মক ঝুঁকি নিয়েছে ওমর।

'কিন্তু কিছু একটা করা দরকার,' কিশোর বলল। 'বেচারাকে দেখে মনে হচ্ছে উঠে দাঁড়াতে পারছে না, এতটাই কাহিল। অসুস্থ হয়ে পড়েছে বোধহয়। কিংবা দুর্ঘটনার শিকার।'

'কি করতে বলো আমাকে?' নীরস গলায় জিজ্ঞেস করল ওমর।

'মাটি তো দেখা যাচ্ছে একেবারেই সমতল। কোন পাথর-টাথরও নেই। ল্যান্ড করলে কেমন হয়?'

'মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি তোমার? না জীবনের ওপর বিতৃষ্ণা জন্মে গেছে? আমি এখনও অনেক দিন বাঁচতে চাই।'

'ওই লোকটা মারাও যেতে পারে।'

'মরে গেলেও পারত এতক্ষণে। ফেলল একটা ঝামেলায়। ওপর থেকে দেখে মাটি সমতল মনে হচ্ছে বটে, কিন্তু চাকা নামাতে গেলেই দেখা যাবে ভয়ানক এবড়ো-খেবড়ো। ভীষণ বিপদে পড়ে যাব কিন্তু। প্লেনটা ধ্বংস হয়ে গেলে ওই লোকটার সঙ্গে সঙ্গে আমরাও মারা যাব তখন।'

নিচের ঠোঁটে ঘন ঘন চিমটি কাটছে কিশোর। হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল চোখ। 'প্যারাস্যুট নিয়ে নামব!'

কিশোরের দিকে না তাকিয়ে আর পারল না ওমর। 'মাথাটা সত্যি সত্যি খারাপ হয়ে গেছে তোমার। তারপর আবার ফিরবে কি করে?'

'নিচে নেমে দেখব প্লেন নামানো যাবে কিনা। যদি যায়, তুলে নেবেন আমাকে।'

'আর যদি না যায়?'

'তাহলে হেঁটে ফিরে যাব।'

'না বুঝে কথা বলছ। এই পর্বতের মধ্যে দিয়ে হেঁটে ফিরবে? পারবে না। পেশাদার গাইড সঙ্গে থাকলেও এক কথা ছিল। গিরিপথের ভেতর দিয়ে যাওয়ার রাস্তা চেনা থাকত তার। কিন্তু তুমি একা এখান থেকে কোনমতেই পারবে না।'

'তবু, ঝুঁকি আমি নেবই। আমি হেঁটে এগোতে থাকব। আপনি মাঝে মাঝে এসে খাবার ফেলে দিয়ে যাবেন।'

'জীবনে অনেক পাগলামি করেছ, কিশোর,' শুকনো স্বরে বলল ওমর। 'তবে এবার যেটা করতে চাইছ, আত্মহত্যা।'

হেসে ফেলল কিশোর, 'পাগলামি আপনিও কম করেননি, সেজন্যেই তো আমাদের সঙ্গে মিশেছেন। ওমরভাই, ভেবে দেখুন, লোকটাকে এই অবস্থায় ফেলে রেখে গেলে ঘুমাতে পারবেন? পারবেন না, বাজি রেখে বলতে পারি আমি। তা ছাড়া এমনও তো হতে পারে, যা খুঁজতে এসেছি আমরা, সেটাই পেয়ে গেছি? ওই লোকটা নিখোঁজ প্লেনটার যাত্রী কিংবা ক্রু-ও হতে পারে।'

'তাহলে প্লেনটাও দেখতে পেতাম।'

'পড়ে গেছে হয়তো ওই কিনার দিয়ে, গিরিখাতের মধ্যে।'

'তা অবশ্য অসম্ভব নয়,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল ওমর। 'বেশ, পাগলামি করতেই যখন এসেছি, কমসম করে আর লাভ কি; একটু বেশি করেই করি।'

'তাহলে প্যারাস্যুট পরে নিইগে। সঙ্গে কিছু খাবারও নেব। কতক্ষণ থাকতে হবে কে জানে। তবে প্লেন নামানোর সুবিধে থাকলে দেরি করা লাগবে না। আপনাকে সঙ্কেত দিলেই নেমে পড়বেন।'

পেছনের কেবিনে চলে এল কিশোর। জরুরী অবস্থার জন্যে দুটো প্যারাস্যুট আছে। একটা পরে নিল। কাঁধে ঝোলাল প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ভরা ভারী একটা ব্যাগ। ফিরে এল ককপিটে। 'নিয়ে যান এবার। যদি দুই হাত দুই পাশে ছড়িয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াই, ভাববেন, নামা যাবে না। বাড়ি ফিরে যাবেন। কাল সকালে খাবার নিয়ে আসবেন। জানি, আজ আর আসতে পারবেন না, সময় নেই। যদি মাথার ওপর তুলে হাত নাড়তে থাকি, কোন রকম দ্বিধা না করে নেমে পড়বেন। আমি রেডি।'

দরজা খুলে তৈরি হয়ে দাঁড়াল কিশোর।

'যা করতে যাচ্ছ, মোটেও পছন্দ হচ্ছে না আমার। তবু…গুড লাক।'

চূড়ার দিকের কিনার ঘেঁষে তাক বরাবর সোজা উড়ে চলল ওমর। খুব বেশি ওপর থেকে ঝাঁপ দিতে হবে না কিশোরকে। স্বাভাবিক জায়গায় হলে কোন কথাই ছিল না। ওমরের ভয় পর্বতের বাতাসকে, যদি বেশি বাঁয়ে উড়িয়ে নিয়ে যায়, খাদটার ওপর চলে যাবে কিশোর, তাকের ওপর নামা আর হবে না তার। নেমে যাবে খাদের মধ্যে। কি আছে নিচে, জানা নেই।

প্রথমবারেই ঝাঁপ দিতে নিষেধ করল ওমর। পুরো তাকটার ওপর দিয়ে উড়ে গিয়ে আবার ফিরে এল শুরুতে। মাঝামাঝি জায়গায় এসে গতি যতটা সম্ভব কমিয়ে ফেলে চিৎকার করে উঠল, 'জাম্প!'

দরজার বাইরে চলে গেল কিশোর। ওর কি হলো না হলো দেখার উপায় নেই ওমরের। তাকাতে গেলেই কোন্‌দিকে সরে যাবে বিমান-দেয়ালে গিয়ে ঘষা লাগবে ডানা, না নাক দিয়ে গুঁতো মারবে, কোন ঠিক নেই।

নিরাপদ জায়গায় সরে এসে নিচে তাকাল। দেখল, নেমে পড়েছে কিশোর। প্যারাস্যুট খুলছে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল ওমর। বিমানের নাক ঘুরিয়ে

আবার যখন ফিরে এল ওখানে, লাল জায়গাটার দিকে হাঁটতে শুরু করেছে কিশোর। মাটি নয়, ফুলের মত লাগছে এখন। পপি হতে পারে। কিংবা পদ্ম। এখানে পর্বতের ওপরে বৃষ্টির পানি জমে থাকা ভেজা মাটিতে স্থলপদ্ম জন্মায় শুনেছে। ফুলের জন্যেই মনে হয় লাল। কাছে গিয়ে পড়ে থাকা মূর্তিটার কাছে হাঁটু গেড়ে বসে পড়তে দেখল কিশোরকে। মিনিটখানেক একভাবে থাকল। পরীক্ষা করল বোধহয়। তারপর প্যারাস্যুট আর ব্যাগটা ওখানে রেখে উঠে প্রায় দৌড়ে চলল তাকের ওপর দিয়ে, দেয়ালের সমান্তরালে।

বিমান নামানো যায় কিনা পরীক্ষা করছে। এক জায়গায় নিচু হয়ে কি তুলতে শুরু করল। সেগুলো এনে ফেলে দিয়ে গেল দেয়ালের ধারে। পাথর-টাথর হবে। জায়গাটা ঘুরে দেখতে পনেরো মিনিটের মত লাগল তার।

ফিরে এসে পকেট থেকে সাদা একটা জিনিস বের করে মাটিতে রাখল। নিশ্চয় রুমাল। ল্যান্ডিঙের জন্যে চিহ্ন। দুই হাত মাথার ওপর তুলে নাড়তে লাগল জোরে জোরে। কয়েকবার নেড়েই দৌড়ে গিয়ে শুকনো ঘাসপাতা জোগাড় করে আগুন ধরিয়ে দিল। ধোঁয়া উড়তে শুরু করল। সেটা দেখে ওমর বুঝতে পারবে বাতাসের গতিবিধি। কোন বিপদ যাতে না হয় সে-জন্যেই এই সতর্কতা।

মুচকি হাসল ওমর: নামিয়েই ছাড়বে ওকে একরোখা ছোঁড়াটা! তবে খুশিও হলো। সে-ও নামতেই চাইছিল। কিশোরকে ওখানে ফেলে রেখে ফিরে যেতে হলে মুহূর্তের জন্যে স্বস্তি পেত না। সবচেয়ে কঠিন কাজটা করার জন্যে তৈরি হলো সে। বিমান ঘুরিয়ে ফিরে গেল আবার তাকের শুরুতে। বেশ খানিকটা দূরে চলে গেল। সেখান থেকে আবার ঘুরে তাক লক্ষ্য করে এগিয়ে আসতে লাগল। ক্রমেই নিচে নামছে। হিসেবের সামান্যতম এদিক ওদিক হলে রক্ষা থাকবে না। কতবড় ঝুঁকি নিতে যাচ্ছে, ভাবছে না। ভাবলে, নামতে পারবে না। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে বসেছে।

তবে নামার পর মনে হলো অহেতুক এত দুর্ভাবনা করেছে। রানওয়েতে ল্যান্ড করার তুলনায় এখানে ল্যান্ড করা কঠিন হলো না তেমন। কোন অসুবিধেই হলো না বলতে গেলে। উঁচু-নিচু মাটিতে দু'এক জায়গায় সামান্য ঝাঁকি লেগেছে। রানওয়ে ছাড়া নিচে সমতল মাটিতে নামতে গেলেও এমন হয়। বাতাসও কোন বিপত্তি ঘটায়নি। শুকনো ঘাসের ওপর দিয়ে চাকা গড়িয়ে যাওয়ার খসখস শব্দ থেমে যেতে ইঞ্জিন বন্ধ করে দিল ওমর। হেলান দিয়ে বসে রইল দীর্ঘ কয়েকটা মুহূর্ত। ভারী দম নিয়ে উত্তেজিত স্নায়ুগুলোকে ঠাণ্ডা করতে লাগল।

দৌড়ে আসছে কিশোর।

ওমরও নামল।

'দেখালেন বটে, ওমরভাই,' হেসে বলল কিশোর। 'আমি জানতাম, আপনি পারবেন।'

'কৃতিত্বটা আসলে তোমার। তবে দয়া করে আর কখনও এ ভাবে আত্মহত্যার লোভ দেখিও না।...তা, কি খবর?' পকেট থেকে সিগারেটের

প্যাকেট বের করল ওমর।

'সেফটি বেল্ট শক্ত করুন। ঝাঁকিয়ে দিতে যাচ্ছি আমি আপনাকে।'

'এ রকম একটা ঝাঁকি খাওয়ানোর পরেও আরও ঝাঁকি?'

'হ্যাঁ। হাত নেড়েছে যে, সে মেয়েমানুষ।'

হাত থেকে আরেকটু হলেই সিগারেটের বাক্স খসে পড়ে যাচ্ছিল ওমরের। 'কি বললে!'

'তরুণী।'

'হেরোইনখোর, লম্বা-চুলো হিপ্পি ছেলেকে মেয়েমানুষ বলে ভুল করোনি তো—ওই যে ছাগলগুলো, যাদের মেয়েমানুষ সেজে থাকার শখ?'

'ওগুলোকে দশ মাইল দূর থেকেও চেনা যায়, গায়ের গন্ধে পাঁঠা পালাবে।'

'হুঁ। ইনডিয়ান মেয়ে নাকি?'

'না।'

'শ্বেতাঙ্গিনী এখানে মরতে এল কিসের জন্যে?'

'জানি না। কথা বলার অবস্থা নেই। বেহুঁশ হয়ে গেছে। অবস্থা দেখে মনে হয় নরক থেকে পালিয়েছে।'

'আধঘণ্টা আগেও তো নড়াচড়া করছিল?'

'মরিয়া হয়ে গেলে অনেক কিছুই করে ফেলে মানুষ।'

'দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বকবক না করে কিছু একটা করা দরকার। চলো।'

'দাঁড়ান না, আরও খবর আছে। সিগারেটটা ফেলেই দেবেন এবার।'

'মুসা আর রবিনকে তো পাচ্ছ না, আমার সঙ্গেই নাটক শুরু করেছ। টেনশনে না রেখে বলে ফেলো না!'

'মহিলার পরনে ইউনিফর্ম।'

'কিসের ইউনিফর্ম?'

'ধূসর রঙের। টিউনিকের বুকে পাখির ছড়ানো ডানা আঁকা, ফোরেজ ক্যাপের কপালেও সোনালি ডানা...'

'পাইলট!'

'না, এয়ার হোস্টেস।'

'এয়ার হোস্টেস!' কিশোরের হাসি হাসি ভঙ্গি দেখে অকস্মাৎ বুঝে ফেলল ওমর, 'মাই গড! নিখোঁজ প্লেনটাতেও একজন এয়ার হোস্টেস ছিল!'

'বুঝতে তাহলে পেরেছেন।'

'প্লেন থেকে মেডিসিন বক্সটা নিয়ে এসো, জলদি!' সিগারেটটা ঠোঁট থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দৌড় দিল ওমর।

নয়

আধঘণ্টা ধরে অক্লান্ত চেষ্টা আর সেবা-যত্নের পর জ্ঞান ফেরানো গেল

মেয়েটির, বলা যায় অর্ধেক-জ্ঞান। চোখ মেলল। ঘোরের মধ্যে রয়েছে। কথা বলতে পারছে না। যদিও বা দু'একটা কথা বলছে, থেমে থেমে, প্রলাপের মত। তাড়াহুড়া করে লাভ হবে না। তাই সে-চেষ্টা করল না ওমর। নিজের মত করেই স্বাভাবিক হোক মেয়েটা। অপেক্ষার এই দীর্ঘ সময়টাতে ধীরে ধীরে পশ্চিমাকাশে সরে সবচেয়ে উঁচু চূড়াটার আড়ালে হারিয়ে গেল সূর্য। দিনের আলোকে মলিন করে দিয়ে এগিয়ে আসতে লাগল গোধূলি।

মেয়েটাকে দেখে ওমরও একমত হয়েছে, 'এয়ার হোস্টেসই ও।' পোশাক দেখে বোঝা যায়। হাড়টাড় ভেঙেছে কিনা ভালমত পরীক্ষা করে দেখেছে। 'না, তেমন মারাত্মক কিছু হয়নি বোধহয়। তাহলে জ্বর থাকত। জ্বর নেই। শক আর প্রচণ্ড শ্রান্তির শিকার। চেহারা দেখে মনে হচ্ছে, অনেক দিন পেটে কিছু পড়ে না। প্রাইমাসটা জ্বালাও। মাংসের সুপ করে দিই। বেচারি! সাংঘাতিক ভোগান্তি গেছে ওর ওপর দিয়ে। বেঁচে যে আছে, এটাই বেশি।'

তবে তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। এয়ার হোস্টেস বাছাই করার সময়ই তাদের বডি ফিটনেস দেখে নেয়া হয়। যাদের রোগটোগ আছে বা জীবনীশক্তি কম, তারা বাদ। মেয়েটা টিকে গেছে সে-জন্যেই। বয়েস বিশ। হালকা-পাতলা। কালো চোখ। কালো চুল। চোখা চিবুক। ফ্যাকাসে হয়ে গেছে মুখের চামড়া। গালে কাটা একটা দাগ, শুকিয়ে এসেছে। দেখে মনে হয়, গালে সাবান কিংবা পানি দেয়া হয়নি বহুকাল। হাতে ময়লা। কাপড় ছেঁড়া, কুঁচকানো। এক পায়ে জুতো নেই। হাঁটু পর্যন্ত কাদা, যেন জলাভূমিতে নেমে কাদার মধ্যে হেঁটেছিল।

কিশোরের দিকে তাকাল ওমর, 'নেমে ভালই করেছ। একা একা কোনমতেই বেরোতে পারত না ও এখান থেকে।'

কথা বলছে আর চামচ দিয়ে অল্প অল্প করে মেয়েটার মুখে সুপ ঢেলে দিচ্ছে ওমর।

'কি করব?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'এ মুহূর্তে আর তো কিছু করার নেই আমাদের।'

'স্যান্টিয়াগোতে নিয়ে গেলে কেমন হয়?'

'এখুনি নড়ানো উচিত হবে না। তাড়াহুড়াও নেই। ও কি বলে আগে শোনা দরকার। প্লেনটা ক্র্যাশ করে থাকলে আশেপাশেই আছে অন্যান্যরা–যদি বেঁচে গিয়ে থাকে। এখান থেকে একবার চলে গেলে আর ফিরে আসতে চাই না। যা করার, একবারেই করে যেতে হবে।'

'তাহলে এখনই বেরোনো দরকার। অন্ধকার তো হয়েই গেছে।'

'সকালে বেরোব।'

'খুব ঠাণ্ডা এখানে।'

'রাতে কেবিনে শোব।'

'যদি আবহাওয়ার উল্টোপাল্টা কিছু হয়ে যায়?'

'সে-রিস্ক নিতে হবে।'

'আপনার ধারণা, ও শীঘ্রি কথা বলতে পারবে?'

'পারবে।'

'যদি ইংরেজি না জানে?'

'স্প্যানিশেই বলব। তবে ইংরেজি জানবে। পৃথিবীর যে কোন দেশের এয়ার হোস্টেসকে অন্তত এই একটি ভাষা জানতেই হয়।' হাত তুলে জঙ্গলের দিকে দেখাল ওমর, 'ও এসেছে সম্ভবত ওদিক থেকে। ওই লাল পদ্মগুলো–কিংবা যে ফুলই হোক, ওগুলোর মধ্যে দিয়ে তার আসার চিহ্ন দেখতে পাবে। কিন্তু কথা হলো, বাকি লোকগুলো কোথায়? প্লেনটাও নিশ্চয় ভেঙেচুরে পড়ে আছে আশেপাশেই কোনখানে। এখান থেকে যাওয়ার আগে, সব প্রশ্নের জবাব জেনে যেতে হবে। মেয়েটা সুস্থ হলে তার মুখ থেকেই শুনতে পারব।'

চোখ পুরোপুরি খুলে গেল মেয়েটার। সচেতনতা দেখা যাচ্ছে এখন। উঠে বসতে গেল। বাধা দিল ওমর, 'না না, উঠো না। নাও, খেয়ে ফেলো এটা,' কাপটা ওর দিকে বাড়িয়ে দিল সে। 'তোমার বয়েস কম। তুমি করেই বললাম। আমি পাইলট। পদবীর দিক থেকেও তোমার বস্।'

ওসব বলার সময় নেই এখন মেয়েটার। মুহূর্তে গিলে ফেলল সুপ।

হাসল ওমর, 'খুব খিদে?'

মলিন হাসি হাসল মেয়েটা। 'খুউব। বহুদিন পেটে খাবার পড়ে না। আপনারা এলেন কিভাবে?'

'প্লেনে করে। হাত নেড়েছ, মনে নেই?'

'এখানে ল্যান্ড করেছেন আপনারা!' অবাক মনে হলো মেয়েটাকে।

'তুমি এলে কিভাবে?'

'প্লেনে।'

'ক্র্যাশ করেছে?'

'হ্যাঁ।'

'তোমার নাম কি?'

'গিজেল। গিজেল মার্কো।'

'প্লেনের এয়ার হোস্টেস ছিলে?'

'হ্যাঁ।'

'প্লেনটা এইট সীটার, বুয়েনস এয়ারেস থেকে স্যান্টিয়াগোতে যাচ্ছিল?'

'হ্যাঁ।'

'ওই প্লেনটা খুঁজছি আমরা, সে-জন্যেই এখানে এসেছি।'

'কাল আপনাদের প্লেনটা দেখে তা-ই মনে হয়েছিল আমার। সে-কারণেই এখানে উঠে এসেছি, যদি ফিরে আসেন, এই আশায়।'

'তোমাদের প্লেনটা কোথায়?'

উঠে বসেছে গিজেল। হাত তুলে দেখাল, 'বনের ভেতর।'

'কদ্দূর?'

'বেশি না। এক কিলোমিটার হবে।'

আরেক কাপ সুপ দিল তাকে কিশোর। সঙ্গে কয়েকটা বিস্কুট। খাওয়ার

সময় দিল। দুর্বলতা দ্রুত কাটিয়ে উঠছে মেয়েটা। ফ্যাকাসে গালে রঙ ফিরছে। বড় এক টুকরো চকলেট বের করে দিল কিশোর। হাসি ফুটল গিজেলের মুখে।

'খেয়ে নাও,' ওমর বলল। 'তারপর আমার কিছু প্রশ্নের জবাব দিতে হবে।'

'বলুন, এখনই,' গিজেল বলল। 'সেরে যাচ্ছে আমার।' মোটামুটি টান ছাড়াই ইংরেজি বলে সে।

'নিশ্চয় জোর করে নামানো হয়েছে তোমাদের প্লেন? কেন? কিভাবে? গোলমালটা কি হয়েছিল?'

'বিস্ফোরণ।'

চোখ বড় হয়ে গেল ওমরের। 'বিস্ফোরণ? কোথায়?'

'কেবিনে হবে, কিংবা লাগেজ কম্পার্টমেন্টে।'

'কিসের কারণে হয়েছিল, বলতে পারবে?'

'না। খুব জোরে শব্দ হলো। মনে হলো, বোমা ফাটল। আমি তখন বই পড়ছিলাম। সীট থেকে ছিটকে পড়লাম। কেবিনের মধ্যে ধোঁয়ায় ভরে গেল।'

'তারপর?'

'মনে হলো প্লেনটার বেশ ক্ষতি হয়েছে। নিয়ন্ত্রণ হারাল পাইলট। ভয় পেয়ে গেলাম। হামাগুড়ি দিয়ে এগোলাম কন্ট্রোলের দিকে। প্লেনটাকে সামলানোর আপ্রাণ চেষ্টা করছেন তখন ক্যাপ্টেন। এই জায়গাটাতেই নামতে চেয়েছিলেন বোধহয় তিনি। কিন্তু বেশি এগোনো হয়ে গিয়েছিল। ওদিকের ঢালে বনের মধ্যে ঢুকে ভেঙেচুরে গেল প্লেনটা।'

'তারপর?'

'সব কেমন এলোমেলো হয়ে গেল। যে যেভাবে পারল লাফ দিয়ে দিয়ে নেমে পড়তে লাগল। আমাকে নামতে সাহায্য করলেন ক্যাপ্টেন। কিন্তু সেকেন্ড অফিসার আটকা পড়লেন। তাঁকে বের করে আনতে অনেক কষ্ট করতে হলো আমাদের। মার্কোকে নিয়েও ঝামেলা হলো। মার্কো নেভিগেটর, রেডিওর সামনে বসা ছিল তখন। মাথায় বাড়ি খেয়ে বেহুঁশ হয়ে গিয়েছিল সে। শেষ পর্যন্ত বেরিয়ে আসতে পারলাম সবাই। আমার গাল কেটে গিয়েছিল, পায়ে প্রচণ্ড ব্যথা। হাঁটতে খুব কষ্ট হচ্ছিল। ভয়ানক অবস্থা।'

'আগুন ধরেনি?'

'না, ঈশ্বর বাঁচিয়েছেন।'

'কপাল ভাল তোমাদের। প্রচুর পেট্রল ছিল নিশ্চয়।'

'তা তো ছিলই। এল লবিটো থেকে বাড়তি পেট্রল নিয়েছিলাম আমরা, পর্বত পেরোনোর জন্যে। কুরিয়ার সার্ভিসের চিঠিপত্রও কিছু ছিল, এল লবিটোতে রেখে আসতে হয়েছে।'

'এল লবিটোটা কোনখানে?'

'আর্জেন্টিনার সীমানায়, পর্বত শুরু হওয়ার আগে যে সমতলভূমিটা আছে, ওখানে।'

'প্লেনের যাত্রীটির কি হলো? মার্সেল ব্রিজাক?'

'আমাদের সঙ্গে ছিলেন না।'
'মানে? তিনিও কি বুয়েনস এয়ারেসে নেমে গিয়েছিলেন নাকি?'
'বুয়েনস এয়ারেসে নয়, এল লবিটোতে।'
'কেন? স্যান্টিয়াগোতে যাওয়ার কথা ছিল না তাঁর?'
'ছিল। কিন্তু অসুস্থ বোধ করছিলেন তিনি। বললেন, নেমে যাবেন। পরের প্লেনে আসবেন।'
'তারমানে সঙ্গে কোন যাত্রীই ছিল না তোমাদের?'
'না, সেনর।'
'যাত্রীদের কোন মালপত্র ছিল?'
'আমি বলতে পারব না। মালপত্র দেখা আমার বিষয় নয়। তবে চিঠির ব্যাগ আর কিছু ছোট প্যাকেট দেখেছি।'
'কি হয়েছে ওগুলো?'
'আছে হয়তো এখনও প্লেনেই। দেখতে যাইনি আমি। কেউই যায়নি বোধহয়। সবাই ভীষণ মুষড়ে পড়েছে। ক্যাপ্টেন মারসারের মত লোকও মন খারাপ করে ছিলেন। খুব ভাল পাইলট তিনি। এটাই তাঁর প্রথম সিরিয়াস অ্যাক্সিডেন্ট। ক্যারিয়ার শেষ হয়ে গেছে বলে বলে বার বার আক্ষেপ করছিলেন।'
'যাই হোক, তোমরা বেরোলে; তারপর?'
'সবাই মিলে বসে আলোচনা করতে লাগলাম। প্লেনটা শেষ, ওড়ার অবস্থা নেই আর। বোমার শব্দ শুনেছি যখন বললাম, ক্যাপ্টেন ধারণা করলেন, বোমা রেখে গিয়েছিল কেউ কেবিনে। এ ছাড়া আর হবেই বা কি? ইঞ্জিনে কোন গণ্ডগোল ছিল না। এমন হঠাৎ করে ঘটল ঘটনাটা, রেডিওতে সিগন্যাল পাঠানোরও সময় পায়নি মার্কো। জানতাম, আমাদের খুঁজতে সার্চ পার্টি আসবেই। কিন্তু ঘন জঙ্গলের মধ্যে আমাদের দেখতে পাবে না। তিন দিন অপেক্ষা করলাম। প্লেনের শব্দ শুনতে পেয়েছি, কিন্তু ওরা আমাদের দেখল না। আস্তে আস্তে খাবারও শেষ হয়ে গেল। ক্যাপ্টেন ঠিক করলেন, আর বসে থাকা যায় না; সেকেন্ড অফিসার ইবারাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়বেন। এ ছাড়া আর কিছু করারও ছিল না তাঁদের। পায়ের অবস্থা ভাল ছিল না বলে ওদের সঙ্গে যেতে পারলাম না আমি। তা ছাড়া মার্কোর কাছেও কারও থাকার দরকার ছিল, ও তখন অসুস্থ, মাথার জখমটা ভোগাচ্ছে। ক্যাপ্টেন আর ইবারা চলে গেলেন। আর কোন খোঁজ পেলাম না তাঁদের। সাহায্যও এল না।'
'ওরা স্যান্টিয়াগোতে পৌঁছায়নি,' ওমর বলল। 'মার্কো কোথায়?'
'জানি না। কয়েকদিন আগে খাবারের সন্ধানে যাচ্ছে বলে সেই যে বেরিয়েছে, আর ফেরেনি। খুব বেশি অসুস্থ হয়ে পড়েছিল হয়তো, মাথাও খারাপ হয়ে গিয়ে থাকতে পারে। বনের মধ্যে ঢুকতে দেখলাম তাকে, ব্যস, সে-ই শেষ।'
'তারপর থেকেই তুমি একা?'
'হ্যাঁ।'

'খাবার ছাড়া?'

'হ্যাঁ। আমার পা অনেকটা ভাল হয়েছে, তবে এখনও ব্যথা করে। মুখের কাটাটাও সেরেছে। তারপর দিন দুয়েক আগে যখন ভাবছি এখানেই শেষ হয়ে যেতে হবে আমাকে, ঠিক তখনই একটা ঘটনা ঘটল।'

'কি?'

'কয়েকজন ইনডিয়ান এল। ভাবলাম, শিকারি। তাদের সাথে কোন মেয়েমানুষ ছিল না। কোনখান থেকে এল ওরা বুঝলাম না। কোনদিক থেকে, দেখতে পাইনি। হঠাৎ করে যেন মাটি ফুঁড়ে উদয় হলো। শহুরে লোক নয়। পর্বতের বুনো মানুষ। আমার কোন ক্ষতি করল না। তাকালই না।'

'খাবার-টাবার কিছু দিয়েছে?'

'না। খুব উত্তেজিত হয়ে কথা বলছিল ওরা, নিজেদের মধ্যে, আমার সঙ্গে নয়। কি বলল কিছুই বুঝলাম না। প্লেন থেকে যতটা পারল জিনিসপত্র বের করে নিয়ে চলে গেল।'

'লাগেজ কম্পার্টমেন্ট থেকে?'

'শুধু লাগেজ কম্পার্টমেন্ট না, যেখান থেকে যা নিতে পেরেছে, সব নিয়ে গেছে। এমনকি প্লেনের গা থেকেও ভেঙে নিয়ে গেছে অনেক কিছু। তারপর আর দেখিনি ওদের। আজকে আপনাদের প্লেনের আওয়াজ শুনে বেরিয়ে এসেছি, যদি কোনভাবে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারি। বনের ভেতর থেকে কোনমতেই সম্ভব হতো না। দেখাই যায় না।'

'একটা কথা, গিজেল,' কিশোর বলল, 'আপনার কি একবারও মনে হয়নি, আপনাদের প্লেনটাকে বোমা ফাটিয়ে ধ্বংস করে দেবে কেন কেউ, কি কারণ থাকতে পারে?'

'হয়েছে, বুঝতে পারিনি,' মাথা নাড়ল গিজেল, 'কোন দামী জিনিস ছিল না প্লেনে। আমার কাছে পুরো ব্যাপারটাই রহস্যময়।'

'হুঁ,' চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা দোলাল কিশোর। ওমরের দিকে তাকাল সে, 'আজ আর কিছু করা যাবে না, ওমরভাই।' অন্ধকার হয়ে এসেছে আকাশ। 'আজকের রাতটা এখানেই কাটাতে হবে।'

গিজেলকে বলল ওমর, 'আরও একটা রাত তোমাকে থাকতে হবে এখানে। তবে খাবার পাবে, প্লেনের কেবিনে যতটা সম্ভব আরামে থাকার ব্যবস্থা করে দেব। সকাল বেলা ভাঙা প্লেনটার কাছে নিয়ে যাবে আমাদেরকে। বলা যায় না, যারা গেছে তাদের কেউ ফিরেও আসতে পারে। তবে কেউ না এলেও তোমাকে স্যান্টিয়াগোতে পৌঁছে দেয়া হবে।'

'ধন্যবাদ, সেনর। আপনাদের নামটাই তো জানলাম না।'

'আমার নাম ওমর শরীফ।...ও কিশোর পাশা।'

গিজেলকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করল দুজনে। খোঁড়াতে খোঁড়াতে প্লেনের দিকে এগোল গিজেল। প্রথমেই প্লেনের ছোট্ট টয়লেটে গিয়ে ঢুকল সে, হাত-মুখ ধুয়ে নিজেকে একটু সাফ-সুতরো করার জন্যে। কিশোরকে নিয়ে ওমর চলল রান্নাঘরে: তিনজনের জন্যেই খাবার দরকার। বাইরে

অন্ধকার, নীরব, ঠাণ্ডা রাত যেন কালো, ভারী চাদরের মত ঝপ করে নেমে এল আকাশ থেকে।

মাংসের টিন কাটতে কাটতে মুখ তুলে ওমরের দিকে তাকাল কিশোর, 'কি বুঝলেন, ওমরভাই?'

'কিচ্ছু না। বোমা মেরে প্লেন ধ্বংস করতে যাবে কেন কেউ? কোন যুক্তিই খুঁজে পাচ্ছি না।'

'আপনার কি সত্যিই মনে হয় প্লেনের মধ্যে বোমা রেখেছিল কেউ?'

'তা ছাড়া আর কি? প্লেনের মধ্যে আর এমন কি আছে যে বোমার মত শব্দ করে ফাটবে? কিন্তু কি উদ্দেশ্যে ফাটানো হলো?'

'এ ভাবে চিন্তা করা যাক,' কিশোর বলল, 'মাত্র তিনজন লোক জানেন মূর্তিটার কথা: ডন গনজালেস, মার্সেল ব্রিজাক আর হোসে আলমাডো। একজন একজন করে ধরি। প্রথমে, ডন গনজালেস। এত টাকা খরচ করে মূর্তি কিনে বোমা মেরে সেটাকে উড়িয়ে দিতে কেন চাইবেন তিনি?'

মাখনের কৌটা খুলছে ওমর, 'কি করে বলব? দেয়ার তো কথা নয়।'

'তারপর, মার্সেল ব্রিজাক। মূর্তিটা গনজালেসের বাড়ি পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব নিলেন। গনজালেস তাঁকে বন্ধু হিসেবে জানেন, বিশ্বাস করেন। কিন্তু ব্রিজাক শেষ পর্যন্ত প্লেনে থাকলেন না, এল লবিটোতে তেল নিতে নামলে তিনি নেমে গেলেন। নিশ্চয় মূর্তির প্যাকেটটা নিয়েই নেমেছিলেন। যা-ই করেন না কেন, তিনি বোমা মেরে প্লেনটাকে উড়িয়ে দিয়েছেন বললে তার সপক্ষে কোন যুক্তি নেই। আলমাডোর বেলায়ও একই কথা। তিনি নেমে গেছেন বুয়েনস এয়ারেসে। অসুস্থ ভাইকে দেখতে। প্লেনটাকে কেন স্যাবটাজ করে নষ্ট করতে যাবেন তিনি? মূর্তিটা চান তিনি, কিন্তু সেটা পাওয়ার জন্যে প্লেন ধ্বংস করার তো কোন প্রয়োজন পড়ে না। নাহ্, অন্য কোন যুক্তি আছে।'

'একটা দিকে বোধহয় খেয়াল দিচ্ছি না আমরা,' টিন থেকে চামচ দিয়ে মাখন তুলে সসপ্যানে ফেলতে ফেলতে বলল ওমর। 'ওই অভিশপ্ত দেবতা আতু-হুয়াই যত নষ্টের মূল। ওটার কারণেই ধ্বংস হয়েছে প্লেনটা।'

'আপনি কি অভিশাপের কথা বলছেন? মূর্তিটা নিশ্চয় বোমার রূপ ধরে প্লেন ধ্বংস করেনি, এ রকম অবাস্তব কথা বিশ্বাস করা যায় না। তা ছাড়া বোমা ফাটার সময় ওটা প্লেনে থাকার কথা নয়, কারণ এল লবিটোতেই নেমে গেছেন মার্সেল ব্রিজাক,' মাংসের টিনটা ওমরের দিকে বাড়িয়ে দিল কিশোর। 'গিজেল বলেছে, প্লেনে মূল্যবান কিছু ছিল না। তারমানে ধরে নেয়া যেতে পারে, মূর্তিটার জন্যে বোমা ফাটানো হয়নি। অন্য কোন কারণ আছে। যে শয়তানটা এর জন্যে দায়ী, সে হয়তো জানেই না মূর্তিটার কথা।...থাক, এখন আর ও নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। কাল প্লেনটা দেখার পর স্পষ্ট হবে। মূল্যবান সূত্রও পেয়ে যেতে পারি।'

'হ্যাঁ,' টিন থেকে মাংস বের করে প্যানের গরম মাখনের ওপর ছেড়ে দিল ওমর। 'মূর্তিটা যদি লাগেজ কম্পার্টমেন্টে পাওয়াই যায়, ঝামেলা শেষ। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওটা তার মালিকের হাতে তুলে দিয়ে বাড়ি রওনা হব।'

'কিন্তু আমার মনে হয় না এত তাড়াতাড়ি মুক্তি পাব আমরা,' কিশোর বলল। 'প্লেনে মূর্তিটা পাওয়া গেলে বিস্ময়ের সীমা থাকবে না আমার।'

'তোমার ধারণা ওটা নেই ওখানে?'

'থাকার কোন কারণই দেখতে পাচ্ছি না। শেষমেষ এসেছিল ইনডিয়ানরা। প্লেনের বডি থেকে জিনিসপত্র খুলে নিয়ে যেতে পারে যারা, তারা কি আর মূর্তিটা রেখেছে নাকি? তবে, আমার বিশ্বাস, প্লেনটাতে বোমা ফাটার আগে পথেই কোনখান থেকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে মূর্তিটা।'

'আবার এটা নিয়ে মাথা ঘামানো শুরু করলাম,' চামচ দিয়ে প্যানের মাংসগুলো নাড়তে লাগল ওমর। 'খাওয়া দরকার। রান্নাটা হয়ে গেলেই বসে যাব।...গিজেল এখনও বেরোচ্ছে না কেন?...পায়ের অবস্থা কতটা খারাপ?'

'ভোগাবে। হাঁটার ভঙ্গি দেখে মনে হলো পায়ের পেশী ছিঁড়ে গেছে। সময় দিলে আপনাআপনি ঠিক হয়ে যাবে। তবে প্রচুর ব্যথা সহ্য করতে হবে, খোঁড়াতে হবে। আরও কয়েক সপ্তাহ লেগে যাবে। একটা ইলাস্টিক ব্যান্ডেজ বেঁধে দেব, তাতে কাজ হবে। এ ছাড়া আর কিছু করার নেই আমাদের।'

'নাও, বাসন-পেয়ালা আর চামচ বের করো। আমার হয়ে গেছে।'

দশ

আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটল না। ভোর হলো। পর্বতের চূড়ার ঠাণ্ডা আর ধূসর কুয়াশায় ঢাকা ভোর। তবে সূর্য ওঠার পর দ্রুত কেটে গেল কুয়াশা। আকাশটাকে মনে হচ্ছে বিশাল একটা নীল গম্বুজের মত। মন থেকে ভার কেটে গেল ওদের। পর্বতের ওপরে আবহাওয়া খারাপ হওয়া মানে সাংঘাতিক অবস্থা। বিপজ্জনক। ভরপেট খাবার খেয়ে, রাতে ভালমত ঘুমিয়ে তাজা লাগছে গিজেলকে। বয়েস কম হওয়াতে সেরে উঠতে সময় লাগছে না মোটেও। তবে খোঁড়ানো বন্ধ করা যাচ্ছে না। একটা ডাল কেটে ভর দিয়ে চলার জন্যে লাঠি বানিয়ে দিল ওমর।

জরুরী অবস্থায় ব্যবহারের জন্যে প্রয়োজনীয় খাবার আর জিনিসপত্র রাখে ওরা মারলিনে। সেগুলো কাজে লাগাচ্ছে এখন। পরিজ ওটের সঙ্গে কনডেন্সড মিল্ক আর চিনি মিশিয়ে নাস্তা সারল। কি করা যায়, কফি খেতে খেতে সেটা নিয়ে আলোচনা চলল।

গিজেল জিজ্ঞেস করল, 'প্লেনটা দেখতে চাচ্ছেন কেন? ভেঙেচুরে ওটার তো আর কিছু নেই। স্যালভিজ পার্টি নিতে এলে কিছুই পাবে না।'

'ভেতরে একটা জিনিস আছে কিনা দেখতে চাই,' ওমর বলল। 'হয়তো নেই, তবু শিওর হওয়ার জন্যে দেখব। আচ্ছা, গিজেল, এই এলাকার একটা ইনডিয়ান দেবতার কথা কি কিছু জানো তুমি?'

'না, সেনর। তবে এটুকু জানি, ওদের নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি মোটেও উচিত না,

আলোচনা করাও ঠিক না।'

'কে বলেছে এ কথা?'

'আমার মা। এখানকার সব শিশুদেরই জানিয়ে দেয়া হয় এটা। ইনডিয়ানরা শান্তিপ্রিয় জাতি, কেবল উৎসবের দিনগুলোতে ছাড়া। সেদিন মদ খেয়ে এতই মাতাল হয়ে যায়, কি করে নিজেরাই জানে না। ওই সময় যেখানে জমায়েত হয় ওরা, সেখান থেকে দূরে থাকাই ভাল।'

'কোন পুরানো দেবতার নাম জানো?'

'না।'

'তারমানে আতু-হুয়ার নাম শোনোনি তুমি?'

'না। কেন?'

'কিছুদিন আগে আমেরিকায় পাওয়া গেছে ওটাকে। তোমার প্লেনে করেই এসেছে ওটা।'

মুচকি হাসল গিজেল। 'তারমানে বিশ্বাস করতে বলছেন, ওটার অভিশাপেই প্লেনটা ধ্বংস হয়েছে?'

'না, তা বলছি না।'

'আপনি বিশ্বাস করেন?'

প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল ওমর। 'আমাদের যাওয়ার সময় হয়েছে,' উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল সে। 'যত তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করে আসব, ফিরে যেতে পারব। কোম্পানিকে জানাব। তারপর তারা তাদের ভাঙা বিমান নিয়ে যা ইচ্ছে করুকগে।' গিজেলের দিকে তাকাল, 'আমাদের সঙ্গে আসার দরকার নেই তোমার। এখানেই বসে থাকো। তোমার পায়ের বিশ্রাম দরকার। বেশি নড়াচড়া করলে ক্ষতি হবে। প্লেনটা কোনখানে পড়েছে, কোনদিক দিয়ে যেতে হবে, ভালমত বুঝিয়ে দাও; তাহলেই চলবে।'

কিন্তু বসে থাকতে চাইল না গিজেল। সঙ্গে যাওয়ার জন্যে গোঁ ধরল। বলল, হাঁটতে পারবে। তা ছাড়া তার যুক্তিতে বিমানটা কোনখানে পড়েছে, দেখানো যত সহজ, বলে বোঝানো ততটাই কঠিন।

একজন খোঁড়া মানুষকে সঙ্গে নেয়ার ঝামেলাটা বুঝতে পারছে ওমর, কিন্তু গিজেল যেহেতু একা থাকতে চাইছেই না, তাকে বোঝানোর চেষ্টা করল না আর। বলল, 'বেশ, এসো।...ওই দেখো, পশ্চিম আকাশে মেঘ দেখা যাচ্ছে। এখানকার আবহাওয়াকে একবিন্দু বিশ্বাস নেই। তাড়াতাড়ি কাজ সেরে কেটে পড়া দরকার।'

রওনা হলো ওরা। খোঁড়াতে খোঁড়াতে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল গিজেল। লাল পদ্মগুলো যেখানে জন্মে আছে, তার পর থেকেই শুরু হয়েছে বন। ঘন, সেঁতসেঁতে বন। মাটি ভেজা, পিচ্ছিল। আরও জঘন্য করে রেখেছে পচা লতাপাতা। নিচে নেমে গেছে পথ, সরাসরি নয়, কোনাকুনি। জন্তু-জানোয়ার চলার পথ নিশ্চয়। নিচে হাঁ করে রয়েছে বিশাল খাদ। ঢাল মাঝে মাঝে অনেক বেশি খাড়া হয়ে যাচ্ছে। ওসব জায়গায় শুধু সাহায্য করতে হচ্ছে গিজেলকে, এ ছাড়া লাঠিতে ভর দিয়ে সে নিজেই চলতে পারছে। ভাবতে অবাক লাগছে

কিশোরের, নিজে নিজে ওপরের ওই মালভূমিটাতে কি করে উঠেছিল গিজেল! মরিয়া হয়ে প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে মানুষ কত অসাধ্যকেই না সাধন করে!

আধঘণ্টা ধরে কখনও প্রায় উবু হয়ে নিচের দিকে ঝুঁকে, কখনও পিছলে পড়তে পড়তে নামল ওরা গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ঘন বনের ভেতর দিয়ে। বড় বড় চিরসবুজ পাতা গাছগুলোর। বনের মধ্যে সর্বক্ষণ তৈরি করে রেখেছে সবুজ গোধূলি। আবছা এই আলো দেখে মনেই হয় না বাইরে এখন কড়া রোদ। গিজেল জানাল, প্রায় পৌঁছে গেছে। বুদ্ধি করে ওপরে ওঠার সময় চিহ্ন দিয়ে দিয়ে গিয়েছিল। ফিরে আসতে অসুবিধে হলো না আর এখন।

আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই বিমানটার কাছে পৌঁছে গেল ওরা। প্রায় একশো গজ জায়গার ঝোপঝাড় ছিন্নভিন্ন হয়ে একটা আধা-সুড়ঙ্গ মত তৈরি হয়ে আছে। নামার পর ওটুকু জায়গা দৌড়ে গিয়েছিল বিমানটা।

মন খারাপ করা দৃশ্য। মানুষ নানা রকম যানবাহন তৈরি করেছে, জলে-ডাঙায় অহরহ দুর্ঘটনায় ধ্বংসও হচ্ছে সে-সব। তবে ধ্বংস হওয়ার পর সবচেয়ে বিকৃত আর অচেনা হয়ে যায় বোধহয় বিমান। এমনিতেই হালকা বডি, মাটিতে ধসে পড়লে প্রায় পুরো শরীরটাই ভেঙে যায়। গাছপালার মধ্যে পড়লে তো কথাই নেই, যেমন এই বিমানটার হয়েছে। ফিউজিলাজটা শুধু মোটামোটি ঠিক আছে। নামার পর গাছে লেগে প্রথমেই ছিঁড়ে খসে গেছে ডানা দুটো। শরীরের অনেকখানি চামড়াও চলে গেছে, বেরিয়ে আছে পাঁজরাগুলো। চাকার কাঠামো বেঁকে গেছে। কেবিনের পেট ফেড়ে বেরিয়ে পড়েছে সীটগুলো, কোনটা আস্ত নেই। ছেঁড়াখোঁড়া গদি, চামড়া, ধাতব পাইপ যেন জট পাকিয়ে আছে।

আশেপাশের নীরব পরিবেশের মতই নীরব হয়ে পড়ে আছে বিমানের ধ্বংসাবশেষ। ওমর বলেছিল বটে, যারা সাহায্য আনতে গেছে, তারা ফিরেছে কিনা দেখা দরকার–কিন্তু ওদের কেউ ফিরে এলেই বরং অবাক হত সে। কাউকে খোঁজার চেষ্টা করল না সে, ডেকে জিজ্ঞেস করল না কাছাকাছি আছে নাকি; জানে, অহেতুক সময় নষ্ট করবে, কোন লাভ হবে না।

গম্ভীর হয়ে চারপাশে তাকিয়ে দেখতে দেখতে আনমনেই বলল সে, 'বেঁচে যারা বেরোতে পেরেছে, তাদের ভাগ্যবান বলতে হবে।' গিজেলের দিকে ফিরল, 'গাছে ডানা লেগে যাওয়াতেই বেঁচে গেছ তোমরা। ক্র্যাশ করার পর প্রথম ধাক্কাটা গেছে ডানার ওপর দিয়ে। তুমি এখানে বসে বিশ্রাম করো, আমরা গিয়ে কেবিনে দেখে আসি।...কিশোর, এসো।'

কয়েক মিনিটেই বুঝে গেল, কোন কিছুই অক্ষত নেই। কেবিনে কোন জিনিসই নেই, নিয়ে যাওয়া হয়েছে। লাগেজ কম্পার্টমেন্টের এক মাথা থেকে আরেক মাথা প্রায় ছিঁড়ে খুলে ফেলেছে। মেল-ব্যাগটা আছে, ছেঁড়া, চিঠিপত্র সব ছড়ানো। পার্সেলের মোড়কগুলো ছিঁড়ে পড়ে আছে, ভেতরের জিনিস নেই।

কিশোরের দিকে তাকাল ওমর, 'ইনডিয়ানদের কাজ। আতু-হুয়া যদি এসেও থাকে এ পর্যন্ত, ওদের হাতে পড়েছে, ফিরে পাওয়ার আর কোন সম্ভাবনাই নেই।'

কতগুলো খাম পড়ে আছে, কিনারটা পোড়া। কিশোর বলল, 'এগুলোই প্রমাণ করে, কোন ধরনের বিস্ফোরণ ঘটেছিল।'

'তা তো গিজেলের কথা শুনেই বোঝা গেছে। আমি আর ওই সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি না।'

ককপিটে দেখল ওরা। আগ্রহ বা কৌতূহল জাগানোর মত কোন কিছু চোখে পড়ল না। নেইই তেমন কিছু। যন্ত্রপাতিগুলোও খুলে নিয়ে যাওয়ার প্রতিযোগিতা চলেছিল যেন এখানে।

তবে মেইন ট্যাংকটা অক্ষত দেখে অবাক হলো ওমর। 'ক্রু'রা বেঁচে গেছে এ কারণেই। এটাতে ফুটো হলে আর রক্ষা ছিল না। আগুন লেগে যেত। অন্য রকম হত এ কাহিনী। 'আর কিছু দেখার আছে বলে মনে হয় না,' নিরাশ ভঙ্গিতে বলল সে। 'আতু-হুয়াকে পাব এখানে, এ আশা অবশ্য করিওনি। গনজালেসকে গিয়ে বলতে পারব, প্লেনটা দেখে এসেছি আমরা। মূর্তিটা পাইনি। এরপর তিনি যা করেন, করুন। বীমা কোম্পানিকেও বলতে পারব।...চলো, দেরি করে আর লাভ নেই। সময়মত ওপরে যেতে না পারলে আজও ফিরতে পারব না।'

ওদের নেমে আসতে দেখে গিজেল জিজ্ঞেস করল, 'কিছু পেলেন?'

'না,' মাথা নাড়ল ওমর। 'তোমার কথাই ঠিক, বোমা ফেটেছিল। চলো। তাড়াহুড়ার দরকার নেই। পায়ের ওপর বেশি জোর না দিয়ে আস্তে আস্তেই হাঁটো।'

গিজেলকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করল ওরা।

থমকে গেল গিজেল। কান পাতল। হাত তুলে বলল, 'শুনতে পাচ্ছেন? ওদিকে!'

অন্য চিন্তায় ছিল বলেই বোধহয় এতক্ষণ খেয়াল করেনি ওমর আর কিশোর। বিচিত্র, মিশ্র একটা শব্দ। সুর-কীর্তন করা হচ্ছে যেন। তালে তালে করতালি। দিড়িম দিড়িম ঢাকের শব্দ। মাঝে মাঝে চিৎকার। খাতের নিচ থেকে আসছে মনে হলো।

ভ্রূকুটি করল ওমর। 'ইনডিয়ানরা ছাড়া আর কেউ না।'

বাকি দুজনও একমত।

গিজেলের দিকে তাকাল ওমর, 'আগের বার আসার সময় এ রকমই হই-চই করেছিল নাকি?'

'না। চুপচাপ এসেছিল। সামনে এসে দাঁড়ানোর আগে দেখতেই পাইনি। সে-জন্যেই মনে করেছিলাম শিকারী দল।'

'কোন্‌দিক থেকে এসেছিল?'

'জানি না। তবে ওই দিকে গিয়েছিল। খাদের ওই কিনারাটা বেয়ে, নিচের দিকে।'

'হয়তো নিচের উপত্যকাতেই কোথাও ওদের গাঁ।'

'শব্দ শুনে তো মনে হচ্ছে,' কিশোর বলল, 'এদিকেই আসছে ওরা এখন।'

'তারমানে ফিরে আসছে,' গিজেল বলল।

'তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই,' ওমর বলল। 'বাকি যা আছে, তা-ও খুলে নিয়ে যাওয়ার জন্যে আসছে। তাতে আমাদের ঘাবড়াবার কিছু নেই, যদি না...'

'যদি না, কী?' ভুরু নাচাল কিশোর।

'যদি না কোন কিছু উত্তেজিত করে তোলে তাদের। তাহলে ব্যাপারটা যে কোন দিকে গড়াবে কে জানে! উত্তেজিত হলে বা রেগে গেলে ইনডিয়ানদের মাথার ঠিক থাকে না। ঝুঁকি নিয়ে বসে না থেকে লুকিয়ে পড়া উচিত।...রাখো, এক মিনিট দাঁড়াও তো। দেখি ওদের দেখা যায় নাকি? হয়তো শুধু শুধুই ভাবছি আমরা, ওরা এদিকে আসছেই না। তাড়াহুড়া করে অহেতুক গিজেলের পায়ের ব্যথা বাড়াব।...কিশোর, তুমি ওকে নিয়ে রওনা হয়ে যাও। আমি দাঁড়াই। দেখি, ওরা কি করে?'

গিজেলের একটা হাত ধরে রেখে তাকে হাঁটতে সাহায্য করল কিশোর।

কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে ওদের যেতে দেখল ওমর, তারপর এগোল খাদের কিনারের দিকে। উদ্বিগ্ন হয়েছে বটে, তবে শঙ্কিত হয়নি।

এগিয়ে আসছে বুনো কীর্তন।

সেঁতসেঁতে পিচ্ছিল পথে চলতে গিয়ে কয়েক মিনিটেই বুঝে গেল কিশোর, নামার চেয়ে ওঠা কঠিন। তবু অগ্রগতি ভালই বলতে হবে। শুকনো একটা জায়গায় এসে গিজেলের অবস্থা দেখে জিরিয়ে নেয়ার সিদ্ধান্ত নিল কিশোর। অকারণে তাড়াহুড়ো করে শরীরটাকে কাহিল করে ফেলার কোন যুক্তি নেই। গিজেলের পা ভাল থাকলেও নাহয় এক কথা ছিল। মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে, ব্যথা বেড়েছে, যদিও স্বীকার করছে না। পায়ের পেশী ছিঁড়ে যাওয়ার যন্ত্রণা যে কি সাংঘাতিক যার না ছিঁড়েছে, বুঝবে না। কিশোর বলার সঙ্গে সঙ্গে তা-ই বসে পড়ল সে।

বসে রইল দুজনে। কথা বলছে না। বলার কিছু নেই। দুজনেই তাকিয়ে আছে যেদিক থেকে এসেছে সেদিকে। ওমর আসছে কিনা দেখছে।

দশ কি পনেরো মিনিট অপেক্ষা করার পর যখন উঠতে যাবে, ওকে আসতে দেখল ওরা। আসার ভঙ্গি দেখেই বুঝে ফেলল, খবর ভাল না।

হট্টগোলের শব্দ এগিয়ে আসছে।

'ওঠো, ওঠো,' কাছে এসে বলল ওমর। 'এতদূরে ওরা আসবে কিনা বুঝতে পারছি না। তবে প্লেনটাই যে ওদের লক্ষ্য, তাতে কোন সন্দেহ নেই। স্বস্তি পাচ্ছি না। কি যে করবে ওরা, বোঝা মুশকিল।'

'ওদের দেখেছেন?' জানতে চাইল কিশোর।

'হ্যাঁ।'

'মাথায় ভূত চাপল নাকি ওদের!' গিজেল বলল। 'এ রকম তো করে না!'

'কারণ নিশ্চয় একটা আছে,' ওমর বলল। 'সারা মুখে রঙ মাখা, চুলে পালক, ফিতা বাঁধা। কোন ধরনের অনুষ্ঠান হবে এটা। আগে আগে আসছে একটা লোক, ওঝা মনে হলো। তার হাতে লাঠির মাথায়...' হই-চইয়ের দিকে

কান পাতল সে। কতটা এগিয়েছে বোঝার চেষ্টা করল।

'লাঠির মাথায় কি?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'বুঝতে পারছ না?'

'না।'

'আতু-হুয়া।'

'আতু-হুয়া!' আঁতকে উঠল কিশোর, 'খেপে গেছে এ কারণেই!'

'মূর্তিটা কখনও দেখিনি বটে, কিন্তু দেখতে কেমন শুনে শুনেই একটা ধারণা হয়ে গেছে। আতু-হুয়া ছাড়া আর কিছু না ওটা। ...প্লেনে রেখেই নেমে গিয়েছিল ব্রিজাক।'

'তাহলে পেয়েই গেল ওরা!' চিন্তিত ভঙ্গিতে নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর।

'যে প্যাকেটগুলো খুলেছিল ইনডিয়ানরা,' ওমর বলল, 'তার মধ্যেই কোনটাতে ছিল।'

'দেবতাকে ফিরে পেল অবশেষে!' ওমরের কথায় পুরোপুরি কান নেই কিশোরের।

'হ্যাঁ। পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শুরু করে দিয়েছে...এই ভয়টাই পাচ্ছিল কিছু কিছু লোক।'

'কিন্তু প্লেনের কাছে ফিরে আসছে কেন আবার?'

'কি করে বলব? ইনডিয়ানদের মনে যে কি আছে ওরাই জানে। কথা বলে সময় নষ্ট না করে দৌড়ে গিয়ে দুটো পিস্তল বের করো। গুলি ভরে এনো। বলা যায় না...। আমি গিজেলকে নিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আসছি তোমার পেছনে।'

কথা বাড়াল না কিশোর। ছুটল। উঠতে শুরু করল ঢাল বেয়ে।

এগারো

গিজেলকে নিয়ে বনের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল ওমর। মালভূমিটায় উঠল। দুই হাতে দুটো পিস্তল নিয়ে দৌড়ে আসছে কিশোর।

কিন্তু কয়েকটা সেকেন্ড ওর দিকে নজর দিতে পারল না ওমর। গাছপালার আড়াল থেকে বেরিয়ে আকাশের অবস্থা অস্বস্তিতে ফেলে দিল ওকে। অনেক পরিবর্তন হয়েছে। বাতাস নেই, বৃষ্টিও শুরু হয়নি, কিন্তু সকালের ঝলমলে রোদ ঢেকে দিয়েছে কুয়াশা। ধূসর, ভেজা ভেজা কুয়াশা উঠছে মাটি থেকে। কুয়াশার জন্যে বিশ-তিরিশ গজের বেশি দৃষ্টি চলে না। ঢেকে দিয়েছে বিমানটাকে, দেখা যাচ্ছে না।

কি কারণে ঘটে এই পরিবর্তন জানা নেই ওর, তবে এটা জানে, এ ধরনের ঘটনা যখন-তখন ঘটে পার্বত্য অঞ্চলে। ঘন মেঘ নেই আকাশে।

বাতাসের দিক পরিবর্তনের কারণে শীতল বাতাস এসে গরম বাতাসের সঙ্গে মিশে গিয়ে সৃষ্টি করে হয়তো এই কুয়াশার। কিন্তু কুয়াশার কারণ গবেষণার সময় নেই এখন। কুয়াশা সৃষ্টি হয়েছে, এটাই আসল। এ অবস্থায় ওড়া অসম্ভব, চেষ্টা করতে গেলে মস্ত ঝুঁকি নিতে হবে।

কাছে এসে দাঁড়াল কিশোর, 'দেখেছেন?' তিক্তকণ্ঠে বলল সে, 'সময় থাকতে থাকতে চলে যাওয়া উচিত ছিল আমাদের।'

'অত ভড়কে যাওয়ার কিছু নেই,' নিজেকেই যেন বোঝাল ওমর। কিশোরের হাত থেকে একটা পিস্তল নিয়ে পকেটে ভরল। 'ঘটনা ঘটার আগে মনে হয় কি করে করব, কি করে করব; ঘটে যাওয়ার পর দেখা যায় সহজেই সমাধান হয়ে গেছে। এখন পর্যন্ত আমাদের কোন ক্ষতি হয়নি। ভাঙা প্লেনটা দেখতে গিয়ে এই সমস্যায় পড়েছি, এটা ঠিক, তবে তার জন্যে দুঃখ নেই আমার। তখন চলে গেলে একটা মূল্যবান তথ্য অজানা থেকে যেত। এখন আমরা জানি, মূর্তিটা প্লেনে করে এখান পর্যন্ত এসেছিল। কোথায় আছে এখন ওটা, তা-ও জানি।'

'তো কি করব এখন?'

'যা করা উচিত তা-ই। বসে থাকব, কুয়াশা সরার অপেক্ষায়। যে কোন মুহূর্তে কেটে যেতে পারে।'

'সারা দিন যদি থাকে? দু'তিন দিনেও না সরতে পারে।'

'সেটা ভেবে আগেই মন খারাপ করে বসে থাকার কোন যুক্তি নেই।'

'ইনডিয়ানরা কোথায়?'

'মনে হয় এতক্ষণে প্লেনটার কাছে পৌঁছে গেছে। ওটাই ওদের লক্ষ্য হয়ে থাকলে এখানে আসবে না। ওরা জানে না আমাদের কথা।'

'যদি আসে?'

'তখন দেখা যাবে। এখন এক কাপ চা খেলে কেমন হয়?'

'প্লেনটা সরাবেন না?'

'দরকার নেই। ওড়ার জন্যে রেডি করে রেখেছি। কোন দিকে ঘুরাতে হবে না। ইনডিয়ানরা এলে শব্দ শুনতে পাব। তাদের সঙ্গে কথা বলতে যাব। গোলমাল করতে চাইলে বলব, দেবতাকে এনে দেয়ার জন্যে আমাদের প্রতি ওদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। ওদের বোঝাব, ভাঙা প্লেনটায় করে এসেছি আমরা।'

চুপ হয়ে গেল কিশোর। বিমানটার দিকে এগোল তিনজনে। কুয়াশার মধ্যে অস্পষ্টভাবে ফুটে উঠল বিমানের অবয়ব। চা বানাতে ভেতরে ঢুকল কিশোর। বাইরে ঘাসের ওপর এমন জায়গায় বসল ওমর আর গিজেল, ইনডিয়ানরা এলে যাতে আগেভাগেই চোখে পড়ে। সিগারেট ধরাল ওমর। মেয়েটার সাহস আছে। সামান্যতম ঘাবড়ায়নি। সাহস আছে বলেই এত প্রতিকূলতার মধ্যেও টিকে গেছে।

চায়ের জগ আর কয়েক প্যাকেট বিস্কুট নিয়ে বেরিয়ে এল কিশোর। আবহাওয়া অপরিবর্তিত রয়েছে। ইনডিয়ানদের গান-বাজনা শোনা যাচ্ছে, তবে

এগিয়ে আসছে বলে মনে হলো না। তিনজনেই চুপচাপ। কথা খুঁজে পাচ্ছে না। কুয়াশার দিকে তাকিয়ে আছে ওমর। কমে কিনা দেখছে।

অবশেষে কিশোর বলল, 'কুয়াশা হালকা হতে সময় লাগবে, তাই না, ওমরভাই?'

মাথা ঝাঁকাল ওমর, 'সে-রকমই তো মনে হচ্ছে।'

'বসে থাকলে তো সময় কাটবে না।'

'তো কি করবে?'

'মূর্তিটা যদি নিয়ে যেতে পারতাম!'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত স্থির দৃষ্টিতে কিশোরের দিকে তাকিয়ে রইল ওমর। 'মাথাটাথা ঠিক আছে তো তোমার? না ইনডিয়ানদের মত পাগল হয়ে গেছ?'

'না, মাথা ঠিকই আছে। নিতে পারলে বীমা কোম্পানির হাতে তুলে দিয়ে বলতে পারতাম আমাদের মিশন সাকসেসফুল। শুধু আমাদের মুখের কথার ওপর নির্ভর করে গনজালেসের ক্লেইম ঠেকাতে পারবে না কোম্পানি। মূর্তিটা বহাল তবিয়তেই আছে, এ কথা প্রমাণ করতে না পারলে, মূর্তিটা তাঁর হাতে তুলে দিতে না পারলে, টাকা না দিয়ে পারবে না। তাতে এ কাজের জন্যে আপনার যে কমিশন পাওনা, সেটাও পাবেন না।'

'জাহান্নামে যাক কমিশন, লাগবে না আমার।'

'লাগবে না কেন? এতদূর কষ্ট করে এসে, মূর্তিটা কাছাকাছিই আছে জেনেও না নিয়ে যেতে পারাটা দুঃখজনক। পরে আফসোস করবেন।'

'তা অবশ্য মন্দ বলোনি। কোন কাজ আধখাপচা করে ফেলে যেতে আমারও ভাল লাগে না। কি করা যায়, ভাবা দরকার।'

কিন্তু কিভাবে মূর্তিটা উদ্ধার করে আনা যায়, অনেক ভেবেও কোন উপায় বের করতে পারল না ওরা।

এর মধ্যে প্রসঙ্গ পাল্টে গিজেল বলল, 'মার্কো কেমন আছে কে জানে! খুব ভাল ছেলে। ওকে আমি পছন্দ করি। একসঙ্গে যেদিন প্রথম উড়েছিলাম, নানা ভাবে আমাকে সাহায্য করেছিল ও।'

'বয়েস কত ওর?'

'আমার সমানই হবে। বিশ।'

'ওকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে কিনা কে জানে!' গম্ভীর হয়ে বলল ওমর। 'একা একা কারও পক্ষে এই দুর্গম এলাকা থেকে বেরিয়ে যাওয়া অসম্ভব। একমাত্র ইনডিয়ানরা পারবে।'

'ও পারতে পারে। ও আধা-ইনডিয়ান।'

গিজেলের দিকে তাকাল ওমর। 'তাহলে বেঁচে যেতেও পারে। বনের মধ্যে কি খেয়ে বেঁচে থাকা যাবে আমাদের চেয়ে ভাল বলতে পারবে ও।' গিজেলকে খুশি করার জন্যেই বলল ওমর। আসলে হারানো রেডিও-নেভিগেটরকে আবার ফিরে পাওয়ার আশা করছে না সে মোটেও।

আবার নীরবতা। চা শেষ। আরেকটা সিগারেট ধরাল ওমর। গুনে দেখল আর ক'টা অবশিষ্ট আছে। সময় যাচ্ছে। হঠাৎ ভাঙা বিমানটার দিক থেকে

এমন একটা চিৎকার আর হট্টগোল শোনা গেল, লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল তিনজনেই।

'এমন করছে কেন?' বিড়বিড় করল ওমর।

'ধোঁয়া দেখতে পাচ্ছি আমি।' হাত তুলে দেখাল গিজেল, 'ওই যে। আগুন লাগিয়েছে।'

'প্লেনটাকে পুড়িয়ে ফেলছে নাকি ব্যাটারা?' ধোঁয়ার দিকে কিশোরও তাকিয়ে আছে। 'সব তো ভেজা, আর কিছু না পেয়ে দেবতা আতু-হুয়ার ঘরে ফেরার আনন্দে, তার সম্মানে দাবানল জ্বালানোর বুদ্ধি করেছে হয়তো।'

'এতটা বোকামি কি করবে ওরা?' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল ওমর। 'দাবানল ছড়ালে নিজেদের গ্রামও পুড়ে যেতে পারে। কিন্তু আগুন দেখে তো মনে হচ্ছে তোমার কথাই ঠিক।'

গাছের মাথার ওপরে উঠে বিশাল ব্যাঙের ছাতার আকৃতি নিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে কালো ধোঁয়া।

'বোকামি করলে নিজেরাই মরবে,' কিশোর বলল। 'আর প্লেন পোড়ালেই কি না পোড়ালেই কি? আছেই বা কি ওটায়।'

'পেট্রোল। ট্যাংক ফাটলে আতু-হুয়ার মত কয়েক কোটি দেবতাও বাঁচাতে পারবে না ওদের।'

ওর মুখের কথা শেষ হলো না, ভয়াবহ এক বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল মাটি। গাছের মাথার ওপরে ছিটকে উঠল আগুন আর জঞ্জাল। কলরব করে আকাশে উড়ল পাখির ঝাঁক।

'গেল!' শান্তকণ্ঠে বলল ওমর। 'দিয়েছে কাজ সেরে!'

আবারও তার কথা শেষ হতে না হতেই শোনা গেল আর্তনাদ, চিৎকার, কোলাহল, আর গাছের মাথায় জঞ্জাল ঝরে পড়ার শব্দ। সেই সঙ্গে যোগ হলো ছুটে পালানোর হুড়মুড়, দুপদাপ।

'তারমানে আগুন লাগাতে গিয়ে আঙুল পোড়ালই,' কিশোর বলল।

'আঙুল কি বলো, আরও বেশি,' ওমর বলল। 'বুনো গাধার দল। এতটাই আহাম্মক, কি ঘটবে কল্পনাও করতে পারেনি।'

'কিন্তু আহাম্মক হলেও মানুষ তো। এ ভাবে কষ্ট পাবে···পোড়া ঘা বড় সাংঘাতিক জিনিস। ওমরভাই, ফার্স্ট এইড বের করব নাকি?'

'সাহায্য করতে গেলে না শেষে কামড়ে দিতে আসে!' এক মুহূর্ত চিন্তা করল ওমর। 'ঠিক আছে, করো। দেখা যাক।' উঠে দাঁড়াল সে। 'তুমি বের করে নিয়ে এসো। আমি যাচ্ছি।' বলেই ঢালের দিকে রওনা হয়ে গেল সে।

পথ এখন চেনা। আগের চেয়ে দ্রুত নামা যাচ্ছে। তবে তাড়াহুড়া করল না। সাবধান রইল। ইনডিয়ানদের বিশ্বাস নেই। আগুন দেখে তাৎক্ষণিকভাবে ছিটকে সরে গেলেও আহতদের উদ্ধার করতে ফিরে আসতে পারে।

ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেখল, যা কল্পনা করেছিল তারচেয়ে অনেক বেশি খারাপ অবস্থা। তবে যে রকম বিস্ফোরণ হয়েছে, খারাপ হওয়াটাই স্বাভাবিক। অনেকখানি জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে আছে পোড়া জঞ্জাল, বেশির ভাগই প্লেনটার,

বোঝাই যায়। তবে প্রচুর পালকও পড়ে থাকতে দেখা গেল। ইনডিয়ানদের মাথা থেকে খসে পড়েছে। বিমানের কাঠামো, বডি, সীট আর অন্যান্য জিনিসপত্র টুকরো টুকরো হয়ে পড়ে আছে এদিক ওদিক। পেট্রোল ট্যাংকটা দলে-মুচড়ে, গলে গিয়ে ধাতব বস্তুর টুকরায় পরিণত হয়েছে।

তিনজন মানুষ পড়ে আছে। আগুন লাগানোর সময় ট্যাংকের বেশি কাছে চলে গিয়েছিল নিশ্চয়। কাপড় সামান্যই আছে শরীরে। যা আছে, ছিঁড়ে ফালাফালা। আগুনে তো পুড়েছেই, ছিটকে যাওয়া ধাতুর টুকরো লেগেও কেটে-চিরে গেছে। বোমার আঘাতে আহত মানুষের মত মাংস খুবলে উঠে গেছে। একটা ইস্পাতের ডাণ্ডা গেঁথে আছে একজনের শরীরে। একবার দেখেই বোঝা হয়ে গেল ওমরের, সাহায্যের বাইরে চলে গেছে ওরা।

চোখের কোণ দিয়ে একটা নড়াচড়া দেখতে পেল ওমর। ফিরে তাকাল। ধ্বংসস্তূপের কাছ থেকে হামাগুড়ি দিয়ে সরে যাওয়ার চেষ্টা করছে একজন মানুষ। চামড়ার রঙ ইনডিয়ানদের মত অত বাদামী নয়, আবার শ্বেতাঙ্গদের মত সাদাও নয়।

তার কাছে দৌড়ে যাওয়ার সময় কি যেন পায়ে বাধল ওমরের। উপুড় হয়ে পড়তে পড়তে সামলে নিয়ে নিচের দিকে তাকাল। একটা ডাণ্ডায় পা লেগেছিল। ডাণ্ডার মাথায় চামড়ার ফালি দিয়ে পেঁচিয়ে বাঁধা আতু-হুয়ার মূর্তি। লাল একটা মাত্র চোখ দিয়ে তাকিয়ে আছে। অভিশাপ বাস্তবায়িত করার আনন্দে ক্রূর হাসছে যেন ওর দিকে তাকিয়ে।

ওর হাসির তোয়াক্কা না করে আহত লোকটার দিকে এগিয়ে গেল ওমর। পায়ের শব্দে ঘাড় ঘোরাল লোকটা।

বয়েস খুব কম। বিশের বেশি হবে না। ওমরকে দেখে ককিয়ে উঠে সাহায্যের অনুরোধ জানাল।

হাঁটু গেড়ে তার পাশে বসে পড়ল ওমর। জখম কতটা হয়েছে দেখার জন্যে।

চিত হয়ে পড়ে আছে ছেলেটা। ব্যথায় বিকৃত মুখ।

কাটা-চেরা কোন জখম নেই, তবে পুড়েছে। ভালমতই পুড়েছে মুখ আর হাত। চুল পুড়ে খুলির কাছাকাছি চলে গেছে। চোখের ভুরু, পাপড়ির কিছুই অবশিষ্ট নেই। শরীরটা বেঁচে গেছে, তার কারণ, পরনে কাপড় আছে। ব্যাপারটা অবাক করল ওমরকে। ইনডিয়ানদের তো প্রায় পুরো শরীরটাই খালি থাকে। গায়ে জ্যাকেট, বোতামগুলো ধাতুর তৈরি, বুকে একটা তকমা। পরনের পোশাকটা ইউনিফর্ম। তারমানে ছেলেটা বুনো ইনডিয়ান নয়।

'ইংরেজি বোঝো?' জিজ্ঞেস করল ওমর।

'বুঝি, সেনর। বলতেও পারি।'

'প্লেনটার ক্রু ছিলে নাকি তুমি?'

'সি?'

'তোমার নাম মার্কো?'

'সি, আমি মার্কো। আপনি জানলেন কি করে?'

'গিজেল বলেছে।'

'গিজেল কোথায়?'

'নিরাপদেই আছে।'

'যাক, ঈশ্বরকে অনেক ধন্যবাদ। আপনি কি করে এলেন?'

'প্লেনে করে। তোমাদের খুঁজতে। গিজেলকে হাত নাড়তে দেখে নেমেছি।...ইনডিয়ানদের সঙ্গে কি করছিলে?'

'গিজেলকে রেখে খাবারের সন্ধানে বেরিয়েছিলাম। ওরা যখন আমাকে দেখতে পেয়ে ওদের গাঁয়ে নিয়ে গেল, মরো মরো অবস্থা তখন আমার। জানতে চাইল, কিভাবে এসেছি। প্লেনটার কথা বললাম। ওরা তখন প্লেনটা খুঁজে বের করল। সাংঘাতিক উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল।'

'ট্যাংকে যে পেট্রোল ছিল, তুমি তো জানতে। ওদের আগুন লাগাতে নিষেধ করলে না কেন?'

'করেছি, শোনেনি। পাঁড় মাতাল হয়ে ছিল। বলিও দিত, কারণ...'

'আতু-হুয়াকে ফিরে পেয়েছে।'

অবাক হলো মার্কো, 'সেটাও জানেন!'

'জানি। পরে শুনব সব তোমার কাছে।'

জানার জন্যে অস্থির হয়ে উঠলেও মার্কোর জরুরী চিকিৎসা দরকার বুঝে আপাতত প্রশ্ন করা বাদ দিল ওমর। পোড়া জখম বড় খারাপ জিনিস। শক-এর কারণে জ্ঞান হারাতে এমনকি মারাও যেতে পারে ছেলেটা। বলল, 'এখানে তোমার জন্যে কিছু করতে পারব না। হাঁটতে পারবে?'

'কোথায় যাব?'

'আমাদের প্লেনের কাছে। ফার্স্ট এইড দিতে পারব। তুমি হাঁটতে না পারলে আমাকেই গিয়ে ওষুধ নিয়ে আসতে হবে। ততক্ষণে ইনডিয়ানরা ফিরে আসতে পারে। ভাল হয়, তুমি হাঁটতে পারলে। এখান থেকে সরে পড়া দরকার।'

'চেষ্টা করে দেখতে পারি।' উঠে দাঁড়াল মার্কো। টলছে। বেহুঁশ হয়ে যাবার ভয় আছে। শকটা কাটাতে পারেনি এখনও। পোড়া জায়গাগুলোতেও নিশ্চয় ভয়ানক যন্ত্রণা হচ্ছে।

ওর একটা হাত ধরল ওমর। হাঁটতে সাহায্য করল। যাওয়ার পথে তুলে নিল আতু-হুয়াকে, এত সব গণ্ডগোলের মূল যেটা।

বারো

ওমরের হাতের ওপর প্রায় ঝুলে থেকে এগোল মার্কো। বার বার থেমে বিশ্রাম নিয়ে অবশেষে অনেক কষ্টে পৌঁছাল ওরা ওপরের মালভূমিতে। ওমর আশা করেছিল, কুয়াশা কেটে গেছে দেখতে পাবে। নিরাশ হতে হলো তাকে।

খারাপ হয়েছে আরও। হালকা বাতাসকে ভারী করে তুলেছে পানির মিহি কণা, ঝিরঝিরে বৃষ্টির মত পড়তে শুরু করেছে। ভিজিয়ে দিচ্ছে সব কিছুকে। অস্বস্তিকর সেঁতসেঁতে করে তুলেছে পরিবেশ।

ওদের আসতে দেখে এগিয়ে এল কিশোর। গিজেলও বসে থাকতে পারল না। লাঠিতে ভর দিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে এল।

'দেখো, কাকে নিয়ে এলাম,' হাসিমুখে বলল ওমর।

'মার্কো!' চিৎকার করে উঠল গিজেল। ফিরে পাওয়ার আনন্দে প্রায় জড়িয়ে ধরল ওকে।

মার্কোকে গিজেলের হাতে ছেড়ে দিয়ে কিশোরের দিকে তাকাল ওমর। 'এটা নিয়ে গিয়ে প্লেনে রেখে এসো।'

'কি এটা? আতু-হুয়া না?'

মাথা ঝাঁকাল ওমর।

কোথায়, কিভাবে পেয়েছে জিজ্ঞেস করল না কিশোর। এখন সময় নয়। মার্কোর চিকিৎসা করাটা সবচেয়ে জরুরী।

তাকে বয়ে নিয়ে আসা হলো বিমানের ভেতর। ব্যথা নিরোধক ট্যাবলেট দিল আগে ওমর। তারপর পোড়া ক্ষত পরিষ্কার করে ব্যান্ডেজ বাঁধতে বসল। পরিষ্কার করার পর বোঝা গেল, অতটা খারাপ নয়। আরও বেশি হতে পারত। ওপরের চামড়াটা কেবল পুড়েছে। বড় বড় ফোস্কা পড়েছে। এক কাপ সুপ বানিয়ে এনে দিল কিশোর। সেটা খাওয়ার পর ব্যান্ডেজ বাঁধা হাতের দিকে তাকিয়ে মার্কো ঘোষণা করল, একেবারে আগের মত স্বাভাবিক, সুস্থ হয়ে গেছে সে। যদিও সেটা ওর মুখের কথা। বিমানের কেবিনে মাথার নিচে বালিশ দিয়ে আরাম করে শোয়ানোর পর কথা বলা শুরু করল সে।

'কুয়াশা না কাটলে তোমাকে হাসপাতালে নেয়া যাবে না,' ওমর বলল, 'বুঝতে পারছ তো?'

'অবশ্যই পারছি,' না বোঝার মত বোকা নয় মার্কো।

'অপেক্ষা করতেই হচ্ছে। ততক্ষণে তুমি বরং বলে ফেলো আমাদের, কি ঘটেছিল। জানা থাকলে সুবিধে হবে। যদি কোন অঘটন ঘটে আবার, কি পদক্ষেপ নিতে হবে বুঝতে পারব।'

'কি জানতে চান?'

'অনেক কথা। প্রথমেই বলো, প্লেনের যা অবশিষ্ট ছিল সেগুলো নিতেই কি এসেছিল ইনডিয়ানরা?'

মার্কো জানে না। 'হবে হয়তো। ওরা কি করছে, মনে হলো, ওরা নিজেরাও জানে । সমস্ত শয়তানি ওই ওঝাটার। সে ওদের যা বুঝিয়েছে, ওরা তা-ই করেছে।'

'একবার তো সব নিয়েই গেল। আবার এসেছিল কেন প্লেনের কাছে? বডিটাও নিয়ে যেতে?'

'উঁহু। আতু-হুয়াকে নিয়ে এসেছিল, ওর সামনে প্লেনটা ধ্বংস করতে, বলি দিতে।'

'কি বলি দিত?'

'আমাকে।'

হাঁ হয়ে গেল ওমর। 'তারমানে নরবলি দিতে যাচ্ছিল ওরা? সত্যি বলছ?'

'হ্যাঁ।'

'কিভাবে?' কিশোর জানতে চাইল।

'শ্বেতাঙ্গরা যখন প্রথম এই অঞ্চলে এসেছিল, ওদের পূর্বপুরুষেরা যেভাবে বলি দিত। আগুনে পুড়িয়ে।'

'বাহ্, চমৎকার!' বিড়বিড় করল ওমর। 'পিশাচের মনোভাব এখনও বহাল রয়েছে। এতকাল পরেও।'

'কোন কিছুই ভোলে না নাকি ওরা?' কিশোরের প্রশ্ন।

'না, ভোলে না। এক পুরুষ থেকে আরেক পুরুষে রয়ে যায় সেই কাহিনী। প্লেনের একটা টুকরো ভেঙে নিয়ে তাতে আগুন ধরিয়ে, তার মধ্যে আমাকে ছুঁড়ে দিতে যাবে, এই সময় ট্যাংকে আগুন ধরে গেল। তাতে শাপে বর হলো আমার জন্যে, প্রাণটা বাঁচল। ভয়ে আমার কথা ভুলে গিয়ে তাড়াহুড়ো করে পালাল ওরা,' হাসল মার্কো। 'হয়তো ভেবেছে, কোন কারণে রেগে গেছে আতু-হুয়া।'

'তা এক হিসেবে রেগেছেই ধরে নেয়া যায়,' ওমর বলল।

'আপনি কি জানতেন,' মার্কোকে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'আতু-হুয়া আপনাদের প্লেনে ছিল?'

'না। কি করে জানব? প্রথম জানতে পারলাম, ওদের গাঁয়ে গিয়ে যখন দেখলাম ওটাকে ঘিরে নাচছে। পাথরের তৈরি অনেক পুরানো একটা ভাঙা মন্দিরের সামনের বেদিতে রেখেছিল মূর্তিটাকে। আশেপাশে কিছু বাড়িঘর আছে, ওগুলোরও পাথরের দেয়াল, সম্ভবত পুরোহিত বা ওঝারা থাকে। পর্বতের গভীরে এ ধরনের আরেকটা মন্দির আবিষ্কৃত হয়েছে কিছুদিন আগে। চারপাশ থেকে পাহাড়ের উঁচু উঁচু দেয়াল এমন করে ঘিরে রেখেছে, প্লেন থেকে তো দেখা যায়ই না, হেঁটে গেলেও খুব কাছে না গেলে চোখে পড়ে না। আমি যে মন্দিরটা দেখে এলাম, সেটাও দেখা যাবে না ওপর থেকে।'

'হুঁ, ইনটারেস্টিং,' মাথা দোলাল কিশোর। 'তা আপনাদের প্লেনটাকে কিসে নামাতে বাধ্য করল?'

দ্বিধা করতে লাগল মার্কো।

'আতু-হুয়ার অভিশাপে এ দুর্ঘটনা ঘটেছে, এ কথা বিশ্বাস করতে বলবেন না আমাকে,' কিশোর বলল।

'অভিশাপে না হলেও ওটার জন্যেই যে ঘটেছে, তা হয়তো বলা যায়।'

'গিজেলের কাছে শুনলাম, প্লেনে বিস্ফোরণ ঘটেছিল।'

'হ্যাঁ।'

'কারণটা কি?'

'বোমা।'

'আতু-হুয়ার সঙ্গে বোমার সম্পর্ক কি?'

'জানি না।'

'প্লেনে রাখল কি করে বোমাটা?'

আবার দ্বিধা করতে লাগল মার্কো। 'আতু-হুয়া প্লেনে ছিল বলেই বোধহয় বোমাটা রাখা হয়েছিল। এখন মনে হচ্ছে দোষটা আমারই ছিল।'

'তোমার দোষ ছিল মানে?' প্রায় চিৎকার করে উঠল ওমর। 'কি করেছিলে?'

'বলছি,' দ্বিধা ঝেড়ে ফেলতে আরেকটু সময় নিল মার্কো। 'এল লবিটো থেকে ছাড়ার আগে আগে অসুস্থ হয়ে পড়লেন আমাদের যাত্রী মার্সেল ব্রিজাক। আমাকে অনুরোধ করলেন, ছোট একটা প্যাকেট স্যানটিয়াগোতে পৌঁছে দিতে। পরে ওখানে যখন যাবেন তিনি, তখন সেটা আবার নিয়ে নেবেন। প্যাকেট আসলে দুটো ছিল, ছোট ছোট, শক্ত সুতো দিয়ে বাঁধা।'

'তুমি স্বীকার করছ তোমার কাছে দিয়েছিল?'

'করছি। এর মধ্যে কোন দোষ দেখিনি আমি।'

'কাজটা করে দেয়ার জন্যে টাকা-পয়সা দিয়েছিল নাকি তোমাকে?' জানতে চাইল ওমর।

লজ্জিত মনে হলো মার্কোকে। 'হ্যাঁ। ঈশ্বর আমাকে ক্ষমা করুন।'

'প্যাকেটের মধ্যে বোমা ছিল বলে তোমার ধারণা?'

'হ্যাঁ। তখন তো আর বুঝিনি, বুঝলে কি আর নিতাম!'

'বোমাটা দিল কেন বলো তো?'

'হয়তো স্যান্টিয়াগোতে যাতে পৌঁছতে না পারে।'

'কেন?'

'জানি না। আতু-হুয়ার সঙ্গে কোন সম্পর্ক থাকতে পারে। এখন মনে পড়ছে, সেনর ব্রিজাকের আচরণ অদ্ভুত ছিল। প্যাকেটটা দেয়ার জন্যে অস্থির হয়ে পড়েছিলেন তিনি। কি আছে জিজ্ঞেস করেছিলাম। বললেন, একটা অনেক দামী ঘড়ি।'

'আর তুমি বিশ্বাস করেছ?'

'করেছি। না করার কোন কারণ ছিল না।'

'এখন কি ভাবছ?'

'টাইম-বম্ব।'

'কোথায় রেখেছিলে?'

'লাগেজ হোল্ডে চিঠিপত্রের সঙ্গে।...আমার শাস্তি হওয়া দরকার। ডাকের সঙ্গে অন্য জিনিস রাখা বেআইনী।'

'শাস্তি তোমার হয়ে গেছে,' ওমর বলল, 'বরং বেশিই হয়েছে। তোমার জায়গায় আমি হলে এ সব কথা সহজে কাউকে বলতে যেতাম না। বললেও অনেক চিন্তা-ভাবনা করে বলতাম। বিপক্ষে চলে যেতে পারে। জেলও খাটতে হতে পারে। যাই হোক, বলে যাও।'

ওমরের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল মার্কো। তারপর বলল, 'যা বললেন তা-ই করব।' কিশোরের দিকে তাকাল সে, 'এখন বুঝতে পারছ তো, মূর্তিটার

জন্যেই এ দুর্ঘটনা ঘটেছে কেন বলেছিলাম?'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর, 'সেটা আগেই আঁচ করেছিলাম আমরা।'

'তাই নাকি! তার মানে জানতে? কিন্তু বোমা রেখে প্লেনটা ধ্বংস করে দেয়ার কারণটা কি?'

'কেউ একজন চায় না আতু-হুয়া স্যান্টিয়াগোতে পৌঁছাক। আর কি কারণ থাকতে পারে?'

'আমি কিছু বুঝতে পারছি না!'

'সত্যি কথা বলব? আমিও কিছু বুঝতে পারছি না। তবে রহস্যটার মধ্যে ক্ষীণ আলোর আভাস দেখতে পাচ্ছি এখন। আমাদের জানা মতে মাত্র তিনজন লোক জানে মূর্তিটার চিলিতে পাঠানোর কথা। কেউ চাইছে যাক, কেউ চাইছে না যাক। যে চাইছে না যাক, সে-ই ধ্বংস করতে চেয়েছে প্লেনটাকে। এতটাই বেপরোয়া হয়ে গেছে, প্লেনের মধ্যে এতগুলো মানুষের যে প্রাণ যাবে, সেটা নিয়েও মাথাব্যথা নেই তার। ওর ধারণা, সফল হয়ে গেছে।'

'হুঁ!' ওমরের দিকে তাকাল মার্কো, 'মূর্তিটা তো পেলেন। এখন কি করবেন?'

'যার জিনিস তাকে ফিরিয়ে দেব।'

'ইনডিয়ানরা এটাকে ওদের জিনিস মনে করছে।'

'করুকগে। সেটা আমাদের ব্যাপার নয়।'

'অন্য যে কারও চেয়ে ইনডিয়ানরা বেশি গুরুত্ব দেবে জিনিসটার।'

'কিন্তু, কিছু কিছু লোক, রাজনৈতিক কারণে অন্য কথা ভাবছে। রাজনীতি নিয়ে আমার কোন মাথাব্যথা নেই। আমাকে যারা এখানে পাঠিয়েছে, তাদেরও নেই। ওদের কাছে টাকাটাই বড়। বিরাট অঙ্কের টাকা বীমা করানো হয়েছে মূর্তিটার, ফিরিয়ে দিতে না পারলে সেই টাকা গচ্চা দিতে হবে কোম্পানিকে।'

'বুঝলাম,' মার্কো বলল। 'এতক্ষণে পরিষ্কার হয়েছে। কোন লোকটা প্লেনে বোমা রেখেছে, জানেন?'

'না। তবে খুঁজে ঠিকই বের করব।'

'যে লোক আমাকে প্যাকেটটা পৌঁছে দেয়ার জন্যে টাকা দিয়েছে সে হতে পারে।'

'সে-রকমই মনে হচ্ছে অবশ্য। তবে হুট করে কোন সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলা ঠিক হবে না। তোমাকেও সাবধান করে দিচ্ছি। যে লোক এ কাজ করেছে, তোমাকে বেঁচে থাকতে দেখলে মোটেও খুশি হবে না। মুখ বন্ধ করার চেষ্টা করবেই।'

চোখ বড় বড় হয়ে গেল মার্কোর। 'আমাকে খুন করবে বলছেন!'

'একবার তো সেই চেষ্টাই করেছে, নাকি? তুমি আর গিজেল, দুজনেরই বিপদ হবে।'

'সত্যি?'

'হ্যাঁ। প্লেনটা যাতে খুঁজে বের করতে না পারি, সে-জন্যে চিলির কেউ একজন বাধা দিচ্ছিল আমাদের। এখন তোমরা তো বটেই, আমি আর

কিশোরও বিপদমুক্ত নই। যাকগে, ওসব নিয়ে ভাবার দরকার নেই আপাতত। এখন প্রধান কাজ, তোমাদের বাড়ি পৌঁছে দেয়া।'

'আতু-হুয়াকে কি করবেন?' অনেকক্ষণ পর একটা কথা বলল গিজেল। 'বাড়ি নিয়ে যাবেন?'

'হ্যাঁ।'

'আমাকে দিলে আমি ওটাকে খাদের মধ্যে এমন জায়গায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে যেতাম, জীবনে যাতে কেউ কোনদিন আর খুঁজে না পায়,' শীতল কণ্ঠে বলল গিজেল।

'করা তো উচিত সেইটাই,' ওমর বলল, 'কিন্তু জিনিসটার মালিক তো আর আমরা নই। তা ছাড়া অনেক টাকার ব্যাপার। টাকা খরচ করে কোম্পানি আমাদের নিতে পাঠিয়েছে এটা। ফেলে-গেলে তাদের সঙ্গে বেঈমানি করা হবে।'

সময় কাটছে। মাঝে মাঝেই উঠে গিয়ে দেখে আসে কিশোর, কুয়াশা কাটল কিনা। মার্কোর ভয়, ওকে আর আতু-হুয়াকে নিতে ইনডিয়ানরা ফিরে আসবেই। ওঝা বা প্রধান পুরোহিত যা-ই হোক, সে প্রাণে বেঁচে গেছে। এটাকে দুর্ভাগ্যজনক ভাবছে মার্কো। 'ওকে পালাতে দেখেছি আমি,' বলল সে। 'এরা আর সব ইনডিয়ানদের মত নয়, যাদের আমি চিনি। আমার দেশ করডিলেরার সাধারণ ইনডিয়ানদের ভাষা কুইচুয়া–সেই ভাষাতেও কথা বলে না এখানকার ইনডিয়ানরা।'

এক মুহূর্ত বিরতি দিয়ে বলল সে, 'গুজব আছে, পর্বতের গভীরে–অনাবিষ্কৃত কোয়েব্রাদায়, সভ্য পৃথিবীর বাইরে এখনও আদিম ইনডিয়ানদের বাস আছে।'

'কোয়েব্রাদাটা কি জিনিস?' জানতে চাইল কিশোর।

'গভীর খাদ, কিংবা পর্বতের গোড়ার সরু উপত্যকা। এখানকার ইনডিয়ানদের মতই ওসব কোয়েব্রাদায় নিশ্চয় এখনও অনেক আদিম ইনডিয়ান আছে, স্বর্ণলোভী শ্বেতাঙ্গদের তাড়া খেয়ে যারা পালিয়ে গিয়ে লুকিয়ে পড়তে বাধ্য হয়েছিল। আমার তো এখন এটাও বিশ্বাস হচ্ছে, ইনকারাও লুকিয়ে আছে পর্বতের মধ্যে কোনখানে। ওদের রাজা আতাহুলপাকে খুন করেছিল পিজারো, তারপর শুরু করেছিল পাইকারী গণহত্যা; প্রাণ বাঁচানোর জন্যে ইনকারা ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিল গ্রাম ছেড়ে। এ সবকে ইতিহাস বলেই জানতাম। মনে করতাম গুজব। এখন তো নিজের চোখেই দেখলাম।

'এখানে ইনডিয়ানদের ভাষার মধ্যে কিছু কিছু স্প্যানিশ শব্দ ঢুকে গেছে, তবে সামান্য। ইনডিয়ানদের আদিম কুঁড়ে চুজাতেও বাস করে না ওরা, থাকে বহুকাল আগের পাথরের তৈরি ঘরে। আমার ধারণা, এরা মরোচুকো গোত্রের লোক। মাত্র বিশ-তিরিশ বছর আগে এদের সন্ধান পাওয়া গেছে, হঠাৎ করে যেদিন মনটানার এক শহরে গিয়ে ঢুকল। ওরা বলল, ওদের শরীরে মিশ্র রক্ত–আধা স্প্যানিশ আধা ইনডিয়ান। শুনেছি আঠারোশো চব্বিশের যুদ্ধের সময় হেরে গিয়ে ওদের পূর্ব-পুরুষরা পালিয়ে গিয়েছিল এমন এক অঞ্চলে, পর্বতের

বারো হাজার ফুট ওপরেও যেখানে ঘন বন আর পামপার মত ঘাস জন্মায়। হয়তো এটাই সেই জায়গা। দেখে তাই মনে হচ্ছে না?...অনেক বকর-বকর করলাম। বিরক্ত লাগছে নিশ্চয়।'

'মোটেও না,' গভীর আগ্রহে শুনছিল কিশোর। মার্কোর কথা শেষ হতে উঠে গিয়ে উঁকি দিয়ে দেখতে গেল আবহাওয়ার কি অবস্থা। ভেবেছিল, একই রকম অপরিবর্তিত দেখতে পাবে। কিন্তু না, সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসার সাথে সাথে কুয়াশাও যেন পাতলা হতে আরম্ভ করেছে। ঝিরঝিরে বৃষ্টির মত মিহি কণাগুলো নেই আর এখন বাতাসে। ফিরে এসে জানাল সে-কথা।

'বড় দেরিতে সাফ হলো,' মাথা নাড়তে নাড়তে বলল ওমর, 'এখন আর ওড়ানো যাবে না। সামনে কি আছে স্পষ্ট না দেখা পর্যন্ত চেষ্টা করতেও রাজি নই আমি। অহেতুক মরার কোন প্রয়োজন দেখছি না। সকাল হোক, তারপর। কথা অনেক হলো। বসে থেকে লাভ নেই। খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়া দরকার।'

খাবারের টিন বের করতে গেল কিশোর। কিন্তু ফিরে এল প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। 'একটা শব্দ শুনতে পাচ্ছি,' ওমরের দিকে তাকাল সে, 'আপনারা পাচ্ছেন?'

জবাব দিল না ওমর। উঠে গিয়ে দরজা খুলে বাইরে তাকাল। দরজাটা ওভাবেই রেখে দিয়ে ফিরে এসে বলল, 'হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছ।'

'কিসের শব্দ?' উদ্বিগ্ন হলো গিজেল। 'ঝড় আসছে?'

'শুনলে ভয় পেয়ে যাবে, না বলেও উপায় নেই,' ওমর বলল, 'ভয়ানক খেপে গেছে ইনডিয়ানরা। এদিকেই আসছে।'

'তারমানে ভয়টা কাটিয়ে ফেলেছে,' মার্কো বলল। 'আতু-হুয়াকে খুঁজতে আসছে।'

'সেই সঙ্গে বোধহয় তোমাকেও।'

আঁতকে উঠল গিজেল, 'কিছু তো করা দরকার!'

'কি করব? কোন উপায় দেখছি না!'

তেরো

খুব ধীরে, যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও কেটে যেতে থাকল কুয়াশা। দেখা দিল মালভূমির গোধূলি। ঠিকই বলেছে ওমর, বড় দেরিতে পরিবর্তন হলো আবহাওয়ার, এখন আর কিছু করার নেই ওদের। খোলা জায়গাটার সীমানা, বিশেষ করে ধারগুলো এখন খুবই অস্পষ্ট। এ সময় প্লেন ওড়াতে যাবে না কোন বুদ্ধিমান পাইলট। চারপাশ থেকে ঘিরে রেখেছে বিরাট বিরাট পাহাড়ের চূড়া, কোন কোনটা বিশ হাজার ফুট উঁচু। কোন্‌টাতে গিয়ে যে ঠোকর খাবে কিছুই বলার উপায় নেই।

সামান্য সময়ের জন্যে থেমেছিল বন্য চিৎকার আর হট্টগোল, আবার

এগিয়ে আসতে শুরু করল। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বোঝার চেষ্টা করল ওমর। ফিরে তাকিয়ে জানাল, ভাঙা বিমানটার কাছ থেকে এখন এদিকেই আসছে ওরা।

'ব্যাপারটাই তো কিছু বুঝলাম না,' উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল মার্কো। অবাক লাগছে তাকে। 'এদিকে আসছে কেন? আমরা যে এখানে আছি ওদের তো জানার কথা নয়।'

'ওরা বুঝে গেছে এখানে কেউ আছে,' ভোঁতা স্বরে জবাব দিল ওমর। 'নরম মাটিতে বার বার যাওয়া আসা করে এত চিহ্ন রেখে এসেছি আমরা, কানাও দেখতে পাবে। আর এখানকার পাহাড়ী ইনডিয়ানরা জাত শিকারী। অন্ধকারে পিছু নিয়ে বুনো জানোয়ার শিকার করে। মশালের আলোয় আমাদের পায়ের ছাপ অনুসরণ করে এগিয়ে আসাটা কিছুই না ওদের জন্যে।'

'কিন্তু কিছু তো একটা করা দরকার,' ঘন ঘন নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে কিশোর। মগজের বেয়ারিংগুলো তার চালু হয়ে গেছে পুরোদমে। 'বসে বসে মুরগীর মত চুপচাপ গলা কাটার অপেক্ষায় থাকব নাকি?'

'ওদের গিয়ে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারি, কি চায়,' ওমর বলল।

'লাভ কি? কোন ভাষায় কথা বলবেন? ওদের ভাষা তো আপনি জানেন না। আর জানলেও লাভ হত না। সামনে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পেটে একখান বল্লম ঢুকিয়ে দেবে।'

'বরং চুপচাপ কিছু না করে এখানে বসে থাকলেই সেই কাজটা সহজে সেরে ফেলবে ওরা,' ওমর বলল। 'লড়াইয়ের ষাঁড়ের শিং চেপে ধরে কাবু করতে আগ্রহী আমি। পালিয়ে বেড়ালে কোন লাভ হয় না। আমি ভাবছি, সামনে গিয়ে ওদের চমকে দেব। হঠাৎ দেখলে কি করবে বুঝে উঠতে পারবে না। ওরা সিদ্ধান্ত নেয়ার আগেই ভজিয়ে-ভাজিয়ে হয়তো ফেরত পাঠাতে পারব।'

'আতু-হুয়াকে নিয়ে গিয়ে দিয়ে দিন ওদের,' গিজেল বলল, 'ল্যাঠা চুকে যাক। ওটার খোঁজেই আসছে হয়তো।'

'আমার তা মনে হয় না,' ওমর বলল। 'মূর্তি পেলেই যে ফিরে যাবে তার কোন বিশ্বাস নেই। মার্কো, তোমার কি মনে হয়? ওদের সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে, তুমি ভাল বলতে পারবে।'

'আমাকে তো বেঁধে পোড়ানোর পাঁয়তারা করেছিল, আমি আর কি বলব,' ঝাঁঝাল কণ্ঠে জবাব দিল মার্কো। 'মাথায় ওদের ঘিলু খুব সামান্যই আছে। যা আছে সেটুকুকে ভড়কে দেয়ার জন্যে একটা কাজই করা যেতে পারে, সোজা গুলি শুরু করা। টপাটপ মাটিতে পড়তে শুরু করলেই বুঝে যাবে কোনদিকে লেজ তুলে দৌড়াতে হবে।'

ভুরু কুঁচকে তাকাল ওমর। 'কি বলছ! ওরাও তোমার মতই চিলির নাগরিক। স্যান্টিয়াগোতে একজন শ্বেতাঙ্গকে গুলি করে মারা আর এখানে একজন ইনডিয়ানকে মারা একই অপরাধ।'

'তাই বলে আত্মরক্ষা করবেন না? কেউ যদি খুন করতে আসে?'

'খুন এখনও ওরা করতে আসেনি আমাকে।'

'কি বিশ্বাস আছে? চুপচাপ বসে থাকলে দেখা যাবে অনেক দেরি হয়ে গেছে, শেষে আর আত্মরক্ষার সুযোগটাও পাওয়া যাবে না।'

'থাক, এ নিয়ে আর তর্ক করতে চাই না তোমার সঙ্গে,' শুকনো হাসি হাসল ওমর। 'কি কি অস্ত্র ব্যবহার করে ওরা?'

'বল্লম, পাথরের কুড়াল আর মুগুর ছাড়া আর তো কিছু দেখিনি।'

'আগ্নেয়াস্ত্র?'

'নাহ্। পাবে কোথায় বন্দুক। দেখেওনি মনে হয় জীবনে।'

'আরও কাছে চলে এসেছে,' কান পেতে থেকে কিশোর বলল। 'কি যে করে বসবে খোদাই জানে!'

'যা-ই করুক,' দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে জবাব দিল ওমর, 'প্লেনটা ধ্বংস করতে দেয়া চলবে না ওদের। এটা গেলে, ধরে নিতে হবে আমরাও শেষ। দেখি, কি করা যায়। তোমরা লুকিয়ে থাকো। মার্কো, খুব সাবধান, তোমাকে যেন কোনমতেই চোখে না পড়ে ওদের। তাহলে ধরেই নেবে প্লেনে বিস্ফোরণ ঘটানোর জন্যে তুমি দায়ী। আগুন ধরিয়ে ওদের খুন-জখম করে এখানে এসে লুকিয়ে আছ।'

'আমি আসি আপনার সঙ্গে,' উঠে দাঁড়াল কিশোর। 'একলা ওই খুনেগুলোর সামনে গিয়ে দাঁড়াবেন...'

একটা মুহূর্ত তাকিয়ে রইল ওমর। ভাবল কিছু। মাথা ঝাঁকাল, 'এসো।' মার্কোর দিকে তাকাল সে, 'আমরা যদি ফিরে না আসি, যতক্ষণ পারো প্লেনটা বাঁচানোর চেষ্টা করবে। টিকে থাকতে পারলে এক না এক সময় সাহায্য আসবেই। ওপর থেকে প্লেন দেখলে নামবে এখানে সার্চ পার্টি। প্রয়োজন না পড়লে গুলি চালাবে না। আত্মরক্ষার জন্যে ছাড়া পিস্তল ব্যবহার করবে না। কিশোর, লকারে বাড়তি যে পিস্তলটা আছে, ওটা মার্কোকে দিয়ে দাও। মার্কো, মৃত্যুর আগে তোমার শেষ গুলিটা চালাবে গিজেলের কপাল সই করে, যাতে ইনডিয়ান সর্দারের বউ না হতে হয় ওকে—সারা জীবন নরক ভোগ করতে হবে তাহলে। ওই জীবনের চেয়ে মরে যাওয়া ভাল।'

প্লেন থেকে মাটিতে নামল ওমর। একটা মিনিট স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। শুনে বোঝার চেষ্টা করছে কতটা দূরে রয়েছে আর উন্মত্ত হট্টগোল। চলে এসেছে। মালভূমির কিনারে বনটা যেখানে পাতলা হয়ে গেছে, ওখানেই রয়েছে এখন দলটা।

কিশোরও নামল। ওমরের মতই কান পেতে শুনতে শুনতে হঠাৎ মাথায় এল চিন্তাটা। আরও আগে মনে পড়েনি কেন ভেবে অবাক লাগল। তাকে বোঝানো হয়েছে, আতু-হুয়ার কথা ইনডিয়ানরা জানে, কারণ তার পূর্ব-পুরুষরা এই দেবতার পূজা করত। দেখলেই চিনে ফেলবে। কিন্তু কি করে চিনবে?, এই বুনো লোকগুলোর কেউই জীবনে চোখেও দেখেনি মূর্তিটা। ইতিহাস বলে বহুকাল ইংল্যান্ডে ছিল ওটা, তারপর গিয়েছে আমেরিকায়। কোন স্প্যানিশ পুরাতত্ত্ববিদই হয়তো জাহাজে করে নিয়ে যান স্পেনে। স্পেন থেকেই ইংল্যান্ডে গিয়েছিল এটা, সন্দেহ নেই। দক্ষিণ আমেরিকা থেকে মূর্তিটা যখন

হারিয়ে যায়, এখনকার কোন ইনডিয়ানের জন্যও হয়নি তখন।
ঝড়ের গতিতে ভাবনা চলেছে কিশোরের যুক্তিবাদী মগজে। কোথাও কোন একটা গণ্ডগোল নিশ্চয় রয়েছে। বাপ-দাদার মুখে আতু-হুয়ার কথা নিশ্চয় শুনেছে ইনডিয়ানরা। এক পুরুষ থেকে আরেক পুরুষে চলে এসেছে প্রাচীন লোক-কথার মত; শিক্ষিত, ভদ্র সমাজেও এ জিনিস চালু আছে, আর পাহাড়ী ইনডিয়ানদের তো থাকবেই। হ্যাঁ, ব্যাপারটা অদ্ভুতই–যতই ভাবছে, মনে হচ্ছে ওর। দেবতার কথা জানা থাকতে পারে ওদের, কিন্তু তারমানে এই নয় যে দেখামাত্র চিনে ফেলবে। আগে প্রশ্নটা জাগেনি কেন ভেবে খুঁতখুঁত করতে থাকল মনটা। তদন্তের অনেক সুবিধে হত তাতে। বিশেষ করে গনজালেস আর আলমাভোর সঙ্গে কথা বলার সময় কিছু অন্য প্রশ্ন করতে পারত। গনজালেস কি বলেছিলেন? বলেছেন, মূর্তিটা সাগরে পড়ে চিরকালের জন্যে হারিয়ে যায় যাক, তবু যেন অন্য কারও হাতে না পড়ে। একটা নতুন অর্থ দাঁড়াচ্ছে এখন এ কথাটার। স্যান্টিয়াগোতে মিস্টার জনসনের কথা তখন বিশ্বাসযোগ্য মনে হলেও এখন আর সেটা হচ্ছে না। ধীরে ধীরে বদ্ধমূল হচ্ছে ধারণাটা–যতটা ভেবেছিল তার চেয়েও ভয়ঙ্কর কোন ষড়যন্ত্রের মধ্যে জড়িয়ে গেছে ওরা।
এগিয়ে আসছে বুনো কোলাহল। নতুন চিন্তা মাথায় এল ওর। মালভূমিতে বেরিয়ে যদি প্লেনটাকে দেখে কি করবে ওরা? আবার আগুন লাগাতে আসবে? মনে হয় না। একবার লাগিয়ে কি ফলটা পেয়েছে দেখেছে তো। তবে বুনো ইনডিয়ানদের বিশ্বাস নেই। কি যে করবে ওরা, আগে থেকে বলা কঠিন।
চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে ওমর। পিস্তল বের করেনি, তবে হাত পকেটে। প্রয়োজন পড়লে যাতে মুহূর্তে বের করে আনতে পারে। কিশোরের দিকে তাকাল, 'চলো, এগোই। প্লেনটা দেখতে দেয়া চলবে না ওদের।'
বনের কিনারে পৌঁছে গেল দুজনে, যেখানে বড় বড় গাছের জটলার মাঝখানটা ফাঁকা করে ঝোপঝাড় আর ঘাস জন্মেছে। ওরা যাওয়ার মিনিটখানেকের মধ্যেই বেরিয়ে এল ইনডিয়ানরা। বারোজন মত হবে। দলের নেতৃত্ব দিচ্ছে গায়ে-মুখে রঙ মাখা, বিচিত্র সব আদিম জিনিসের মালা পরা একটা ভূত। কোনমতেই মানুষ মনে হয় না ওকে।
থমকে দাঁড়াল ওরা। রেডিওর সুইচ টিপে আওয়াজ বন্ধ করে দেয়ার মত পলকে থেমে গেল সমস্ত হট্টগোল। টুঁ শব্দ নেই কারও মুখে। একেবারে চুপ। চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে লোকগুলো। অধিকাংশের চোয়াল ঝুলে পড়েছে। ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে যেন সামনে ভিনগ্রহবাসীদের দেখছে।
তিরিশ সেকেন্ড ধরে পরস্পরের দিকে নীরবে তাকিয়ে রইল দুটো দল। নড়ে উঠল ওমর। ডান হাতটা তুলল স্বাগত জানানোর ভঙ্গিতে।
কোন প্রতিক্রিয়া হলো না ইনডিয়ানদের। আগে বাড়ল না। পেছনের যারা ঠিকমত দেখতে পাচ্ছে না তারা গলা টান টান করে এপাশ ওপাশ সরিয়ে দেখে বোঝার চেষ্টা করছে, কেন থেমে দাঁড়িয়েছে ওদের সর্দার আর আগের লোকগুলো। কারণটা বোঝার সঙ্গে সঙ্গে সামনের জনদের মতই যেন পায়ে

শেকড় গজিয়ে গেল ওদেরও। কোন শব্দ নেই। পুরো একটা মিনিট স্থির চিত্রের দৃশ্য বনে গেল যেন সবাই।

ভাষা জানে না। কি করবে বুঝতে পারছে না ওমর। ভাবছে। ইনডিয়ানরা এখনও আক্রমণ করছে না দেখে কিছুটা সাহস পেল। ইনডিয়ানরা যেদিক থেকে এসেছে সেদিক দেখিয়ে হাত তুলে চিৎকার করে বলল, 'যাও!' তার কথা ওরা বুঝতে পারবে আশা করেনি, তবে হাত নাড়া আর চিৎকার শুনে যদি ভড়কে গিয়ে চলে যায়, এ জন্যে করেছে।

কিন্তু ফল সেই একই। নড়ল না ইনডিয়ানরা। তাকিয়ে আছে এক ভঙ্গিতে। স্প্যানিশ ভাষায় কথা বলার চেষ্টা করল ওমর। কোন লাভ হলো না। হতাশ হয়ে কিশোরের দিকে তাকাল সে।

নিচের ঠোঁটে ঘন ঘন চিমটি কাটছিল কিশোর। হাতটা সরিয়ে আনল মুখের কাছ থেকে। পরীক্ষা করার এটাই সুযোগ। ইনডিয়ানদের দিকে তাকিয়ে স্পষ্ট করে জোরে জোরে বলল, 'আতু-হুয়া! আতু-হুয়া!'

কোন ভাবান্তর নেই ইনডিয়ানদের। যেন কানে শোনে না। পাথরের মূর্তির মত স্থির।

আবার চিৎকার করে একই কথা বলল কিশোর।

এবারও একই অবস্থা। ভাবান্তর নেই।

জেদ চেপে গেল ওমরের। ইনডিয়ানদের এই প্রতিক্রিয়াহীনতায় রাগ লাগছে। ব্যাটারা একটা কিছু কর! কিন্তু তার মনের কথাও যখন বুঝতে পারল না ওরা, আর সহ্য করতে পারল না সে, পকেট থেকে পিস্তল বের করে ওঝার দিকে তুলে গুলি করল। মাথার পালকের মুকুট থেকে পালক কেটে খসে পড়ল ওঝার। নীরবতার মাঝে গুলির প্রচণ্ড শব্দ প্রকট হয়ে কানে বাজল। পাহাড়ের দেয়ালে দেয়ালে প্রতিধ্বনি তুলল।

কথা বলে দেবতার দোহাই দিয়েও যা করাতে পারা যায়নি এতক্ষণ, একটা মাত্র গুলির শব্দই সে-কাজটা সুষ্ঠুভাবে করে দিল। বিদ্যুৎ ঝিলিকের মত যে যেদিকে পারল ছুটে গেল ইনডিয়ানরা। চোখের পলকে নেই হয়ে গেল সামনে থেকে। ঢুকে পড়ল বনের মধ্যে আর ঝোপঝাড়ে। ডালপালা ভেঙে দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটল।

হাসতে লাগল ওমর। ঢিল হয়ে এল স্নায়ু। পিস্তলটা পকেটে ভরে সিগারেট বের করল।

ঝোপঝাড়ে ছুটে পালানোর শব্দ কমতে কমতে মিলিয়ে গেল। ধারেকাছে নেই আর ইনডিয়ানরা।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে কিশোর বলল, 'গাঁয়ে পৌঁছার আগে আর থামবে না। চিন্তা-ভাবনা, শলা-পরামর্শ করে হয়তো আবার ফিরে আসবে। সকালের আগে না এলেই বাঁচি। চলুন, যাওয়া যাক।'

'হুঁ,' আনমনে মাথা দুলিয়ে বলল ওমর, 'বোঝা গেল, ওরা আগ্নেয়াস্ত্র চেনে না।

'চিনলেই বরং অবাক হতাম। একটা জুয়া খেলেছিলাম ওদের সঙ্গে।'

ফিরে চলল দুজনে। হাঁটতে হাঁটতে কিশোর বলল, 'এখানে যা ঘটল, তাতে পুরো ব্যাপারটা নিয়েই দ্বিতীয়বার ভাবতে হচ্ছে আমাকে। ভাবছি, ভুল পথে চালানো হয়নি তো আমাদের এতদিন! হয় একগাদা মিথ্যে কথা বলা হয়েছে আমাদের, নয়তো ইনডিয়ানদের পুরানো ইতিহাস সম্পর্কে কেউ কিচ্ছু জানে না ওরা। যা বোঝা গেল, এখানকার ইনডিয়ানরা আতু-হুয়া নামে কোন দেবতার নাম শোনেনি। আতু-হুয়া বলে এত যে চেঁচামেচি করলাম, চোখের পাপড়িটা পর্যন্ত কাঁপল না ওদের। কি মানে এর? ধরে নেয়া যায়, চেনে না।'

'হুঁ, তাতে দাঁড়ালটা কি?'

'দাঁড়াল? কোন একজন অতি চালাক লোক আতু-হুয়া নামের প্রাচীন এই দেবতার নামের জাদু দিয়ে পানি আর ঘোলা করতে পারবে না। এখানে গোলমাল বাধানোর চেষ্টা করতে হলে বিরস বদনে ফিরে যেতে হবে বেচারাকে।'

'কিন্তু আতু-হুয়াকে নিয়ে এ রকম নাচাকুঁদা শুরু করেছিল কেন তাহলে?' ওমরের প্রশ্ন।

'আপনার ওই পোড়া বিড়ির গোড়াটা পেলেও নাচত ওরা, দেখেনি তো কোনদিন,' হেসে বলল কিশোর। 'বিনোদনের বড় অভাব বেচারাদের। অতি তুচ্ছ কোন সুযোগ দেখলেও তাই হাতছাড়া করতে চায় না।'

'কিন্তু প্রশ্ন হলো, আবার কখন ফিরে আসবে ওরা?'

'দুঃখিত,' হালকা স্বরে জবাব দিল কিশোর, 'আপনার এই প্রশ্নটার জবাব দিতে পারলাম না। কারণ, আপনার মতই আমিও জানি না ওরা কি করবে। তবে ঘুমটা মারতে হবে আরকি আজ রাতে। কোন অবস্থাতেই কয়েক ঘণ্টা ঘুমের জন্যে প্রাণটা খোয়াতে রাজি নই আমি। পাহারা দিতে হবে। এবার ওরা এলে আগের মত হই-চই করবে না, আসবে ছায়ার মত নিঃশব্দে।'

চোদ্দ

বিমানে ফিরে দেখল, প্রচণ্ড উদ্বেগ আর দুশ্চিন্তার মধ্যে রয়েছে মার্কোরা।

'কি হয়েছিল?' ওমরদের দেখার সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞেস করল গিজেল।

'কিছু না।'

'কিছু না মানে? দেখা হয়েছিল ওদের সঙ্গে?'

'নিশ্চয়ই।'

'কি করল?'

'কিছু না।'

'কোথায় এখন?'

'বাড়ি গেছে, সম্ভবত।'

'গুলির শব্দ শুনলাম?' মার্কো জানতে চাইল।

'ওঝার মাথার মুকুট থেকে একটা পালক খসাতে চেয়েছিলাম, যাতে ভয় পেয়ে পালায়।'

'কাজ হয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

'কি হয়েছিল?' আবার আগের প্রশ্নটাই করল গিজেল।

'ভয় পেয়ে জঙ্গলে পালাল ওরা। মনে হয় গ্রামে চলে গেছে। আর না এলেই বাঁচি।'

'আসবে?'

'জানি না। দেখা যাক। তোমার পায়ের খবর কি?'

'ভাল।'

'গুড। তাহলে এবার খাওয়ার ব্যবস্থা করা যাক।' নাক কুঁচকাল ওমর, 'এই কুয়াশাটা এক মহা বেকায়দায় ফেলল। না কাটলে আমরা যেমন বেরোতে পারব না, কেউ আমাদের খুঁজতেও আসতে পারবে না।'

আর কোন কথা হলো না। ইমারজেন্সি স্টোর লকার থেকে খাবারের টিন বের করল কিশোর। রাঁধতে সাহায্য করল গিজেল। মার্কো শুয়ে আছে। ওমর চলে গেছে বাইরে আবহাওয়ার অবস্থা দেখার জন্যে। একই সঙ্গে দেখতে পারবে কেউ আসে কিনা। পরিষ্কার হয়ে গেছে আকাশ। হালকা কুয়াশা এখনও ঝুলে রয়েছে মালভূমির ওপর।

খাওয়ার সময়ও অসাবধান হলো না সে। খেতে খেতে দু'তিন বার উঠে গেল দরজার কাছে, বুনো হট্টগোল আবার কানে আসে কিনা শোনার জন্যে। সব শান্ত। বাতাস স্থির। ঠাণ্ডা।

খাওয়া শেষ করে বাসন-পেয়ালা গুছিয়ে রাখার পর প্রথম পাহারা দেয়ার প্রস্তাব দিল কিশোর।

রাজি হলো ওমর। 'মাঝরাতে তুলে দিয়ো আমাকে। বাকি রাতটা জেগে থাকব। ভোরে আকাশ পরিষ্কার হলেই রওনা হব।'

'কারও জেগে থাকার কি সত্যি দরকার আছে?' গিজেল জিজ্ঞেস করল।

'আছে,' ওমর বলল। 'অসাবধান থেকে ঝুঁকি নেয়ার কোন মানে হয় না।'

'ইনডিয়ানরা যদি আসে?'

'এলে তখন দেখা যাবে। অবস্থা বুঝে যা করার করব।'

দরজার কাছে গিয়ে সিঁড়িতে পা রেখে বসল কিশোর। কেবিনের মেঝেতে লম্বা হয়ে শুয়েছে অসুস্থ মার্কো। ওমর আর গিজেল সীটের মধ্যে যতটা সম্ভব আরাম করে আধশোয়া হলো। চারদিকে সুনসান নীরবতা। দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়ল ওমর।

রাত বারোটার পর ওকে যখন জাগিয়ে দিল কিশোর, বাকি দুজন তখন ঘুমে অচেতন। আস্তে করে ওমরের কাঁধে হাত রেখে ফিসফিস করে বলল সে, 'ওমরভাই, সময় হয়েছে।'

মুহূর্তে সজাগ হয়ে গেল ওমর। 'কিছু দেখেছ?'

'না। শব্দটব্দও শুনিনি কিছু।'

'হুঁ। শুয়ে পড়ো।'

কাউকে না জাগিয়ে পা টিপে টিপে দরজায় এসে দাঁড়াল ওমর। নিচে নামল। বসার আগে চারপাশটায় একটু নজর বোলানো দরকার। অন্ধকার। তবে ঘুটঘুটে নয়। কালো আকাশটাকে ফ্যাকাসে করে রেখেছে তারার উজ্জ্বল আলো। এ সব এলাকায় অনেক বড় দেখা যায় তারা। ঝকঝকে সাদা। মনে হয় যেন সুতোয় বেঁধে কালো বিশাল এক গম্বুজ থেকে ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে। আকাশে চাঁদ নেই। তারার আলোর বিচিত্র আভা শীতল এক ধরনের বিচিত্র আলোর মত ছড়িয়ে পড়েছে মালভূমিতে। মালভূমির কিনারের খাদটার মনে হচ্ছে তলা নেই। অদ্ভুত সব ছায়া। এত ওপরে পাতলা বাতাস, ঠাণ্ডা এমনিতেই বেশি; রাতের বেলা ঠাণ্ডা আরও বাড়ে।

পুরো একটা মিনিট বনের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ওমর। কোন নড়াচড়া আছে কিনা দেখছে। কান পেতে আছে শব্দ শোনার জন্যে। কিন্তু কিছু দেখলও না, শুনতেও পেল না। মালভূমির ওপরে এখানে সে একেবারেই একা। ফিরে এসে বসল সিঁড়িতে।

সময় কাটতে লাগল। একঘেয়ে দীর্ঘ সময়। বার বার ঘড়ি দেখার প্রয়োজন মনে করল না। ভোর পর্যন্ত থাকতে হবে। আলো ফুটলেই বুঝতে পারবে ভোর হয়েছে। বুনো অঞ্চলে এ ভাবে একা পাহারা দিয়ে বহু রাত কাটিয়েছে সে। কোন একটা বিষয় নিয়ে ভাবতে থাকলে সময়টা আর তত একঘেয়ে লাগে না। যে কাজে এসেছে সেটা নিয়ে ভাবতে লাগল। যে সব সূত্র আছে, মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করে সমাধান খোঁজার চেষ্টা চালাল। অনেকক্ষণ ভাবার পর একটা সিদ্ধান্তেই এল—বোমাটা প্লেনে আর যে-ই রাখুক, গনজালেস রাখেননি। কারণ স্যান্টিয়াগো যাওয়ার পথে প্লেনটা যখন ধ্বংস হয়, তিনি তখন বহুদূরে উত্তর আমেরিকার লস অ্যাঞ্জেলেসে বসে আছেন।

একটা শব্দ হতেই ভাবনার জগৎ থেকে চমকে বাস্তবে ফিরে এল সে। বাস্তবতার সঙ্গে এতই অমিল শব্দটার, তার সন্দেহ হতে লাগল ঘুমিয়েই কি পড়েছিল? তন্দ্রার ঘোরে স্বপ্ন দেখেনি তো? মনে হয়েছে, চিৎকার শুনেছে। বনের দিক থেকে এসেছে চিৎকার। স্প্যানিশ ভাষায় ডেকে জিজ্ঞেস করেছে কেউ, 'এই যে, শুনছেন?'

উঠে দাঁড়াল ওমর। অস্পষ্ট অন্ধকারে কালো বনের দিকে তাকাল। জবাব দিল না। কিছু দেখার আশা করল না। শব্দটা নিশ্চয় কানের ভুল। তবু অসাবধান না হয়ে তাকিয়ে রইল।

মট করে একটা শুকনো ডাল ভাঙল পায়ের চাপে। আর কোন সন্দেহ রইল না তার। ভুল শোনেনি। ডাকটাও শোনা গেল আবার, 'এই যে, ভাই, শুনছেন? কোথায় আপনি?'

তা-ও জবাব দিল না ওমর। ঝড়ের গতিতে ভাবনা চলেছে মনের মধ্যে। যে ডাকছে, সে ইনডিয়ান হতেই পারে না। একটা ব্যাপারে খানিকটা স্বস্তি বোধ করল, চুরি করে গোপনে আসার চেষ্টা করেনি লোকটা। নিজের অস্তিত্ব জাহির করেই আসছে। কুমতলব যদি থাকেও, সেটা গোপনে সারার ইচ্ছে নেই।

কে লোকটা? ধ্বংস হয়ে যাওয়া প্লেনটার ক্যাপ্টেন নাকি? না সেকেন্ড পাইলট—যারা সাহায্য আনতে গিয়েছিল? কোন কিছু না পেয়ে খালিহাতে ফিরে এল ভেঙে পড়া প্লেনের কাছে?

সম্ভাবনা বড়ই কম। কিন্তু এ ছাড়া আর কোন জবাব খুঁজে পেল না আপাতত সে।

এক মিনিট গেল। এত নীরবতার মাঝে যত সাবধানেই হেঁটে আসুক কেউ, না জানিয়ে আসতে পারবে না। ডাকটা যেদিকে শোনা গেছে সেদিকে তাকিয়ে চুপ করে রইল সে। অবশেষে আবছা একটা অবয়বকে হেঁটে আসতে দেখল বনের কিনারের লাল ফুলগুলোকে মাড়িয়ে। কিছুদূর এসে দাঁড়িয়ে গেল। আবার ডাক দিল, 'শুনছেন?'

জবাবের অপেক্ষায় রইল লোকটা। না পেয়ে আবার এগোতে শুরু করল।

এতক্ষণে সাড়া দিল ওমর, 'কি বলছেন?'

কোন রকম দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, লুকোচুরি না করে এগিয়ে আসতে লাগল মূর্তিটা। তাকিয়ে আছে ওমর। লোকটা বিশ কদম দূরে থাকতে চিৎকার করে বলল, 'আর এগোবেন না!'

জবাবে লোকটা জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি আমেরিকান?'

'কেন?'

'এখানে কি করছেন?'

'সে প্রশ্নটা আমিও তো করতে পারি আপনাকে। আপনি এখানে কি করছেন?'

'আমি পালাতে চাই। এ ভাবে দূরে দাঁড়িয়ে চিৎকার করার কি কোন দরকার আছে? ভয় পাচ্ছেন আপনি?'

'হ্যাঁ, পাচ্ছি,' সত্যি কথাটাই বলল ওমর।

'আমাকে ভয় করার কোন কারণ নেই।'

'আপনি কি আমেরিকান?'

'না, চিলিয়ান। কাছে আসব?'

'না, দাঁড়ান...'

'আপনি এখনও বিশ্বাস করতে পারছেন না আমাকে!'

'করার কি কোন কারণ ঘটেছে? কাউকেই বিশ্বাস করার মত পরিস্থিতি নেই আমার এখন।'

এগিয়ে আসতে শুরু করল আবার লোকটা। ঠিক এই সময় দরজার কাছ থেকে বলে উঠল কিশোর, 'কি হয়েছে?' কথার শব্দে ঘুম ভেঙে গেছে তার। লাফ দিয়ে নিচে নামল।

'মেহমান এসেছে,' ওমর জানাল। লোকটাকে বলল, 'অনেক কাছে চলে এসেছেন। এখন বলুন আপনি কে? নাম কি আপনার?'

'কাজনান পিকো।'

'কোত্থেকে এসেছেন?'

'স্যান্টিয়াগো।'

'এখানে কি করছেন?'

'বসতে দেন যদি, আর এক কাপ কফি, সব বলব। খুব খারাপ সময় গেছে আমার।'

'বেশ, আসুন। কোন চালাকির চেষ্টা করবেন না।'

'প্রশ্নই ওঠে না। আমাকে বের করে নিয়ে যাবার অনুরোধ করছি এখান থেকে। এর বেশি আর কিছু চাই না।'

'ইনডিয়ানদের সঙ্গে ছিলেন নাকি?'

'অনেকটা সে-রকমই। ধরে আটকে রেখেছিল আমাকে। পালিয়ে এসেছি।'

'পেছন পেছন আসছে না তো ওরা?'

'মনে হয় না। ওদের কথাবার্তা থেকে অন্তত সেটা মনে হয়নি।'

'তারমানে ওদের কথা বোঝেন আপনি?'

'মোটামুটি।'

গিজেল আর মার্কোও জেগে গেছে। দরজার কাছে এসে উঁকি দিয়ে দেখছে কে কথা বলছে। লোকটার সঙ্গে কিশোর আর ওমরকে এগোতে দেখে সরে ঢোকার জায়গা করে দিল। কেবিনে ঢুকে আলো জ্বেলে দিল কিশোর। ভালমত দেখা গেল লোকটার চেহারা।

বয়েস তিরিশ। হালকা-পাতলা ছিপছিপে দেহ। তবে রোগা নয় মোটেও। রোদে পোড়া চামড়া। কালো চুল। খোঁচা খোঁচা দাড়ি। লাল চোখ দেখে বোঝা যাচ্ছে অসুস্থ, বোধহয় জ্বর।

কফি আর বিস্কুট এনে দিল কিশোর।

নিতে নিতে ওমরের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল লোকটা, 'এখানে কি করছেন আপনারা?'

'সেটা এখনও জানানোর সময় হয়নি,' জবাব দিল ওমর। 'আগে আপনার কথা শোনা যাক। আমরা এখানে আছি, আপনি জানলেন কি করে?'

'ইনডিয়ানদের কাছে। একটু অপেক্ষা করুন। বলছি।'

বুভুক্ষের মত দুটো বিস্কুট খেয়ে কফির কাপে চুমুক দিল পিকো। এক এক করে তাকাল সবার মুখের দিকে। ঘুরে এসে আবার ওমরের ওপর স্থির হলো দৃষ্টি। 'আমি একজন অ্যাডভেঞ্চারার। বনে-বাদাড়ে, পাহাড়ে-পর্বতে ঘুরে বেড়ানো আমার শখ। মূল্যবান ধাতু আর পাথরের খোঁজ করি।'

'একা?'

'হ্যাঁ। আমি একা চলতেই ভালবাসি। কাউকে সঙ্গে নিলে অনেক সময় তার ইচ্ছেটাকেও প্রাধান্য দিতে হয়। সে-জন্যে একাই চলি।'

'কিন্তু অভিযান করে তো জীবন চলে না। পেশা একটা দরকার হয় মানুষের। খান কি করে?'

'চামড়ার ব্যবসা করে। ফার। চিনচিলা চেনেন? ইঁদুর গোষ্ঠীর ধূসর ওই প্রাণীগুলোর চামড়ার সাংঘাতিক দাম...'

'জানি। বলে যান।'

'অভিযানের নেশা আর চিনচিলা শিকারের জন্যে এই দুর্গম এলাকায় ঢুকেছি আমি। ইনডিয়ানদের সঙ্গে সখ্য করেছি। ওদের ভাষা শিখেছি। এখানকার ইনডিয়ানরা বহু প্রাচীন অ্যারাওকান ইনডিয়ানদের বংশধর। এই পর্বত ছেড়ে কোথাও যায়নি কখনও, সভ্যতার ধারে-কাছে নেই। ওদের সম্পর্কে অনেক তথ্য দিয়েছি আমি বিশ্ববিদ্যালয় আর নৃতত্ত্বে আগ্রহী মানুষকে। তাতে কয়েকজনকে অতি আগ্রহী হয়ে উঠতে দেখেছি।'

'যেমন?' জানতে চাইল ওমর, 'একআধজনের নাম বলুন?'

'যেমন ধরুন, ডন হুয়ান গনজালেস। বিরাট বড়লোক। এবারে এখানে আসার খরচ তিনিই দিয়েছেন। মাত্র কিছুদিন আগে চিনচিলা শিকার করে গিয়েছি এখান থেকে। এত তাড়াতাড়ি আবার আসতাম না। তাঁর চাপাচাপিতেই এসেছি।'

কান খাড়া হয়ে গেছে কিশোরের, 'তিনি পাঠিয়েছেন!'

'হ্যাঁ।'

'কেন?'

'তিনি শুনেছেন, ইনডিয়ানদের এক প্রাচীন দেবতা ওদের সাহায্য করার জন্যে ফিরে আসছে বলে কে নাকি গুজব ছড়াচ্ছে। আমাকে পাঠিয়েছেন কথাটা সত্যি কিনা যাচাই করার জন্যে।'

'প্রাচীন দেবতা! আতু-হুয়ার কথা বলছেন না তো আপনি?' উত্তেজনায় গলা কাঁপছে কিশোরের।

অবাক হয়ে তার দিকে তাকাল পিকো। 'তুমি জানলে কি করে?'

'আমাদের এখানে আসার কারণও ওই দেবতাই। আতু-হুয়ার খবর নিতে এসেছি আমরা। আপনার যদি জানা না থাকে, তাহলে জানাই, দেবতাটা সত্যি হাজির হয়েছে এখানে।'

'হয়েছে না ঘোড়ার ডিম!' মুখ বাঁকাল পিকো।

'কি বলতে চান?'

'ও যে এসেছে, কি করে জানলে?'

'নিজের চোখে দেখেছি। ইনডিয়ানদের কাছ থেকে কেড়ে এনেছি। সত্যি বলব? এখন, এই প্লেনেই আছে মূর্তিটা।'

'ভালমত দেখেছ?'

ভুরু কুঁচকে দীর্ঘ একটা মুহূর্ত পিকোর দিকে তাকিয়ে রইল কিশোর। ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে বলল, 'না, সময় পাইনি।' অদ্ভুত দৃষ্টি ফুটল তার চোখে। 'কেন বলুন তো?'

'ভালমত দেখে এসো। নিজেই বুঝতে পারবে।'

গেল না কিশোর। তাকিয়ে রইল পিকোর দিকে। তারপর তাকাল ওমরের দিকে।

ওর না যাওয়ার কারণ বুঝে ফেলল পিকো। হাসল, 'ভাবছ, ছুতোনাতা করে তোমাকে পাঠিয়ে, কোথায় আছে ওটা জেনে নিয়ে কেড়ে নেব? নেব না। নিশ্চিন্তে যাও।'

আবার ওমরের দিকে তাকাল কিশোর। নীরবে মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানাল ওমর। মূর্তিটা গিয়ে দেখে এল কিশোর। থমথমে হয়ে গেছে মুখ। 'ওটা নকল!'

'বুদ্ধিমান ছেলে। ঠিকই বুঝেছ,' পিকো বলল। 'কোন দামই নেই ওটার। না টাকায়, না ধর্মীয়ভাবে। অতি সাধারণ সাজিমাটি দিয়ে তৈরি। লাল কাঁচ কেটে বানানো চোখ।'

'আপনি জানলেন কি করে?' বলেই বুঝল কিশোর, বোকার মত প্রশ্ন করে ফেলেছে।

হেসে বলল পিকো, 'ভুলে যাচ্ছ, পাথর খোঁজা আমার কাজ। পাথর চিনি। নকল আর আসলের প্রভেদটা বুঝি। ইনডিয়ানরাও বোঝে। বিশেষ করে ওঝাটা। দেখে যত বোকা মনে হয় ততটা নয় সে। দেবতা যে নকল কি করে বুঝল সে, সে-ই জানে। নিশ্চয় বাপ-দাদার মুখে সে-ও শুনেছে, দেবতা খুব দামী পাথরে তৈরি। ওরা পর্বতের বাসিন্দা। পাথর না চেনার কথা নয়। তাই দেবতাকে ফিরে পেয়ে যখন দেখল, নকল, খেপে গেল ওরা। বহুকাল আগে একবার শ্বেতাঙ্গরা ঠকিয়েছিল ওদের পূর্বপুরুষদের, আবার ঠকল। বিশ্বাস পুরোপুরি উঠে গেল বিদেশীদের ওপর থেকে। আমাকেও শত্রু ভেবে আটকে ফেলার হুকুম দিল ওদের সর্দার।'

'হুঁ,' মাথা দুলিয়ে বলল কিশোর, 'এতক্ষণে আলো দেখা যাচ্ছে কিছু।' ওমরের দিকে তাকাল, 'আতু-হুয়ার নামটা শুনেও কেন প্রতিক্রিয়া হয়নি ওদের মধ্যে, বুঝলেন তো? নকল জিনিস নিয়ে কোন মাথাব্যথা ছিল না ওদের আর। আমার কথাকে পাত্তাই দেয়নি তাই, ভেবেছে আবার ভাঁওতা দেয়ার চেষ্টা করছি। ওরা ওটাকে নিয়ে এসেছিল ঠগবাজদের জিনিসের সঙ্গে সঙ্গে ওটাকেও পুড়িয়ে ধ্বংস করে ফেলার জন্যে। বিদেশী মানেই ওদের কাছে ঠগবাজ। মার্কোর ওপরও চড়াও হয়েছিল সে-কারণে। মেরে ফেলতে চেয়েছিল।'

'আমাকেও বলি দিত,' পিকো বলল। 'সকাল হলেই। বলাবলি করছিল, এখানে আরেকটা নরকের পাখি এসেছে, তাতে চড়ে আরও শয়তান বিদেশী এসেছে, সকাল হলে তাদেরও খতম করবে। বুঝে গেলাম, প্লেন নিয়ে এসেছে কেউ। সুযোগ বুঝে পালালাম।'

পনেরো

পিকোকে জানাল ওমর, 'আতু-হুয়ার শেষ দেখা পাওয়া গেছে আমেরিকার লস অ্যাঞ্জেলেসে। নিলামে কিনেছিলেন হুয়ান গনজালেস। স্যান্টিয়াগোর প্লেনে তুলে দিয়েছিলেন। প্লেনটা ওই মূর্তি সহ ধসে পড়ে...'

'বনের মধ্যে,' কথাটা শেষ করল পিকো, 'মালভূমির নিচে। জানি সব।'

'আসলটা কোথায় অনুমান করতে পারেন কিছু?'

'আমার মনে হয় গনজালেসের কাছেই আছে। প্লেনে দেয়া হয়নি। তিনি চান না এটা অন্য কারও মাধ্যমে ইনডিয়ানদের হাতে পড়ুক। দেখালে তিনি নিজেই দেখাবেন।'

'তাঁর কাছে আছে আপনি জানলেন কি করে?'

'তিনি নিজেই বলেছেন। তাঁর ভয়, মূর্তিটা অন্য কারও হাতে পড়লে ভয়ানক গোলমাল বাধিয়ে দেবে। আমাকে দুই হাজার এসকুডো দিয়ে বললেন, এখানে চলে আসতে, তাঁর নাম করে ইনডিয়ানদের বোঝাতে যে দেবতা আসছে। আর সেই দেবতা কোথায় আছে, শুধু আমি জানি। আর কারও কথা যেন ওরা বিশ্বাস না করে। তিনি জানেন, এই এলাকার ইনডিয়ানদের আমার মত কেউ চেনে না। আমি ওদের ভাষা বুঝি। আসার পর শুরুতে সব ঠিকই ছিল, কোন গোলমাল হয়নি। যা বলতে পাঠানো হয়েছিল আমাকে, বলেছি। আমাকে তো মহা খাতির করতে লাগল ওরা। তারপর অ্যাক্সিডেন্ট করল প্লেনটা। কাকতালীয়ভাবে নকল দেবতাকে পেয়ে গেল ওরা। মহা বিপদে পড়ে গেলাম আমি।'

'আপনি বিপদে পড়লেন কেন?'

'ওদের আমি বলেছি, দেবতা আসছে। কোথায় আছে ওটা আমি জানি। যখন পেয়ে গেল, ভাবল, এটার কথাই বুঝি বলেছি ওদের। ধরেই নিল, ফালতু জিনিস দিয়ে ধোঁকা দিতে চেয়েছি। ভয়ানক রেগে গেল ওঝা। মিথ্যেবাদী, ঠগ বলে গালাগাল করতে লাগল আমাকে। আমাকে আটকে ফেলার হুকুম দিল। কোনমতেই বোঝাতে পারলাম না, আসল মূর্তি আরেকটা আছে। যখন বুঝলাম, আর বলে কাজ হবে না, বহু কষ্টে পালিয়েছি। এই হলো আমার কাহিনী।'

মাথা ঝাঁকাল ওমর। 'আপনার কথা বিশ্বাস করলাম। আচ্ছা, ইনডিয়ানদের মাঝে কে গুজব ছড়িয়েছে, জানেন নাকি?'

এক সেকেন্ড চিন্তা করল পিকো। 'আমার তো একজনের কথাই মাথায় আসছে। সে-ই লোকও আমার মতই ইনডিয়ানদের চেনে, ওদের ভাষা বোঝে। এখানে বহুবার এসেছে। এদের সঙ্গে মেলামেশা করেছে। তার নাম মার্সেল ব্রিজাক।'

'মার্সেল ব্রিজাক!' মৃদু শিস দিয়ে উঠল ওমর। চট করে তাকাল কিশোরের দিকে। 'তা এই লোক, মার্সেল ব্রিজাক, আতু-হুয়ার আসার গুজব ছড়াতে গেল কেন ইনডিয়ানদের মাঝে?'

'তা বলতে পারব না। তবে ইনডিয়ানদের ব্যাপারে খুব আগ্রহী সে। স্যান্টিয়াগোতে থাকার সময় আমার সঙ্গেও কয়েকবার দেখা করেছে। আদিবাসীদের নিয়ে তার আগ্রহ আর কৌতূহলের সীমা নেই। রেলিক সংগ্রহ করে। প্রাচীন ধর্মীয় রেলিকেই তার আগ্রহ বেশি।'

'যেমন আতু-হুয়া?'

'হ্যাঁ।'

'আসলটা পেলে সুযোগমত বের করবে, তাই না? তার সুযোগমত?'

'হ্যাঁ। আর কিছু জানতে চান?'

'অনেক জানিয়েছেন। আপনার নিশ্চয় কষ্ট হচ্ছে। যান, ঘুমানোর চেষ্টা করুনগে। আমি একটু বাইরেটা দেখে আসি।'

ওমরের সঙ্গে সঙ্গে কিশোরও বেরিয়ে এল। আর ঘুম আসবে না।

বাইরে সব শান্ত। উঁকি দিচ্ছে কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ। মলিন করে দিয়েছে তারার উজ্জ্বলতাকে।

'পুরো ব্যাপারটাই আরও ঘোলাটে হয়ে গেছে,' ওমর বলল। 'মাথা-মুণ্ডু কিছু বুঝতে পারছি না আমি। আসল মূর্তিটা কার কাছে আছে?'

'হুয়ান গনজালেসের কাছে,' শান্তকণ্ঠে জবাব দিল কিশোর।

'কী!'

'এখন আর কোন সন্দেহ নেই আমার। মূর্তিটা গনজালেসের কাছেই আছে।'

'তাঁর বাড়িতে?'

'আর কোথায় থাকবে? আমেরিকা থেকে তো স্যান্টিয়াগোতে চলে এসেছেন তিনি।'

'তাহলে তদন্ত করার ব্যাপারে আগ্রহ দেখাবেন কেন? সত্যি, আমি কিছু বুঝতে পারছি না!'

'পারি কিনা আলোচনা করে দেখি,' মালভূমির কিনারে বনের ছায়ার দিকে কিশোরের নজর। নড়াচড়া আছে কিনা দেখছে, একই সঙ্গে কথা বলে যাচ্ছে। 'লস অ্যাঞ্জেলেসে মূর্তিটা যখন নিলামে ওঠে, তখন তিনজন লোক ছিল ওখানে, যাদের আগ্রহ ছিল স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি। গনজালেস, আলমাডো আর ব্রিজাক। তিনজনেই মূর্তিটা চাইছিল। আলমাডো কিনতে চেয়েও শেষ পর্যন্ত টাকার জোরে, কিংবা ইচ্ছার জোরে কুলিয়ে উঠতে পারেননি গনজালেসের সঙ্গে।'

'এত আগ্রহ কেন, সেটাই তো বুঝতে পারছি না,' সিগারেট বের করল ওমর।

'স্থানীয় ইনডিয়ানদের দলে নিয়ে ক্ষমতাশালী হওয়ার জন্যে। আমি শিওর, তিনজনেই ওঁরা পলিটিকসে আগ্রহী, কোন না কোনভাবে জড়িত। আতু-হুয়াকে হাতে পেয়েও স্বস্তি পাচ্ছিলেন না গনজালেস, তাঁর ভয় ছিল ওটাকে ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করবে অন্য দুজন। তিনি আমাকে বলেছেন অবশ্য, ব্রিজাককে বিশ্বাস করেন। কিন্তু আমার তা মনে হয় না। দুনিয়ার কাউকে বিশ্বাস করেন না তিনি। ধনী হতে পেরেছেন হয়তো সে-জন্যেই। তা ছাড়া ব্রিজাক তাঁর প্রতিপক্ষ। প্রতিপক্ষকে কখনোই বিশ্বাস করে না পলিটিশিয়ানরা। এঁদের তিনজনের কেউ কাউকে করেন না। গভীর কোন খেলা খেলছেন ওঁরা। মূর্তিটা কেনার পর গনজালেসের ভাবনা ছিল কিভাবে নিরাপদে সেটা বাড়ি পৌঁছানো যায়। দুই প্রতিপক্ষকে ধোঁকা দেয়ার ফন্দি করলেন তিনি। চলে গেলেন লস অ্যাঞ্জেলেসের কোন ভাস্করের দোকানে। সাধারণ একটা নকল বানিয়ে দিতে বললেন।'

'তিনিই বানিয়েছেন, এ ধারণা কেন হলো তোমার?'

'কারণ আসলটা একমাত্র তাঁর কাছেই ছিল। নকলটা দেখে আরেকটা বানানো যেত, কিন্তু ব্রিজাকের হাতে যখন পড়ল ওটা, বানানোর সময় ছিল না আর। রাস্তায়ও কোনখান থেকে বানানোর সুযোগ ছিল না তাঁর। না, নকলটা গনজালেসই বানিয়েছেন, লস অ্যাঞ্জেলেস থেকে। তারপর ব্রিজাককে মূর্তিটা স্যান্টিয়াগোতে পৌঁছে দেয়ার অনুরোধ করেছেন। ব্রিজাক নিতে রাজি হলে আসলটা নিজের কাছে রেখে তাকে নকলটা দিয়েছেন। ফাঁদে ফেলতে চেয়েছেন তাঁকে। যদি নকলটা নিয়ে গিয়ে ইনডিয়ানদের বোকা বানানোর চেষ্টা করেন ব্রিজাক, গনজালেস গিয়ে ওদেরকে আসলটা দেখিয়ে বোঝাবেন ব্রিজাক একটা মিথ্যেবাদী, ঠগ। ইনডিয়ানরা আর বিশ্বাস করবে না ব্রিজাককে। ওদের দলে টেনে ক্ষমতার আশা শেষ হয়ে যাবে তাঁর জন্যে। নকলটা নিয়ে চলে গেলেন ব্রিজাক। গনজালেস অপেক্ষা করতে লাগলেন সময়মত আসলটা নিয়ে বাড়ি যাওয়ার। বুঝতে পারছেন এখন?'

'পারছি,' কিশোরের সঙ্গে একমত হলো ওমর।

'বেশ। তারপর কি হলো, দেখা যাক। আলমাডো জেনে গেলেন, ব্রিজাক একটা প্যাকেট নিয়ে বাড়ি যাচ্ছেন। ওতে কি আছে অনুমান করতে কষ্ট হলো না তাঁর। উঠে পড়লেন একই প্লেনে। তারপর কি হয়েছে সহজেই অনুমান করা যায়। দুজনে পাশাপাশি বসেছিলেন। একজন আরেকজনকে চেনেন। কথা না বলে নিশ্চয় থাকেননি। মূর্তিটার ব্যাপারে আগ্রহী দুজনে। ওটা নিয়েও আলোচনা করেছেন। প্যাকেট খুলে দেখেছেন। নকল না চেনার মত বোকা নন একজনও। গনজালেস কোন্ খেলা খেলতে চেয়েছেন সেটাও বুঝেছেন। বুঝেই অযথা আর সময় নষ্ট করেননি আলমাডো। নেমে গেছেন বুয়েনস আয়ারেসে।'

'ব্রিজাককে একা ফেলে,' সিগারেটে জোরে টান দিল ওমর।

'এ ভাবে বোকা বনে গনজালেসের ওপর ভীষণ রেগে গেলেন ব্রিজাক। তিনিও শোধ তুলতে চাইলেন। এল লবিটোতে তেল নিতে নামবে প্লেনটা, জানেন। গনজালেসের খেলার অস্ত্রটাকে বুমেরাং বানিয়ে দিলেন। এমন কাজ করলেন, যাতে কোনদিন স্যান্টিয়াগোতে পৌঁছতে না পারে প্লেনটা। নকল মূর্তিটা প্লেনের মধ্যে নিরাপদ জায়গায় রেখে দিয়ে একটা বোমা তুলে দিলেন মার্কোর হতে। টাইম-বম্ব। সময় ঠিক করে দিলেন এমনভাবে, যাতে পর্বতের ওপরে ইনডিয়ানদের এলাকায় ফাটে। তারপর অসুস্থতার ছুতো করে তিনিও নেমে গেলেন প্লেন থেকে।'

'এইটা বুঝলাম না,' ওমর বলল। 'প্লেনটা ধ্বংস করে তাঁর কি লাভ?'

'লাভ আর কি? প্রতিশোধ নেয়াটাকেই অনেকে বিরাট লাভ মনে করে,' জবাব দিল কিশোর। 'তবে কারণ আরও আছে। প্লেনটা ধ্বংস হয়ে গেলে বীমার টাকা দাবি করবেন গনজালেস। আর করলেই বাগে পেয়ে যাবেন ব্রিজাক। হাটে হাঁড়ি ভেঙে ঠগবাজ প্রমাণ করে ছাড়বেন তাঁকে।'

'কিভাবে?'

'তিনি জানিয়ে দেবেন, তাঁকে নকল মূর্তি দেয়া হয়েছিল। সাক্ষী মানবেন আলমাডোকে। কোম্পানি প্লেনটা খুঁজে বের করার জন্যে সর্বশক্তি নিয়োগ করবে তখন। পেয়ে যাবে নকল মূর্তিটা। কেস ঠুকে দেবে গনজালেসের নামে। অভিযোগ করবে, আসলটা রেখে নকল মূর্তি পাচার করে টাকা আদায়ের ফন্দি করেছেন গনজালেস। টাকা তো দেবেই না, ঠগবাজীর মামলা করবে তাঁর বিরুদ্ধে। টাকা যদি তিনি দাবি না-ও করতে যান, চিরকাল আসল মূর্তিটা লুকিয়ে রাখতে হবে গনজালেসকে। বের করলেই বিপদে পড়বেন। গাঁটের টাকা খরচ করে জিনিস কিনে সেই জিনিসের জন্যে নিজেই চোর হয়ে থাকবেন। এঁদের মত মানুষ এমন ছল-চাতুরির আশ্রয় নিয়েছেন, বিশ্বাস করা কঠিন। কিন্তু পলিটিকস বলে কথা। রাজনীতিতে কিছু কিছু রাজনীতিকের জন্যে সব কিছুই যেন জায়েজ। একেবারে অন্ধ হয়ে যান।'

'ছেঁচড়ামি!' তিক্তকণ্ঠে বলল ওমর।

'অথচ, এমনিতে গিয়ে দেখুন, রীতিমত ভদ্রলোক একেকজন, সৎ, দেশপ্রেমিক–তিনজনের কাউকেই খারাপ বলতে পারবেন না। যেই রাজনীতি যুক্ত হলো, অমনি সব শেষ। কিন্তু রাজনীতিটাও নিজের জন্যে করেন না। চান, দেশের ভাল হোক। কেবল মতবাদ আলাদা বলেই এই ঠেলাঠেলি।'

'কি করে ভাল বলছ? মানুষ খুন করতে চেয়েছিলেন ব্রিজাক! মারা যেতে পারত প্লেনের ক্রুরা।'

'তাতে কি? তিনি বলবেন বৃহত্তর স্বার্থে ক্ষুদ্রতর স্বার্থ বিসর্জন দিতেই হয়। ক্ষমতা হাতে পাওয়ার চিন্তা মাথায় ঢুকে গেলে কোন কিছুকেই আর পরোয়া করে না মানুষ। গণবিদ্রোহ হলে মারা যায় শয়ে শয়ে হাজারে হাজারে সাধারণ নিরীহ মানুষ, তাই বলে কি বিদ্রোহ থেমে থাকবে? লড়াই হবে না? কোনকালে বন্ধ থাকেনি, আজও থাকবে না, ভবিষ্যতেও থাকবে না; মানুষ যতদিন টিকে থাকে এ সব করেই যাবে।'

'তারমানে,' কঠিন হয়ে উঠল ওমরের কণ্ঠ, 'চিঠিতে হুমকি দিয়ে, গুণ্ডা লাগিয়ে আমাদের ঠেকাতে চেয়েছেন গনজালেসই; কারণ তিনি ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন নকল মূর্তিটা আমরা বের করে ফেলতে পারি।'

'না। আমাদের ঠেকাতে চেয়েছেন ব্রিজাক। তিনি চাননি, গনজালেস বীমার টাকা দাবি করার আগেই নকল মূর্তিটা বেরিয়ে যাক। তাহলে আর প্রতিশোধ নেয়া হত না গনজালেসের ওপর, তাঁকে ঠগবাজ প্রমাণ করা হত না।'

'হুঁ,' সিগারেটে শেষ টান দিয়ে পোড়া টুকরোটা মাটিতে ফেলে দিল ওমর। জুতোর গোড়ালি দিয়ে পিষে মারল। 'তিনজনেই তো বাড়ি পৌঁছে গেছে। এখন আমাদের কাজটা কি?'

'কি করা যায়, স্যান্টিয়াগোতে ফেরার পথে ভাবব। এটা তাঁদের দেশের পলিটিকস, পরস্পরের প্রতি কি আচরণ করবেন সেটা নিজেদের ব্যাপার, এ নিয়ে আমি মাথা ঘামাতে যাচ্ছি না। বীমা কোম্পানি তাদের টাকা মওকুফ করার দায়িত্ব দিয়েছে আমাদের, সেটা করতে পারলেই হলো।'

'সেটাই তো জানতে চাই, কি করে?'

'গনজালেসের মুখোমুখি হতে হবে, আর কোন উপায় নেই। তাঁর মুখ থেকে বের করতে হবে সমস্ত কথা। সব কিছুর মূলে তিনি। তিনি শুরু করেছেন, শেষটাও তাঁকেই করতে হবে। বলব, নকল মূর্তিটা পেয়ে গেছি আমরা। এখন কি করতে চান, তাঁকেই জিজ্ঞেস করব।' আকাশের দিকে মুখ তুলল কিশোর। 'ওই যে, এসে গেছে আগামীকাল। আধ ঘণ্টার মধ্যে অন্ধকার কেটে যাবে, রওনা হতে পারব আমরা।'

'কিন্তু কিছু শুনতে পাচ্ছ?' কান পেতে আছে ওমর। বনের দিকে চোখ।

এতক্ষণ কথায় মন ছিল বলে শুনতে পায়নি, এখন কিশোরেরও কানে এল। লক্ষ মৌমাছির গুঞ্জনের মত শব্দ।

'আবার বোধহয় ইনডিয়ানরা,' ওমর বলল। 'এদিকেই আসছে।'

'কিন্তু এখনও তো অন্ধকার। প্লেন তো ওড়াতে পারবেন না।'

'বেশি বিপদ দেখলে সেই চেষ্টাই করব। ওদের হাতে পড়ার চেয়ে প্লেন ক্র্যাশ করে মরা ভাল। গাঁয়ের লোক নিশ্চয় সব ঝেঁটিয়ে চলে এসেছে এখন। এত লোকের সঙ্গে লড়াই করে পারব না। ওরা আসতে আসতে অন্ধকার আরেকটু কেটে যাবে। চলো, জলদি।'

কেবিনে ঢুকে অন্য তিনজনকে জাগাল ওরা। জানাল ইনডিয়ানদের আসার কথা। শুনে তিনজনেই আতঙ্কিত হয়ে পড়ল। মার্কো আর পিকো ভাল করেই জানে, ওদের হাতে পড়লে কি ঘটবে।

ওড়ানোর জন্যে তৈরি করেই রাখা আছে বিমান। আলো থাকলে ওড়ানো কোন ব্যাপারই হত না। কিশোরকে বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে বলল ওমর। বলল, ইনডিয়ানদের দেখার সঙ্গে সঙ্গে যেন জানায়। বিমানটা দেখে যদি দাঁড়িয়ে যায় ওরা, তাহলে অতি মূল্যবান কয়েকটা মুহূর্ত হাতে পাওয়া যাবে। আর না থেমে যদি ছুটে আসে দেরি না করে যেন প্লেনে এসে ওঠে কিশোর। অন্ধকার থাক আর যা-ই থাক, ওড়ানোর চেষ্টা করবে ওমর।

কিশোর বেরিয়ে গেল। কেবিনের সবাইকে শক্ত হয়ে বসতে বলল ওমর। এবড়ো-খেবড়ো মাটি। প্রচণ্ড ঝাঁকি লাগার সম্ভাবনা। ককপিটে এসে বসল সে। গরম করার জন্যে চালু করে দিল ইঞ্জিন। জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। বাঁয়ের চূড়াটা অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ডানে মালভূমির কিনারটা যেখানে শেষ হয়েছে তারপর থেকে শুধুই শূন্যতা।

এগিয়ে আসতে আসতে হঠাৎ করে থেমে গেল ইনডিয়ানদের কোলাহল। নিশ্চয় প্লেনটা দেখে দাঁড়িয়ে গেছে ওরা। তাকিয়ে আছে এটার দিকে।

তবে নীরবতা বেশিক্ষণ বজায় থাকল না। সমস্বরে চিৎকার করে উঠল ওরা। আগের চেয়ে জোরে।

লাফ দিয়ে এসে প্লেনে উঠল কিশোর। চেঁচিয়ে বলল, 'ওমরভাই, ছাড়ুন!' দরজাটা লাগিয়ে দিয়ে ওমরের পাশে এসে বসে পড়ল। 'একেবারে কাছে চলে এসেছে!'

'সীট-বেল্ট বেঁধে শক্ত হয়ে বসে থাকো,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল ওমর। সহজ ভঙ্গিতে খুলে দিল থ্রটল। এগোতে শুরু করল বিমান। শতগুণে বেড়ে গেল

ইনডিয়ানদের হট্টগোল।

গতি বাড়ছে বিমানের।

সামনের দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর। মালভূমির কিনারে মাটি যেখানে শেষ হয়ে গেছে, সে-জায়গাটা ঘন অন্ধকারে ঢেকে রয়েছে এখনও। মনে মনে প্রার্থনা করছে সে; খোদা, ওখানে পৌঁছতে পৌঁছতে যেন গতি বেড়ে যায় প্লেনের, উঠে পড়তে পারে। পরের একটা মিনিটে যে কি সব ঘটে গেল, পুরোপুরি খেয়াল রাখতে পারল না। উঁচু-নিচু মাটিতে প্রচণ্ড ঝাঁকি খেতে খেতে চলেছে বিমান। তবে লেজটা উঁচু হয়ে যেতেই ঝাঁকি কমে গেল।

সরাসরি এগোনোর চেষ্টা করছে ওমর। এগোচ্ছিল ঠিকমতই, হঠাৎ এক চাকায় শক্ত কোন কিছুতে–বোধহয় পাথর-টাথরেই হবে, বাড়ি লেগে নাকটা ঘুরে গেল ডানের হাঁ করে থাকা খাদের দিকে। সামলানোর সময় নেই। ঘুরিয়ে যে আবার ঠিকপথে নিয়ে আসবে, সেটা সম্ভব নয়। গতি গেছে বেড়ে। তীব্র গতিতে ছুটতে লাগল। ঝাঁপ দিয়ে পড়ল খাদের কুয়াশায় ঘেরা ছায়াঢাকা রহস্যময়তার মধ্যে।

ইঞ্জিন বন্ধ করে দিল ওমর।

কথা বলল না কিশোর। হাত দিয়ে চোখও ঢাকল না। তাকিয়ে আছে বোবা হয়ে। অনিবার্য মৃত্যুর কথাও ভাবছে না। শুধু ভাবছে, ধাক্কাটা কি খুব জোরে লাগবে?

কিন্তু এল না ধাক্কাটা। ইঞ্জিনের শব্দে নয়, সীটের সোজা হওয়া অনুভব করে বুঝতে পারল কিশোর, আবার ইঞ্জিন চালু করে দিয়েছে ওমর। নাকটা উঁচু হতে শুরু করেছে বিমানের।

সামনের দিকে ঝুঁকে গিয়েছিল নাক। সোজা হতে লাগল। সমান্তরাল হলো। ঘন কুয়াশার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে ওমরের দিকে তাকানোর সুযোগ পেল কিশোর।

শক্ত হয়ে বসে আছে ওমর। ধীরে ধীরে ওপরে তুলছে প্লেনটাকে। খাদটা কতখানি গভীর, দেখার সুযোগ পায়নি একবারও; তবে সেদিন ল্যান্ড করার আগে একটা ব্যাপার লক্ষ করেছিল, খাদটা বেশ চওড়া। ডানায় বাড়ি না লাগিয়েও উড়তে পারবে বিমান।

'খুন করবেন নাকি!' চেপে রাখা দমটা ফোঁস করে ছেড়ে দিয়ে বলল কিশোর।

'এখনও সময় আছে, এত তাড়াতাড়ি মরবে না,' জবাব দিল ওমর। শুকনো, খসখসে হয়ে গেছে কণ্ঠটা। ওপরে-নিচে, ডানে-বাঁয়ে চঞ্চল হয়ে ঘুরছে দৃষ্টি। 'খাদটা অনেক গভীর, সন্দেহ নেই। চওড়াও অনেক। ওড়ানোর জায়গা পাব।'

ঠিকই বলেছে সে। ওপরে উঠছে আর শক্তি বাড়ছে বিমানের। বাতাসে চাপ বসাতে পারছে প্রপেলারগুলো। কুয়াশার ভেতর থেকে আচমকা লাফ দিয়ে বেরিয়ে এল যেন রোদে উজ্জ্বল নীল আকাশের নিচে।

নিঃশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে এল কিশোরের।

'কেবিনের অবস্থা গিয়ে দেখে এসো,' ওমর বলল।

দেখে ফিরে এসে জানাল কিশোর, 'ভালই আছে ওরা। তবে আতঙ্কের ধাক্কাটা সামলাতে পারেনি এখনও।'

'ওদের আর কি দোষ দেব,' ওমর বলল, 'আমি নিজেই পারিনি।'

উঠেই চলেছে বিমান। সামনে মাথা তুলে আছে বিশাল পর্বতের তুষারে-ছাওয়া চূড়া। তবে আর ভয় নেই। নিরাপদেই পর্বতের ভেতর থেকে বেরিয়ে যেতে পারবে ওরা।

আধঘণ্টা পর কোমল, উষ্ণ বাতাসের মধ্যে এসে পড়ল বিমান। বেরিয়ে এল পর্বতের ভেতর থেকে। সহজ ভঙ্গিতে উড়ে চলল ঘন বনে ছাওয়া উপত্যকার ওপর দিয়ে, লস সেরিলোর বিমান ঘাঁটির দিকে। কিশোরকে হাল ধরতে বলে, উঠে মিনিটখানেকের জন্যে কেবিনে চলে এল ওমর। মার্কো আর গিজেলকে বলল, 'তোমাদের কাছে একটা অনুরোধ আছে আমার। স্যান্টিয়াগোতে নেমে নিশ্চিন্তে বাড়ি চলে যেয়ো তোমরা। কিন্তু এখানে যা যা ঘটেছে, কাল দুপুরের আগে কাউকে বোলো না। অফিশিয়ালি রিপোর্ট তো করতেই হবে। তা করবে। আমার কোন আপত্তি নেই। তবে পরে। আমাদের একটা জরুরী কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার পর।' ককপিটে ফিরে এল আবার সে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই দেখা গেল বিমান ঘাঁটি। তৈরি হলো নামার জন্যে।

ষোলো

হোটেলে ফিরে, গোসল সেরে, নাস্তা খেয়ে খানিকক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে নিল কিশোর। তারপর উঠে কাপড় বদলাল। ওমর তখনও বিছানায়। তাকে বলল, 'ওমরভাই, আমি একবার গনজালেসের বাড়ি থেকে ঘুরে আসি।'

'আজকেই?'

'এখনই। কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করা যাবে না। কাল তিনি না-ও থাকতে পারেন এখানে। প্লেনটা যে খুঁজে পেয়েছি আমরা, এ খবর জানাজানি হয়ে গেলে—আর আমার ধারণা তা হবেই, কেটে পড়াটাই ভাল মনে করবেন তিনি। এদিকের উত্তেজনা শান্ত হয়ে না আসা পর্যন্ত আর ফিরবেন না। আপনার কথামত আজকের দিনটা রিপোর্ট করতে যাবে না গিজেল আর মার্কো, কাল যাবেই। খবরের কাগজে ছাপা হবে। এ সব ঘটে যাওয়ার আগেই গিয়ে গনজালেসের মুখোমুখি হতে চাই আমি।'

'কি করতে চাও?'

'লিখিত আনতে চাই, যে তাঁর কাছেই আছে এখন আতু-হুয়া, কিংবা কোথায় আছে জানেন তিনি। সেটা আমাদের পকেটে থাকলে কোনদিনই আর টাকা দাবি করে দরখাস্ত করতে পারবেন না বীমা কোম্পানির কাছে। টাকা দাবি না করলে বীমা কোম্পানিও আগ বাড়িয়ে কিছু করতে যাবে না। যত তাড়াতাড়ি

সম্ভব এখন কাজ সেরে বাড়ি রওনা হওয়া উচিত আমাদের, এখানে পরিস্থিতি গরম হয়ে যাওয়ার আগেই। ওদের দেশীয় রাজনীতিতে জড়াতে চাই না আমি। যদি কোনভাবে একবার অফিশিয়াল তদন্ত শুরু হয়ে যায় এখানে, আর সেটাকে ঠেকানোর মত ক্ষমতা না থাকে গনজালেসের, তাহলে কতদিন ধরে মামলা চলবে কোন ঠিক-ঠিকানা নেই, কয়েক মাস ধরেও চলতে পারে। সাক্ষী হিসেবে আটকে রেখে দেবে আমাদের। তারচেয়ে আমরা পালাই, গনজালেস, আলমান্ডো আর ব্রিজাক মারামারি করে নিজেরা নিজেরা সব ঠিক করে নিক গিয়ে।...তাড়াতাড়ি করাটাই উচিত আমাদের, না কি বলেন?'

'চলো, যাচ্ছি,' উঠে পড়ল ওমর।

'না, আপনি থাকুন। তিনজনের কাউকেই এখন বিশ্বাস নেই। যদি কিছু করে বসে, পালানোর পথটা খোলা রাখতে চাই। বিশেষ করে গনজালেস। এমন হতে পারে, আমার কথায় লিখিত দিতে রাজি না হয়ে যে জিনিসটা তাঁর জন্যে বিপজ্জনক, সেই মূর্তিটাই কেড়ে নেয়ার চেষ্টা করতে পারেন তিনি। বড় জোর তিন ঘণ্টা অপেক্ষা করবেন আমার জন্যে। এর মধ্যে যদি না ফিরি, সোজা প্লেন নিয়ে রওনা হয়ে যাবেন। দেশে ফিরে গিয়ে মূর্তিটা বীমা কোম্পানির হাতে তুলে দিয়ে যা ব্যবস্থা হয় করবেন। তবে মনে হয় না আমাকে খুন করবেন গনজালেস, তাতে তাঁর কোন লাভ নেই, বরং আটকে ফেলে আপনাকে ব্ল্যাকমেল করার চেষ্টা চালাবেন। মোটেও সে-সুযোগ দেবেন না তাঁকে। আমাকে উদ্ধারের চেষ্টা পরেও করতে পারবেন, কিন্তু সবার আগে প্রমাণ সরিয়ে ফেলতে হবে। আমি বেরোলে এখন গিয়ে প্লেনের ট্যাংকে তেল ভরে ফেলবেন। হোটেলে ফিরে অপেক্ষা করবেন আমার জন্যে।'

হাসল ওমর। 'মাথা খারাপ নাকি তোমার? তুমি একলা এই ভয়ানক বিপদের মধ্যে যাবে, আর আমি বসে বসে গাঁজায় দম দেব? বরং তুমি থাকো, আমি যাচ্ছি। আমি ফিরে না এলে প্লেন নিয়ে চলে যেয়ো। মিস্টার সাইমনকে গিয়ে সব জানালে আমাকে উদ্ধারের ব্যবস্থা তিনি করবেন।'

'কিন্তু, ওমরভাই...'

'আরও একটা কথা তুমি মাথায় আনছ না। ছেলেমানুষ ভেবে তোমাকে পাত্তাই দেবেন না গনজালেস। আমার ধমকে কাজ হতে পারে।...কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। তুমি থাকো।'

তৈরি হয়ে বেরিয়ে এল ওমর। ট্যাক্সি ডেকে গনজালেসের ঠিকানায় যেতে বলল। বাড়ির সামনে এসে ড্রাইভারকে অপেক্ষা করতে বলে এগিয়ে গেল গেটের কাছে। দারোয়ানকে তার নাম জানিয়ে গনজালেসের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিতে অনুরোধ করল। জানানোর সঙ্গে সঙ্গে এক মুহূর্তও দেরি না করে বাড়ির ভেতর পাঠিয়ে দেয়া হলো তাকে। পৌঁছে দেয়া হলো দামী স্প্যানিশ অ্যানটিক আসবাবে সাজানো একটা ঘরে। এগিয়ে এসে স্বাগত জানালেন গনজালেস স্বয়ং। ভাব-ভঙ্গিতেই বোঝা গেল, দুঃসংবাদটা এখনও পৌঁছেনি তাঁর কানে।

'কি সাংঘাতিক, মিস্টার ওমর যে! আমার বাড়িতে কি মনে করে? আসুন,

আসুন,' হেসে হাত বাড়িয়ে দিলেন তিনি। 'দেখা করতে এসেছেন, খুব খুশি হলাম। কি খাবেন, বলুন?'

'কিছু না,' হেসে জবাব দিল ওমর। 'হোটেল থেকে খেয়েই এসেছি।'

'অ। ঠিক আছে, বসুন। তারপর? কি খবর?'

'খবরটা শুনলে আপনি খুশি হবেন না, স্যার।'

বদলে গেল গনজালেসের মুখের ভাব। 'তাই? প্লেনটা পেয়ে গেছেন নাকি?'

'হ্যাঁ। সেনর ব্রিজাকের কাছে যে নকল আতু-হুয়াকে দিয়েছিলেন, সেটাও পেয়েছি।' অনেকটা অন্ধকারেই ঢিল ছুঁড়ল ওমর। নকল জিনিসটা তিনিই দিয়েছিলেন, এটা কিশোরের অনুমান, সত্যি না-ও হতে পারে–যদিও এ সব ক্ষেত্রে ভুল সাধারণত করে না কিশোর। কিন্তু গনজালেসের মুখ দেখেই বুঝে গেল ওমর, তার অনুমান ভুল হয়নি।

ভ্রূকুটি করলেন গনজালেস। 'নকল মানে? বুঝলাম না, কি বলছেন!'

'সেনর গনজালেস,' শান্তকণ্ঠে বলল ওমর, 'আপনাকে এখনও আমি ভদ্রলোক মনে করি। এখনও যদি মিথ্যে বলা চালিয়ে যান, সত্যি বলছি, আমি দুঃখ পাব। ব্রিজাককে যে মূর্তিটা দিয়েছিলেন আপনি, সেটা নকল।'

'কি করে বুঝলেন?'

'খুঁজে পেয়ে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি ওটা।'

বসে পড়লেন গনজালেস। 'কোথায় পেলেন?'

'আমি কোথায় পেয়েছি, সেটা বড় কথা নয়। তবে মূর্তিটা কোথায় ছিল, তা বলতে পারি–ধসে পড়া প্লেনটার মধ্যে। কেউ একজন বোমা রেখে ধ্বংস করে দিতে চেয়েছিল প্লেনটা।'

'আমি বোমা রাখিনি,' তাড়াতাড়ি বললেন গনজালেস।

'আপনি রেখেছেন বলিওনি। তবে কেউ একজন তো রেখেছেই। তাতে কয়েকজন লোকের প্রাণ গেছে মনে করা হচ্ছে। সরাসরি না হলেও আপনিও এর জন্যে দায়ী।'

উঠে গিয়ে দুটো গ্লাসে ড্রিংক ঢেলে আনলেন গনজালেস। একটা বাড়িয়ে দিলেন ওমরের দিকে। হাতটা কাঁপছে, লক্ষ করল ওমর। মাথা নাড়ল। 'খাই না বলব না। তবে এখন ইচ্ছে করছে না। থ্যাংক ইউ।'

গ্লাসে ঘন ঘন কয়েকবার চুমুক দিয়ে ওমরের দিকে তাকালেন গনজালেস, 'তাহলে কি করতে চান এখন?'

'সেটা আপনার ওপর নির্ভর করে।'

'কি করতে হবে আমাকে?'

'আপনার কাছে কি এখনও আসল মূর্তিটা আছে?'

আবার উঠে দাঁড়ালেন গনজালেস। 'দেখুন, মিস্টার ওমর–আপনার কাছে যে আমি এখনও ভদ্রলোক আছি, এই যথেষ্ট। আপনার কাছে আর আমি ছোট হতে চাই না। কিন্তু ঘটনাটা জানাজানি হয়ে গেলে ইজ্জত থাকবে না আমার। আপনি কি এ ব্যাপারে সাহায্য করতে পারবেন আমাকে?'

'কি করতে হবে, বলুন? অন্যায় কোন আবদার না হলে সাহায্য করব।'

'আমার কাছে মূর্তিটা আছে জানলে কেলেঙ্কারি কাণ্ড হয়ে যাবে। দেশের মানুষের কাছে আর মুখ দেখাতে পারব না আমি। যদি কিছু মনে না করেন, আপনার সঙ্গে তো একটা রফা...'

'দুঃখিত,' গম্ভীর হয়ে মাথা নাড়ল ওমর, 'ভুল লোকের কাছে ভুল প্রস্তাব দিচ্ছেন আপনি। আমার কথার জবাব কিন্তু দেননি এখনও।'

'কি?'

'মূর্তিটা কোথায়?'

'স্বীকার তো করলামই, আমার কাছে।'

'কোথায়?'

'এ বাড়িতেই।'

'এটাই জানতে চেয়েছিলাম। আমার ইচ্ছেটা পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিচ্ছি। কোন গোলমালের মধ্যে যেতে চাই না আমি। আপনার মত একজন মানুষ কেন এত ছোট একটা কাজ করতে গিয়েছিলেন, সেটা আপনি জানেন। আমি জানতে চাই না। আমি শুধু একটা জিনিসই দেখব, বীমা কোম্পানিকে যাতে টাকা গচ্চা দিতে না হয়। এর বেশি আর কিছু চাই না আমি।'

'আমাকে কি করতে বলেন?'

'আমার কাছে আতু-হুয়ার আসল মূর্তিটা আছে–শুধু এ কথাটা একটা কাগজে লিখে সই করে দিলেই চলবে। তাতে যদি কোন কারণে কখনও টাকা দাবি করেও বসেন আপনি, কোম্পানি আপনাকে কাগজটা দেখিয়ে দিতে পারবে।'

'যদি লিখে না দিই?'

'নকল মূর্তিটা দিয়ে দেব বীমা কোম্পানিকে। জোচ্চুরি করে তাদের ঠকাতে চেয়েছেন এই অভিযোগে আদালতে নালিশ করে দেবে ওরা। তাতে আপনার কেলেঙ্কারির বোঝা বাড়বেই শুধু।'

'কিন্তু আমি এখনও টাকা দাবি করিনি...'

'করতেও পারেন, এই অভিযোগে আগাম নালিশ করে রাখবে। তাতেও ইজ্জত বাঁচবে না আপনার। খবরের কাগজওলারা সর্বনাশ করে ছাড়বে। দেশে তো দূরের কথা, বিদেশেও টিকতে দেবে না আপনাকে।' কথাগুলো বলে মনে মনে নিজেই অবাক হলো ওমর। এত সহজ হুমকিতে কি নরম হবেন গনজালেসের মত লোক? যদি বলে বসেন–'আমিই যে নকল মূর্তিটা ব্রিজাককে দিয়েছি, তার প্রমাণ কি? বরং শয়তানি করে নকল মূর্তি দিয়ে সে-ই এখন আমাকে ফাঁদে ফেলতে চাইছে।' কোন জবাব থাকবে না ওমরের। কিন্তু অপরাধ করে ধরা পড়ে যাবার পর সঙ্গে সঙ্গে মানুষ স্বাভাবিক চিন্তা করতে পারে না। তা ছাড়া গনজালেসকে এখনও সত্যি সত্যি ভদ্রলোক ভাবে সে। আর কোন জটিলতা কিংবা অন্যায়ের মধ্যে তিনি হয়তো যেতে চাইবেন না। শুধু এটুকুর ওপর ভরসা করে অপেক্ষা করতে লাগল সে।

এক মুহূর্ত ভাবলেন গনজালেস। তারপর বললেন, 'লিখিত দিলে যে সেটা

আপনি পত্রিকায় ছেপে দেবেন না, তার কি গ্যারান্টি আছে...'

'কোন গ্যারান্টি নেই। আমার মুখের কথাই বিশ্বাস করতে হবে আপনাকে। লিখিত না দিলে সব জানিয়ে দিতে বাধ্য হব আমি। ও, আরও কয়েকটা কথা জানানো দরকার আপনাকে। একজন লোককে উদ্ধার করে নিয়ে এসেছি আমি। ইনডিয়ানরা ধরে আটকে রেখেছিল। নাম বললে চিনবেন। কাজনান পিকো। টাকা দিয়ে আপনিই নাকি তাকে পাঠিয়েছিলেন ইনডিয়ানদের গিয়ে কিছু বিশেষ কথা বোঝানোর জন্যে। প্লেনের বেঁচে যাওয়া দুজন ক্রুকেও নিয়ে এসেছি আমি। একজন রেডিও অপারেটর, আরেকজন এয়ার হোস্টেস। কি কি ঘটেছে, ওরা আপনাকে বলতে পারবে। ওদের সঙ্গে একটা রফা করে নেবেন। সমস্যা আরও আছে। প্লেনের পাইলট আর তার সেকেন্ড অফিসার এখনও নিখোঁজ।'

এ সব শোনার পরেও দ্বিধা করতে লাগলেন গনজালেস। 'আপনি কি থাকছেন এখানে?'

'লিখিত কাগজটা পেলেই চলে যাব আমি। বারো ঘণ্টার মধ্যে এ দেশ ত্যাগ করব।'

এটাই শুনতে চেয়েছিলেন বোধহয় গনজালেস। আর দ্বিধা করলেন না। লেখার টেবিলে গিয়ে বসে কলম তুলে নিলেন। 'বলুন, কি লিখতে হবে?'

'ওই যে বললাম তখন...'

'আবার বলুন।'

ওমর বলে গেল, 'আমি, চিলির স্যান্টিয়াগোর ডন পিজমো হুয়ান গনজালেস এই মর্মে স্বীকারোক্তি দিচ্ছি যে আসল পান্নার দেবমূর্তি আতু-হুয়া, যেটাকে আমি হারিয়ে গিয়েছিল ভেবেছিলাম, সেটা পাওয়া গেছে এবং বর্তমানে আমার কাছেই আছে। অতএব মূর্তিটার জন্যে বীমা কোম্পানির কাছে আমার কোন দাবি নেই।'

লেখা শেষ করে মুখ তুললেন গনজালেস।

'লিখেছেন?' ওমর বলল। 'ঠিক আছে, সই করে সীল মেরে দিন।'

সই করলেন গনজালেস। সীল দিলেন। তারপর কাগজটা ভাঁজ করে বাড়িয়ে দিলেন ওমরের দিকে।

কাগজটা খুলে পড়ল ওমর। দেখল, ঠিকমত লেখা হয়েছে কিনা। আবার ভাঁজ করে সেটা পকেটে রাখতে রাখতে বলল, 'থ্যাংক ইউ, সেনর গনজালেস। আপনি যে ভদ্রলোক, আমার এ ধারণার কোন পরিবর্তন হলো না। আমার জিনিস পেয়ে গেছি। আর আপনাকে বিরক্ত করব না। চলি।'

'মিস্টার ওমর, পুরো ব্যাপারটার জন্যেই আমি দুঃখিত,' লজ্জিত কণ্ঠে বললেন গনজালেস। 'আমি আসলে কারও কোন ক্ষতি করতে চাইনি। এ কাজটা করেছিলাম দেশের ভাল হবে ভেবেই। ব্রিজাক বা আলমান্ডো যাতে ক্ষমতা হাতে না পায়, সেজন্যে। ইনডিয়ানদের খেপিয়ে তুললে অহেতুক একটা গোলমাল হবে, বিদ্রোহ হবে, কিছু কিছু রাজনীতিবিদ নিজেদের জন্যে ফায়দা লুটবে। কিন্তু যে ভাবে ভালটা করতে চেয়েছিলাম, সেটা ভুল পথ,

পরিষ্কার বুঝতে পারছি আমি এখন।'

'সবাই আমরা ভুল করি, সেনর গনজালেস; হাজার হোক, মানুষ তো,' সহানুভূতির সুরে বলে দরজার দিকে এগোল ওমর। দরজার কাছে গিয়ে ফিরে তাকিয়ে বলল, 'গুড নাইট, স্যার।'

'গুড নাইট, মিস্টার ওমর।'

ট্যাক্সিওয়ালা যায়নি। ওমরের জন্যে বসে আছে। হোটেলে ফিরে এল ওমর।

উদ্বিগ্ন হয়ে অপেক্ষা করছিল কিশোর। ওমরকে দেখেই বলে উঠল, 'কাজ হলো?'

'হ্যাঁ,' হাসিমুখে জবাব দিল ওমর। 'কোনই সমস্যা হয়নি। তুমি ঠিকই বলেছ, লোক খারাপ নন তিনি। যাই হোক, কাল ভোরেই রওনা হচ্ছি আমরা।'

*

বিমান বন্দর ত্যাগ করতে কোন অসুবিধে হলো না। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল ওমর। ভয় ছিল, ওদেরকে যেতে বাধা দেবেন গনজালেস। তাঁর মত ক্ষমতাশালী একজন মানুষ লোক লাগিয়ে প্লেনটা ধ্বংস করে দিতে পারতেন অনায়াসে, কিংবা ওদেরকে ঠেকানোর চেষ্টা করতে পারতেন, মূর্তিটা কেড়ে নিয়ে সাক্ষী-প্রমাণ সব ধ্বংস করে দিতে পারতেন চিরকালের জন্যে; করেননি। তারমানে আর কোন গণ্ডগোল করার ইচ্ছে নেই তাঁর। ভুল একবারই করেছেন।

ঝলমলে রোদ। ক্রমশ ওপরে উঠছে মারলিন। নিচে আর্জেন্টিনার বিস্তীর্ণ তৃণভূমি, সামনে আকাশ-ছোঁয়া পর্বতমালা। পেরোতে হলে আরও ওপরে উঠতে হবে।

*

আমেরিকায় ফিরে বেশ কিছুদিন চিলির খবর শোনার জন্যে উদগ্রীব হয়ে রইল কিশোর। কিন্তু চিলিতে বা আশেপাশের কোন অঞ্চলে কোন বিদ্রোহের খবর শোনা গেল না। সবুজ দেবতাকে ঘিরে কোন গণ্ডগোল সৃষ্টি হলো না ইনডিয়ানদের মধ্যে। কিংবা হলেও সেটা নিজেদের ঘরোয়া ব্যাপার বলে চেপে গেল চিলির সরকার, অন্য দেশের প্রেসকে জানতে দিল না।

কয়েক হপ্তা পরে একটা চিঠি এল তিন গোয়েন্দার ঠিকানায়। গিজেল লিখেছে। দুটো সুসংবাদ আছে। এক, সেই দুজন পাইলট পর্বতে নিখোঁজ হয়ে যায়নি, শেষ পর্যন্ত ফিরে এসেছে আর্জেন্টিনায়। দুই, মার্কোকে বিয়ে করছে সে। দাওয়াত দিয়েছে তিন গোয়েন্দা আর সেনর ওমরকে।

***

নিখোঁজ সংবাদ

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৯

'কিন্তু আমার তো একেবারেই সময় নেই!'

টেলিফোনে রবিনের আম্মাকে বলতে শুনল তিন গোয়েন্দা।

'লস অ্যাঞ্জেলেস থেকে আসাটা কি কোন সমস্যা হলো নাকি?...ট্রেনে আসবে, ভাল কথা, আসুক; উঠে পড়লেই হলো। দুনিয়ার কেউ কি আর একা একা ট্রেনে চড়ে না নাকি?...আমি এখন লস অ্যাঞ্জেলেসে কখন যাব? সময় কোথায়? আগে থেকে জানলেও নাহয় এক কথা ছিল।...আরে না না, যতটা ভয় পাচ্ছিস, এত ভয়ের কিছু নেই। ক্যাসির সাহস আছে। পারবে। চলে আসতে বল্।'

মুসা আর কিশোরের দিকে ঘুরল রবিন। 'আমার খালা। মিসেস হারলো।'

রবিনদের বাড়ির সিটিং রুমে বসে আছে তিন গোয়েন্দা। বিস্কুট চিবাচ্ছে। কান খাড়া করে শুনছে রবিনের আম্মার কথা। নিউ ইয়র্কে কথা বলছেন তিনি।

'টাইমটা বল্!...হ্যাঁ হ্যাঁ, যোগাযোগ তো নিশ্চয় রাখব।...ঠিক আছে, ফোন করতে বলিস। রাখলাম।'

খটাস করে রিসিভার নামিয়ে রাখলেন তিনি। রবিনের দিকে তাকিয়ে ঝাঁজাল স্বরে বললেন, 'তোর সিনথি আন্টি। আবার প্ল্যান বদল করেছে! সপ্তাহ শেষে আসার কথা ছিল না ক্যাসির–বদলেছে সেটা, এখন আসছে কাল।'

'তো আসুক না, অসুবিধে কি?' মায়ের রাগ কমানোর জন্যে বলল রবিন। 'আমাদের অসুবিধে কি? আসবে যখন, যে কোন একদিন এলেই হলো।'

'আসাটা তো ব্যাপার না,' সোফায় এসে ছেলেদের সঙ্গে বসলেন মিসেস মিলফোর্ড। 'আমাকে যেতে বলছে সিনথি, মেয়েকে গিয়ে এগিয়ে আনতে। আমার সময় কোথায়? আর এটা কোন কথা হলো? নিউ ইয়র্ক থেকে এতটা পথ আসতে পারছে, কিন্তু লস অ্যাঞ্জেলেস থেকে গিয়ে আনতে হবে। কেন? ওখান থেকে কি রাস্তা ভুলে যাবে নাকি?'

'আপনার সময় না থাকলে আমরা যাই?' কিশোর বলল।

কফির কাপ তুলে নিয়েছিলেন মিসেস মিলফোর্ড। 'না!' তীক্ষ্ণ হয়ে গেল তাঁর কণ্ঠস্বর। 'আমার বোন হলে কি হবে, সিনথির কথায় নাচতে রাজি না আমি। ক্যাসি কচি খুকি নয়। বলে দিয়েছি, বড়জোর রেলস্টেশনে যেতে পারি তুলে আনার জন্যে, তা-ও সময় পেলে। আমি সময়মত যেতে না পারলে ট্যাক্সি নিয়ে যাতে চলে আসে ক্যাসি, মেয়েকে যেন বলে দেয় সে, এটাও বলে দিয়েছি। আসল কথা, এগিয়ে আনতে যাওয়ার ব্যাপারটাই আমার ভাল লাগেনি। আগলে রেখে রেখে ছেলেমেয়েকে নষ্ট করার প্রবণতা!'

কিশোর বলল, 'কোন চিন্তা নেই আপনার, আন্টি। স্টেশনেও যাওয়া লাগবে না আপনার। আমরাই যাই।'

'হ্যাঁ,' কিশোরের সুরে সুর মেলাল মুসা, 'আপনার কোন চিন্তাই করার দরকার নেই।'

'হ্যাঁ, তাই তো,' রবিন বলল। 'তুমি এত চিন্তা করছ কেন, আর রাগছই বা কেন এত? নাহয় লস অ্যাঞ্জেলেস থেকেই এগিয়ে আনতে গেলাম। ও আমাদের মেহমান। তাকে খাতির করে আনাও হবে, আমাদের একটা বেড়ানোও হবে। তুমি আসলে, মা, সিনথি আন্টির ওপর খেপে আছ।'

জবাবে কোন কথা না বলে ঘন ঘন দুইবার কফির কাপে চুমুক দিলেন মিসেস মিলফোর্ড।

'হ্যাঁ, ঠিক!' জোরে মাথা ঝাঁকাল কিশোর, 'লস অ্যাঞ্জেলেসে গেলেই বা ক্ষতিটা কি আমাদের? স্কুল তো বন্ধই।'

'তোরা আমাকে শান্ত করতে চাইছিস,' কাপটা নামিয়ে রাখলেন মিসেস মিলফোর্ড, 'কিন্তু আমার কথাটা বুঝতে পারছিস না। আমি বলতে চাইছি, অতবড় মেয়েকে গিয়ে এগিয়ে আনতে হবে কেন? কি শেখাচ্ছে...'

'আন্টির মেয়েকে আন্টি যে ভাবে খুশি মানুষ করুকগে,' বাধা দিল রবিন, 'তাতে তোমার কি?'

'আমার কিছু না। কিন্তু বোন তো। কাণ্ডকারখানা দেখলে পিত্তি জ্বলে। এ রকম করবে কেন? এতই যদি চিন্তা তাহলে নিজে এসে পৌঁছে দিয়ে গেলেই পারত। তা তো করবে না। স্বামীর সঙ্গে ঠিক বেড়াতে চলে যাচ্ছে ক্যাটস্কিল মাউনটেইনে।'

'যাক,' হাত নাড়ল রবিন। 'তাতেও আমাদের কিছু না। আন্টি আর আঙ্কেল যা ইচ্ছে করুক। তাদের মেয়ে আমাদের এখানে বেড়াতে আসছে, আমরা সাধ্যমত খাতির করব।'

চুপ করে ভাবলেন মিসেস মিলফোর্ড। রবিনের যুক্তি মেনে নিতে পারছেন না, তবে তর্কের মধ্যেও গেলেন না আর। বললেন, 'তোর হ্যারি আঙ্কেল ফোন করে জেনে নেবে, মেয়ে ঠিকমত পৌঁছল কিনা।'

'ঠিকমতই পৌঁছবে। ক্যাসির ভার আমাদের ওপর ছেড়ে দাও। তোমার কাজ তুমি করোগে।' হেসে বলল, 'ইয়োরোপে বাবার কাছে যদি চলে যেতে ইচ্ছে করে, তা-ও চলে যেতে পারো। বাড়িঘরের কথা ভেবো না। সব সামলাব আমরা।'

আর রাগ করে থাকতে পারলেন না মিসেস মিলফোর্ড। হেসে ফেললেন, 'হ্যাঁ, সিনথির মত পাগল মনে করেছিস আরকি আমাকে; ইচ্ছে হলো, আর কোনদিক বিচার-বিবেচনা না করে করে ফেললাম। তোর বাবা পত্রিকার লোক, সাংবাদিক সম্মেলনে গেছে, কিন্তু আমি তো আর তা নই, ওখানে গিয়ে কি করব?'

উঠে চলে গেলেন তিনি।

আর্মচেয়ারে হেলান দিয়ে আরাম করে বসল কিশোর। রবিনের দিকে

তাকাল। 'শুনে তো বোঝা যাচ্ছে তোমার খালাত বোন। আন্টির কথা থেকে এটাও বোঝা গেল–বেশ আকর্ষণীয় পরিবার। বলে ফেলো তো তোমার হ্যারি আঙ্কেল আর ক্যাসির সম্পর্কে সব কথা।'

'সব বলতে তো কয়েকদিন লাগবে,' হাসল রবিন। 'ক্যাসি আমার বয়েসী। তার বাবা, অর্থাৎ আমার আঙ্কেল হ্যারির পুরো নাম হ্যারিসন হারলো, নিউ ইয়র্কে একটা কোম্পানি চালান। কস্টিউম জুয়েলারি বানায় কোম্পানিটা। কোম্পানির নামটাও দারুণ, ক্লিওপেট্রা। নিউ ইয়র্ক আর প্যারিসের বড় বড় ফ্যাশন হাউজে মাল সাপ্লাই দেয় ওরা। ভাল ইনকাম। আসল হীরা বা চুনিপান্না নিয়ে আর বিশেষ মাথা ঘামায় না আজকালকার ফ্যাশন জগতের মানুষেরা। অতিরিক্ত দামী জিনিসের ঝামেলাও অতিরিক্ত।'

'যাদের ঘামানোর তারা ঠিকই ঘামায়,' হাসল কিশোর। 'টাকা রাখার জায়গা নেই যাদের।...যাকগে, বলো।'

'এ সব অলঙ্কার-ফলঙ্কার নিয়ে আমার কোন মাথাব্যথা নেই,' মুসা বলল। 'দেখলেই হাসি পায় আমার। ওগুলো নিয়ে যে ভাবে কাড়াকাড়ি করে লোকে, পাগল মনে হয়...যাকগে, বলো।'

'ছোটবেলায় নিউ ইয়র্কে বছরখানেক ছিলাম আমরা। ক্যাসিরা থাকত আমাদের পাশের বাড়িতে। বন্ধুত্ব হয়েছিল। সম্পর্কটা নষ্ট হয়নি। ও আমাকে চিঠি লেখে, আমিও লিখি। তবে দেখা-সাক্ষাৎ নেই বহুকাল,' রবিন বলল। 'কয়েকদিন আগে এক চিঠিতে ওর বাবার ব্যবসা সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলাম। কিছু মজার তথ্য জানিয়েছে ক্যাসি। আঙ্কেল হারলো মাঝে মাঝে বিভিন্ন দেশের রাজকীয় গহনা নকল করে ডিজাইন তৈরি করেন। ভাল সাড়া পাওয়া যায়। ক্যাসি লিখেছে, ক্লিওপেট্রার শেষ বানানো ডিজাইনের মধ্যে রয়েছে থাইল্যান্ডের পুরানো আমলের রাজ পরিবারের কিছু গহনার নকল। সেগুলোর কথা শুনে আগ্রহী হয়েছে লস অ্যাঞ্জেলেসের এক বিখ্যাত ডিজাইন হাউজ। তারা নাকি দেখতে চেয়েছে। পছন্দ হলে কিনে নেবে।'

'ইস্, আমাকে লস অ্যাঞ্জেলেসের আঞ্চলিক বিজ্ঞাপন ম্যানেজার রাখলে ভাল হত,' মুসা বলল। 'বেশ দু'পয়সা কামাতে পারতাম।'

'কথাটা তুমি মন্দ বলোনি। আঙ্কেলকে জানালে রাজিও হয়ে যেতে পারেন। ক্যাসি নাকি মাঝে মাঝে বাবার বিজ্ঞাপনের কাজ করে দেয়, কন্ট্রাক্টে। তাতে ভালই আয় হয় তার, হাতখরচ আসে,' হেসে বলল রবিন। 'আরও একটা কথা জানিয়েছে ক্যাসি, আঙ্কেল হারলোর সন্দেহ হয়েছে, তাঁর ডিজাইন চুরি করছে কেউ। ব্যাপারটা এ রকম–তিনি ডিজাইনটাকে নিখুঁত করে বাজারে ছাড়ার আগেই তাড়াহুড়া করে কেউ সেটা মেরে দিচ্ছে, তাতে তাঁর ডিজাইন পুরানো হয়ে যাচ্ছে, যতটা কদর হওয়ার কথা ততটা হচ্ছে না। বেশ কয়েকবার ঘটেছে ঘটনাটা। কাজেই ব্যাপারটাকে এখন আর কাকতালীয় ভাবা যাচ্ছে না। আঙ্কেল হারলো খুব দুশ্চিন্তায় পড়ে গেছেন। কোম্পানিরই কোন লোকের কাজ হতে পারে এটা। সবাই এখন সবাইকে সন্দেহ করতে আরম্ভ করেছে।'

'তারমানে চমৎকার একটা রহস্য,' চোখ চকচক করে উঠল কিশোরের।

রহস্য নিয়ে ভাবছে না আপাতত মুসা। কি যেন চিন্তা করতে করতে বলে উঠল, 'রবিন, শোনো, একটা বুদ্ধি এসেছে আমার মাথায়! আঙ্কেল হারলোর বিজ্ঞাপন আমরা সত্যি সত্যি করে দিতে পারি। ক্যাসি যদি রাজি থাকে। মা আবার চ্যারিটি পার্টি দিতে যাচ্ছে। ক্যাসিকে নতুন ডিজাইনের গহনা পরিয়ে নিয়ে গিয়ে পার্টিতে হাজির করা যেতে পারে। এই শনিবারে বড় একটা পার্টি দেবে মা। তাতে স্থানীয় অনেক ব্যবসায়ীকে দাওয়াত করা হয়েছে। যাদের পকেটে প্রচুর টাকা। শিওর কোন জুয়েলারও রয়েছে দাওয়াতীদের মধ্যে। অলিভার স্ট্রীটের সবচেয়ে বড় যে জুয়েলারের দোকানটা আছে, তার মালিককে ইতিমধ্যেই দু'বার দাওয়াত দেয়া হয়ে গেছে। আবার দিলেও অবাক হব না। ভদ্রলোক প্রচুর দান-খয়রাত করেন। দোকানটা চেনো?'

'আব্রাহাম অ্যান্ড গোল্ডমিং?' কিশোর বলল।

'হ্যাঁ। মালিকের নামে দোকানের নাম। শহরে আরও কয়েকটা বড় বড় গহনার দোকান আছে। মা নিশ্চয় ওগুলোর মালিকদেরও দাওয়াত করেছে। এবারের পার্টির উদ্দেশ্য, এতিম শিশুদের জন্যে দান সংগ্রহ করা। টাকাওয়ালা মানুষেরা আসবে দান করতে, সেই সুযোগে দানের টাকার কয়েক গুণ যদি লাভ করে নেয়া যায়, ছাড়বে কেন? নিশ্চয় আগ্রহী হবে। ক্যাসির বাবার ডিজাইন দেখে ওদের আগ্রহী হওয়াটা স্বাভাবিক। আমরা বলব, ক্যাসি নিউ ইয়র্কের মস্তবড় কোম্পানির রিপ্রেজেনটেটিভ।'

'কিন্তু নতুন ডিজাইনগুলো এখনই পরতে রাজি হবে কিনা ক্যাসি সন্দেহ আছে,' রবিন বলল। 'বাজারে নিশ্চয় এখনও ছাড়া হয়নি ওগুলো। বাজারে ছাড়ার আগেই প্রতিপক্ষ ব্যবসায়ীকে আগাম সব জানিয়ে দেয়ার মত বোকা নয় ক্যাসি। তা ছাড়া লস অ্যাঞ্জেলেসের সেই ডিজাইন হাউজের ওরা যদি সব ডিজাইনের কপিরাইট কিনে নেয়, তাহলে অন্য কারও কাছে বিক্রি করতে পারবে না ক্লিওপেট্রা।'

'কিন্তু তুমি না বললে ওগুলো সাধারণ কস্টিউম জুয়েলারি,' মনে করিয়ে দিল মুসা। 'অত দামী তো হওয়ার কথা না।'

হাসল রবিন। 'তারমানে জুয়েলারি ব্যবসা সম্পর্কে তোমার কোন ধারণাই নেই।'

'তোমার আছে মনে হচ্ছে?' খোঁচাটা না দিয়ে ছাড়ল না মুসা।

'আর কিছু না জানলেও এটা জানি, ক্লিওপেট্রার ডিজাইন অনেক দামে বিক্রি হয়,' রবিন বলল। 'আরও জানি, এ সব নিয়ে বাইরের কারও সঙ্গে আলোচনা করতে চাইবে না ক্যাসি। আরও একটা কথা জানিয়ে রাখি, ক্যাসি সম্পর্কে, কোন কথা যদি বলতে না চায় সে, একেবারে ঝিনুক হয়ে যায়। ঝিনুকের খোলার মত, টেনে আর খোলা যায় না, পেট থেকেও কিছু বের করা যায় না।'

'কিন্তু পুরানো মডেল তো বিক্রি করতে পারি আমরা,' হাল ছাড়ল না মুসা, 'যেগুলো রকি বীচে নতুন। এখানকার কোন জুয়েলার কিনতে রাজিও হয়ে যেতে পারে, তাই না?'

'হয়তো,' নিরাসক্ত কণ্ঠে রবিন বলল।

'হুঁ!' মাথা ঝাঁকাল মুসা। 'বিজ্ঞাপনের কাজটা যদি পাই, পচা পার্টিটা আর পচা লাগবে না।' কিশোরের দিকে তাকাল, 'তোমরা যাবে নাকি?'

'গেলে মন্দ হয় না,' এতক্ষণে মুখ খুলল কিশোর। 'কি করে কিপটে বড়লোকদের পকেট খসানো হচ্ছে, টাকা দেয়ার সময় মুখের ভঙ্গি কেমন করে রাখে ওরা, দেখতে খারাপ লাগবে না।'

'খাইছে!' আঁতকে উঠল মুসা। 'তুমি তো দেখছি সত্যি সত্যি আগ্রহী! আমি তো মা'র ওসব জঘন্য পার্টিগুলো থেকে চোদ্দশো মাইল দূরে থাকতে চাই। নেহায়েত বিজ্ঞাপনের কথা হচ্ছে...'

'না হে, সত্যি যাব,' হেসে বলল কিশোর। 'সত্যি সত্যি আমার দেখার কৌতূহল হচ্ছে...' রবিনের দিকে তাকাল। 'ক্যাসির কথা বলো।'

'ক্যাসি সুন্দরী,' রবিন বলল, 'এবং বুদ্ধিমতী। ব্যায়াম, খেলাধুলায় চৌকস, বিশেষ করে টেনিসে। গুছিয়ে গল্প করতে পারে। বই পড়তে ভালবাসে। কতদিন পার্কে বসে একজন আরেকজনক গল্প পড়ে শুনিয়েছি আমরা...'

'বাপরে, তোমার সঙ্গে তো বহুত মিল!' চোখ বড় বড় করে বলল মুসা। 'এ জন্যেই এত খাতির হয়েছিল, বোঝা গেল।'

'কবে শেষ দেখা হয়েছে তোমার সঙ্গে?' জানতে চাইল কিশোর। 'বেশিদিনের কথা হলে নিশ্চয় অনেক বদলে গেছে। এখন দেখলে আর চিনতেই পারবে না। প্ল্যাটফর্মে ট্রেন থেকে যখন নেমে আসবে, চেনার জন্যে কোটে কোন একটা চিহ্ন লাগিয়ে রাখতে বলে দিয়ো।'

'চিহ্ন লাগবে না। যতই বদলাক, দেখলে এখনও ঠিকই চিনে ফেলব।'

'তাহলে তো ভালই।'

দুই

পরদিন বিকেল।

রেল স্টেশনের প্লাটফর্মে অস্থির হয়ে অপেক্ষা করছে তিন গোয়েন্দা।

তিনজনেই উত্তেজিত।

কিছুটা আগেভাগেই চলে এসেছে। আশঙ্কা, কোন কারণে পথে আটকে পড়ে যদি দেরি হয়ে যায়, ট্রেনটা মিস করে। ক্যাসি যদি ওদের দেখতে না পেয়ে একাই ট্যাক্সি নিয়ে রওনা হয়ে যায়। তাহলে লজ্জার সীমা থাকবে না। রবিনের আম্মার কাছেও না, ক্যাসির কাছেও না। বড় বড় কথা বলেছে দুজনকেই–কোন চিন্তা নেই, সব ভার ওদের।

'খোদাই জানে!' কেমন দমে যাওয়া কণ্ঠে বলল মুসা। নতুন কারও সঙ্গে পরিচিত হওয়ার আগে অস্বস্তি বোধ করতে থাকে সে, বিশেষ করে সেটা যদি

কোন মেয়ে হয় তাহলে তো কথাই নেই। 'ক্যাসির সঙ্গে বনবে কিনা আমাদের!'

'অহেতুক ভাবছ,' হেসে সান্ত্বনা দিল রবিন। 'ও খুব বুদ্ধিমতি। দেখো, কোন অসুবিধেই হবে না।'

'না হলেই ভাল,' আশ্বস্ত হতে পারছে না মুসা। 'ওহ্হো, একটা কথা জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেছি, ঘোড়া পছন্দ করে নাকি ক্যাসি...'

'ওই যে ট্রেন এসে গেছে!' চিৎকার করে উঠল রবিন। 'এসো এসো!'

প্লাটফর্ম থেকে বেরোনোর গেটের দিকে দৌড় দিল সে। মুসা আর কিশোরের উদ্দেশে চিৎকার করে বলতে লাগল, 'গেটের দুই পাশে দাঁড়িয়ে থাকবে। কিছুতেই যেন নজর এড়িয়ে না যায়।'

ক্যাসি দেখতে কেমন, কোনই ধারণা নেই কিশোর বা মুসার। কেবল জানে, খাঁটি আমেরিকানদের মত সোনালি চুল, পাঁচ ফুট চার ইঞ্চি লম্বা চলনসই সুন্দরী একটা মেয়ে। সঙ্গে প্রচুর ব্যাগ-ব্যাগেজ থাকবে। কম জিনিসপত্র নিয়ে ভ্রমণে বেরোতে স্বস্তি বোধ করে না ক্যাসি।

ট্রেন থামল। পিঁপড়ের সারির মত পিলপিল করে বেরিয়ে আসতে লাগল মানুষ। ট্রেনে যে এখনও এত লোক চড়ে, কল্পনাই করতে পারেনি মুসা। বহুদিন আসে না স্টেশনের দিকে। ভিড় দেখে অবাক হয়ে গেল। নানা ধরনের মানুষ। বাচ্চার পুশ-চেয়ার ঠেলতে ঠেলতে আসছে ক্লান্ত মায়েরা। বুড়ো-বুড়িরা আসছে মালপত্র ট্রলিতে রেখে ঠেলে নিয়ে। অল্প বয়েসী দম্পতিরা আসছে পরস্পরের হাত ধরে। নিঃসঙ্গ তরুণ-তরুণী আসছে কেউ নির্বিকার ভঙ্গিতে, কেউ বা উত্তেজিত। যারা উত্তেজিত, ভাল করে তাকালে বোঝা যাবে তাদের উত্তেজনার কারণ। প্লাটফর্মের বেড়ার এ পাশে-ওপাশে তাদের জন্যে অস্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে হয়তো ওদের গার্লফ্রেন্ড বা বয়ফ্রেন্ডরা। ব্রীফকেস হাতে মাঝবয়েসী ব্যবসায়ী বা এগজিকিউটিভরা আসছে ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত ভঙ্গিতে। স্টেশন থেকে বেরিয়ে তাদের অনেকেই হয়তো গিয়ে ঢুকবে রেস্টুরেন্টে।

একা, দুজন দুজন করে, কিংবা আরও বেশি লোক একসঙ্গে এগোচ্ছে বেরোনোর গেটের দিকে। যেখানে টিকেট চেক করার জন্যে দাঁড়িয়ে আছে টিকেট চেকার।

তীক্ষ্ণ নজর রেখেছে তিন গোয়েন্দা। কিন্তু মালপত্রের বোঝা নিয়ে খাঁটি আমেরিকান, সোনালি-চুল কোন পাঁচ ফুট চার ইঞ্চি লম্বা সুন্দরী মেয়েকে গেটের দিকে আসতে দেখল না।

গেল কোথায় ক্যাসি?

তিন

'এমনই করে নাকি সে?' না বলে পারল না মুসা।

'উঁহু!' অধৈর্য ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল রবিন। 'অতটা খামখেয়ালী তো সে ছিল না। তবে বলা যায় না, বয়েস বাড়ার সাথে সাথে মানুষের স্বভাব অনেক সময় পাল্টে যায়।'

ভীষণ অস্বস্তিতে পড়ে গেছে সে। ক্যাসিকে নিয়ে বন্ধুদের কাছে লজ্জা পেতে চায় না, ওদের কাছে ছোট হয়ে যাক ক্যাসি, এটাও চায় না। কৈফিয়ত দেয়ার মত করে বলল, 'ট্রেন মিস হতেই পারে। এয়ারপোর্ট থেকে স্টেশনে আসতে দেরি হওয়ার একশো একটা কারণ থাকতে পারে মানুষের।'

'তা তো বুঝলাম,' মুসা বলল। 'কিন্তু এখন কি করব আমরা? নিউ ইয়র্কে ফোন করে খবর নেবে প্লেন ধরতে পেরেছে নাকি ক্যাসি?'

'ফোন নম্বর তো আছে তোমার কাছে?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'না,' জবাব দিল রবিন, 'তবে জানতে অসুবিধে নেই। মাকে ফোন করলেই হবে।'

রবিনের মানসিক অবস্থা বুঝতে পারছে কিশোর। শান্তকণ্ঠে বলল, 'পরের ট্রেনের জন্যে অপেক্ষা করলেও তো পারি আমরা। পরের ট্রেনটা দেখি। না এলে তখন ফোন-টোন।'

'ঠিক আছে,' রাজী হলো রবিন। কিন্তু মুখে হাসি ফুটল না। দুশ্চিন্তা যাচ্ছে না তার।

স্টেশন বুফে থেকে একটা কোক খাবার পর অনেকটা স্বাভাবিক মনে হলো তাকে। হাসার চেষ্টা করে বলল, 'সরি, অতিরিক্ত আপসেট হয়ে পড়েছিলাম। অনেক দিন আগের দেখা তো···ইদানীং দেখলে স্বভাবটা জেনে যেতাম, কি করবে না করবে হয়তো আন্দাজ করতে পারতাম। কিন্তু এতদিনে কতটা বদলে গেছে ও, জানি না। তখন বলে ফেলেছিলাম, দেখলেই চিনব, কিন্তু এখন সন্দেহ হচ্ছে। সত্যি চিনব তো? চেহারাও যে বদলে যায়নি, তাই বা জানছি কি করে!'

মুসা বলল, 'না চেনাটাও অস্বাভাবিক না। ছোটবেলায় কাউকে যে রকম লাগে, নিজে বড় হয়ে গেলেও অনেক সময় আর সে-রকম লাগে না। আমি যখন অনেক ছোট, দুই বছর বয়েস, মা'র এক মামাকে দেখেছিলাম। তার চেহারাটা এখনও মনে স্পষ্ট গেঁথে আছে। মনে হচ্ছিল, দশ ফুট লম্বা এক দৈত্য, কালো চুলদাড়িতে ভয়ঙ্কর এক জলদস্যুর মত লাগছিল। নিজে ছোট থাকলে স্বাভাবিক মানুষকেও বিশালদেহী লাগে। পরে যখন দেখলাম, মনে মনে কি হাসিই না পেল।'

'পরে কি রকম লাগল দেখতে?' জানতে চাইল কিশোর।

'দাড়ি কামিয়ে ফেলেছে। চুল মোটামুটি আগের মতই লম্বা আছে। পাক ধরেছে তাতে। আর আমার চেয়ে দুই ইঞ্চি ছোট। দেখে ভীষণ হতাশ হয়েছিলাম। অতি সাধারণ মানুষ। দস্যুফস্যু কিছু না।'

'এ সব শুনেও মন ভাল হচ্ছে না আমার,' রবিন বলল। 'যদি ট্রেনে না এসে থাকে ক্যাসি? কিংবা এলেও সোজা আমাদের সামনে দিয়ে চলে গেছে, আমি চিনতে পারিনি?'

'না চেনার চিন্তাটা আপাতত বাদ দাও না মাথা থেকে,' কিশোর বলল। 'আমাদের সামনে দিয়ে সোনালি-চুলের লম্বা কোন মেয়ে যায়নি ওরকম।'

'কিংবা এমনও হতে পারে,' চেঁচিয়ে উঠল রবিন, 'আগের ট্রেনটাতে চলে এসেছে! প্লেন দু'ঘণ্টা আগে এসেছিল, কিংবা যেটাতে আসার কথা তার আগেরটায় এসেছে। হতে পারে না?'

'নিশ্চয় পারে। অনেক কিছুই হতে পারে,' মুসা বলল। 'এসে আমাদের না দেখলে শুধু শুধু প্লাটফর্মে ঘুরে না বেড়িয়ে একটা ট্যাক্সি নিয়ে রওনা হয়ে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। কাছাকাছি কোন রেস্টুরেন্ট বা কাফে বা কফি শপে ঢুকেও বসে থাকতে পারে আমাদের অপেক্ষায়। চলো, চলো, খুঁজে দেখি। ওকে পাওয়া গেলে আমরাও একটা করে পিজ্জা খেয়ে নেব।'

ট্রেন আসতে দেরি আছে। খুঁজতে অসুবিধে নেই। স্টেশনের ভেতর-বাইরে, আশেপাশে যত স্ন্যাক বার, কফিশপ, খাবারের দোকান আছে, সবগুলোতে ঢুঁ মারতে শুরু করল ওরা। পাঁচ ফুট চার ইঞ্চি লম্বা, সোনালি চুল একটা মেয়েকেই দেখতে পেল, যে আধা-স্প্যানিশ আধা-ইংরেজি ভাষায় তার বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়েছে। ওদের কথা থেকেই বোঝা গেল মেয়েটার নাম ক্যাসি নয়।

আবার অস্থির হতে আরম্ভ করেছে রবিন। উদ্বেগ ফুটছে চেহারায়। গজগজ করতে লাগল, 'ওকে আমি বলেছিলাম আমাদের জন্যে অপেক্ষা করতে। নিজে নিজে রকি বীচে যাবার কথা ছিল না তার। ট্যাক্সিওলাকে বললেই নিয়ে যাবে, কিন্তু তারপরেও যাওয়াটা উচিত হয়নি, যেহেতু জানে আমরা আসছিই।' উদ্বিগ্ন চোখে দুই বন্ধুর দিকে তাকাল সে, 'কোন ধরনের অ্যাক্সিডেন্ট-ট্যাক্সিডেন্ট হয়নি তো...'

থামিয়ে দিল কিশোর, 'পরের ট্রেনটা আসতে কত দেরি?'

চুপ হয়ে গেল রবিন। কিশোরের কথা আবার যেন বাস্তবে ফিরিয়ে আনল ওকে, অঘটনের কল্পনা বাদ দিল। 'বিশ মিনিট।'

'ওই বুকশপটায় দাঁড়িয়ে আরেকটা কোক খাওয়া যেতে পারে,' কিশোর বলল। 'বই দেখে কোক খেতে খেতে কেটে যাবে সময়টা।'

মুসার সঙ্গে চোখাচোখি হলো ওর। মুসাও বুঝতে পেরেছে কিশোরের উদ্দেশ্য। রবিনের মনটাকে দুশ্চিন্তা থেকে সরিয়ে রাখতে চায়।

কিন্তু বিশ মিনিট পর যখন ট্রেনটা এল, আর ক্যাসিকে পেল না এ ট্রেনেও, বেশ একটা অনিশ্চিত অবস্থায় পড়ে গেল তিনজনে।

'কোক গিলতে গিলতে গলার কাছে তুলে ফেলেছি,' মুসা বলল। 'পরের ট্রেনটার জন্যে বসে থাকার বোধহয় দরকার নেই আর আমাদের।'

'প্রতিটা বই আর ম্যাগাজিনের সামনের কভার মুখস্থ হয়ে গেছে আমার, আর কিছু দেখার নেই,' কিশোর বলল। 'কোন কারণে লেট হয়েছে প্লেন, প্রায়ই তো হয়।' রবিনের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল সে, 'ঘটনা এইটাই ঘটেছে। এয়ারপোর্টে কোন কিছু।'

'মা'কে ফোন করব,' রবিন বলল। 'নিশ্চয় কোন মেসেজ পাঠিয়েছে

বাড়িতে। আরও আগেই খোঁজ নেয়া উচিত ছিল।'

'ব্যাগট্যাগ হারিয়ে ফেলেছে হয়তো ও,' ফোন বুদের দিকে হাঁটতে হাঁটতে মুসা বলল। 'হয়তো ভুল প্লেনে মাল তুলে দিয়ে বসে আছে, চলে গেছে প্লেনটা। ক্যাসি এখন হতবাক হয়ে কপাল চাপড়াচ্ছে।' সমর্থনের আশায় কিশোরের দিকে তাকাল সে। তার এই আবিষ্কার রবিনের ওপর কতটা প্রভাব ফেলেছে, সেটাও দেখল তার দিকে তাকিয়ে।

'ভুল স্টেশনেও নেমে পড়তে পারে ক্যাসি,' রবিন বলল।

'অতটা বোকা মনে করার কোন কারণ নেই তাকে,' একমত হতে পারল না কিশোর। 'তবে অত দুশ্চিন্তারও কিছু নেই। দেরি করার একটা কারণ নিশ্চয় আছে, আর সেটা যে শুধু দুর্ঘটনাই হবে সেটা ভাবারও কোন যুক্তি নেই।'

ফোন বুদের কাছে এসে দাঁড়াল ওরা। ভেতরে কথা বলছে একজন। তার বেরোনোর অপেক্ষা করতে লাগল। দেরিটা সহ্য হচ্ছে না রবিনের। তবে বেরোতে দেরিই করল লোকটা। সে বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিয়ে গিয়ে ভেতরে ঢুকল রবিন। মিনিট তিনেক পর বেরিয়ে এল মুখ চুন করে। ভোঁতা কণ্ঠে জানাল, 'কোন মেসেজ নেই।'

'তারমানে,' মুসা বলল, 'এখনও প্লেনেই রয়েছে ক্যাসি।'

'কিংবা ট্রেন মাঝপথে কোথাও আটকে বসে আছে,' কিশোর বলল।

'তাহলে স্টেশন-মাস্টার সেটা ঘোষণা করে দিত,' বলল রবিন।

'এয়ারপোর্টে ফোন করলে কেমন হয়?' মুসা বলল। 'প্লেনটা নামল কিনা জিজ্ঞেস করা যেতে পারে।'

'ভাল কথা মনে করেছ,' কিশোর বলল।

কিন্তু খোঁজ নিয়ে জানা গেল মোটামুটি ঠিক সময়েই ল্যান্ড করেছে প্লেন। কয়েক মিনিট যা দেরি হয়েছে তাতে প্রথম ট্রেনটা ধরতেও অসুবিধে হবার কথা নয়।

'আমার মনে হয় নিউ ইয়র্কেই প্লেন ধরতে পারেনি ক্যাসি,' মুসা বলল। 'কিংবা লস অ্যাঞ্জেলেস দেখতে বেরিয়েছে।'

'এটা কোন কথাই হলো না,' রবিন বলল। 'ও জানে আমরা এখানে ওর জন্যে অপেক্ষা করব। আমাদের দাঁড় করিয়ে রেখে সে শহর দেখতে বেরোবে, এ হতেই পারে না।'

'আমি আসলে সম্ভাবনাগুলোর কথা বলছি···কিন্তু তুমি এমন করে তাকাচ্ছ, যেন আমার মাথা চিবিয়ে খেয়ে ফেলবে।'

'সরি,' তাড়াতাড়ি বলল রবিন। 'সত্যি আমি দুঃখিত।···কিন্তু নিউ ইয়র্কেও যদি প্লেন মিস করত, তাহলেও এতক্ষণে ক্যাসি একটা খবর জানাত আমাদের বাড়িতে। তা ছাড়া ক্যাসিকে যতটা জানি, দু'দুটো ট্রেন মিস করে, আমাদের দাঁড় করিয়ে রেখে শহর দেখতে যাবে সে, অতটা কাণ্ডজ্ঞানহীন ক্যাসি অন্তত নয়। স্বভাব বদলালেও এতটা নিশ্চয় বদলায়নি।'

'তর্ক না করে একটা কিছু সিদ্ধান্ত নিতে হবে আমাদের,' কিশোর বলল। 'এখানেই কি অপেক্ষা করব আমরা, নাকি বাড়ি ফিরে যাব?'

'পরের ট্রেনটা দেখে যাব?' মুসার প্রশ্ন। 'এরপরেও না এলে বাড়িতে বসে মেসেজের অপেক্ষা করব।...আচ্ছা, ভুল ট্রেনে উঠে হারিয়ে যায়নি তো?'

'নাহ্। ভুল ট্রেনে উঠবে কেন? অন্য কোন কারণ আছে। সাধারণ কোন কারণ। আমরা যা ভাবছি, তার কোনটাই নয়।'

বাড়ি ফেরার জন্যে বাসে চাপল ওরা। বৃষ্টি হচ্ছে। জানালা বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে বৃষ্টির পানি। আকাশের অনেক নিচে ঝুলে রয়েছে কালো মেঘের স্তর। মেঘের মতই মুখ গোমড়া করে আছে ওরাও। বাস স্টেশনে নেমে বৃষ্টির মধ্যেই হেঁটে চলল। ভিজে চুপচুপে হয়ে, পায়ে পানি-কাদা মেখে এসে ঢুকল রবিনদের বাড়িতে।

বাড়িতে নার্সারি চালু করেছেন মিসেস মিলফোর্ড। তিনটে বাচ্চাকে ছবি আঁকা শেখানোয় ব্যস্ত। তখনই তিন গোয়েন্দার দিকে নজর দিতে পারলেন না।

'কোন একটা কারণ নিশ্চয় আছে,' পরে সব শুনে কিশোরের মত করেই বললেন তিনি, 'কোন একটা যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা। যাও, হাতমুখ ধুয়ে খেয়ে নাও। অযথা গিয়ে স্টেশনে সময় নষ্ট করে এলে।'

রান্নাঘরে ঢুকল তিন গোয়েন্দা।

খাবার বের করার জন্যে ফ্রিজ খুলল রবিন।

'কোকফোক আর বের কোরো না,' মানা করে দিল মুসা। 'পেটটা ঢোল হয়ে আছে এখনও।'

হেসে ফেলল কিশোর। মুসা কোক খেতে চায় না। তারমানে কি পরিমাণ গিলেছে। 'পেট ব্যথা শুরু হলে তখন বুঝবে। তখনই মানা করেছিলাম। খেতে দেখে তো আমার অবাকই লাগছিল, কোথায় জায়গা করেছ ওগুলো।'

'কি করব, কোক আমার পছন্দ,' পেট চেপে ধরল মুসা। 'অন্তত সাত নম্বর ক্যানটা খতম করার আগে সে-রকমই মনে হচ্ছিল।' রবিনের দিকে তাকিয়ে হাসল সে। হালকা রসিকতায় বন্ধুর মুখে হাসি ফোটানোর চেষ্টা করছে। 'কোক খেয়ে আগে তো কখনও এমন অবস্থা হয়নি। যাকগে, এখন আর পানিটানি না খেলেই হবে। রবিন, স্যান্ডউইচ ছাড়া আর কিছু দিয়ো না। দুটোর বেশি না।'

'তা-ও দুটো!' না হেসে আর থাকতে পারল না রবিন। 'খালি পেটেই তো দুটো সামাল দেয়া...' কথা শেষ হলো না তার। তীক্ষ্ণ শব্দে বেজে উঠল টেলিফোন। চট করে তাকাল কিশোরের দিকে। 'তোমার কি মনে হয়...'

'ধরো, ধরো,' কিশোর বলল। 'জলদি করো!'

দৌড়ে গিয়ে রিসিভার তুলে নিল রবিন। 'হ্যালো। রবিন মিলফোর্ড বলছি।'

কিন্তু ক্যাসি নয়। একজন লোক। পুরুষকণ্ঠে জবাব এল, 'রবিন! আমার নাম জনি বিয়াল্ডা! আমি ক্যাসির বাবার চাকরি করি।'

স্বস্তির পরশ এমন করে ছড়িয়ে পড়ল শরীরে, রবিনের মনে হলো ঢলে পড়ে যাবে। 'সব ঠিক আছে?' তাড়াহুড়োয় কথা আটকে যাচ্ছে তার। 'ক্যাসি ভাল আছে? সেই কখন থেকে অপেক্ষা করে আছি আমরা, ওর কোন খবরই নেই।'

'সব ঠিক আছে,' হালকা সুরে জানাল জনি। 'চিন্তার কিছু নেই। ক্যাসি আমার সঙ্গেই আছে। প্ল্যানটা একটু বদলাতে হয়েছিল, সে-জন্যেই...' খুক করে উঠল জনি। হাসল না কাশল, বোঝা গেল না। 'আরও আগেই তোমাদের ফোন করতাম। কিন্তু ফোন নম্বরটা এমন জায়গায় রেখেছে ক্যাসি...ব্যাগের একেবারে তলায়, খুঁজতে খুঁজতেই সময় কাবার। আমরা খুব দুঃখিত।'

'আমরা তো ভয়েই মরে যাচ্ছিলাম কোন দুর্ঘটনা হয়েছে ভেবে,' স্বস্তি আসতেই রাগ জমতে লাগল রবিনের। জনির দুঃখ প্রকাশে নরম হলো না সে।

'না, না, তেমন কিছু ঘটেনি। খবর হলো, আমরা কদিন লস অ্যাঞ্জেলেসে থাকব। ক্যাসিও থাকছে। ও, একটা নম্বর লিখে নাও। কোন কারণে যদি ক্যাসির আব্বা-আম্মার সঙ্গে যোগাযোগের প্রয়োজন পড়ে।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, দাঁড়ান, এক সেকেন্ড।' কাগজ-কলম রেডি করল রবিন। 'বলুন।'

দীর্ঘ নম্বরটা লিখে নিল সে।

'ক্যাসির সঙ্গে কথা বলব।'

'ধরো। দিচ্ছি।' গলা চড়িয়ে ক্যাসির নাম ধরে ডাকতে শুরু করল জনি।

রিসিভারের মাউথপীসে হাত রেখে দুই বন্ধুর দিকে ফিরল রবিন। এতক্ষণে ঠিকমত হাসি ফুটেছে মুখে। 'খারাপ কিছু ঘটেনি। লস অ্যাঞ্জেলেসেই আছে ওরা।'

'কি বলেছিলাম,' ভুরু নাচাল কিশোর। 'খামাখা এত দুশ্চিন্তা।'

'রবিন?' রিসিভারে ভেসে এল একটা মেয়েকণ্ঠ। ক্যাসির কণ্ঠস্বর চিনতে পারল রবিন।

'ক্যাসি! যাক, বাঁচা গেল! যা একখান খেল দেখালে...'

'কথা বলার সময় নেই এখন,' ক্লান্ত শোনাচ্ছে ক্যাসির গলা। 'কয়েক দিন থাকতে হবে আমাদেরকে এখানে।'

'কিন্তু তোমার না...'

'যত তাড়াতাড়ি পারি চলে আসব তোমাদের ওখানে। কবে আসতে পারব বোঝার সঙ্গে সঙ্গে আবার ফোন করব তোমাকে।'

'কিন্তু তুমি...'

'ও ভাল কথা, গর্ডন কেমন আছে?'

'গর্ডন!' রবিনের বিস্মিত চোখ ঘুরে গেল কিশোর আর মুসার দিকে।

'হ্যাঁ, গর্ডন। আবার দেখতে ইচ্ছে করছে ওকে। শোনো, আমাকে এখন ছাড়তে হচ্ছে। শীঘ্রি আবার কথা বলব। বাই।'

খট করে শব্দ হলো। লাইন কেটে দিয়েছে ক্যাসি।

'বোঝার সঙ্গে সঙ্গে ফোন করব!' ক্যাসির কথাটারই প্রতিধ্বনি করল যেন বিমূঢ় হয়ে যাওয়া রবিন। 'কি বুঝতে চায় ও?'

'জিজ্ঞেস করলে না কেন?' মুসা বলল।

'করতে তো চেয়েছিলাম। সুযোগই দিল না। ও বলল, কথা বলার সময় নেই এখন।'

কি কি কথা হয়েছে, জানাল রবিন।

'ওর বাবার কর্মচারী?' কিশোর বলল, 'তাহলে আর কোন চিন্তা নেই।'

ওর দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রবিন, 'কিন্তু ব্যাপারটা কেমন যেন গোলমেলে মনে হচ্ছে আমার কাছে। ওর কথাগুলো অদ্ভুত! গর্ডনের কথা জিজ্ঞেস করল সে।' মাথা নাড়তে লাগল রবিন, 'কিছুই বুঝলাম না!'

'গর্ডনটা কে?' জানতে চাইল কিশোর।

'অদ্ভুত তো এ জন্যেই লাগছে। ও আমাকে জিজ্ঞেস করল, গর্ডন কেমন আছে।'

'তাতে অসুবিধেটা কি?' মুসা বলল। 'দোহাই তোমার রবিন, কিশোরের মত মঙ্গলগ্রহের ভাষা শুরু করে দিয়ো না। একজনের জ্বালাতেই বাঁচি না।'

'গর্ডন ছিল আমার কুকুরের নাম,' রবিন বলল। 'ছোটবেলায় একটা কুকুরের বাচ্চা এনে দিয়েছিল বাবা। একটা গ্রেট ডেনের বাচ্চা। সেটাকে নিয়ে রোজ বেড়াতে বেরোতাম আমি আর ক্যাসি। কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই অসুখে পড়ে মরে গেল বাচ্চাটা। ক্যাসি ওকে খুব ভালবাসত। বাচ্চাটা মরে যাওয়ায় খুব কষ্ট পেয়েছিল।'

ভুরু কুঁচকে গেছে কিশোরের। 'বাচ্চাটা যে মরে গেছে, এটা ভুলে যায়নি তো ক্যাসি?'

'মরার কথা কেউ কখনও ভোলে?'

মাথা নাড়ল কিশোর, 'না, তা অবশ্য ভোলে না। মৃত্যুর কথা কখনোই ভুলে যায় না মানুষ। আর প্রিয় কুকুরের বাচ্চা হলে তো ভোলার প্রশ্নই ওঠে না।'

'এই জিনিসটাই অবাক করছে আমাকে!' শূন্যকণ্ঠে বলল রবিন। 'ক্যাসি জানে কুকুরের বাচ্চাটা মরে গেছে। ও কেমন আছে তাহলে জিজ্ঞেস করল কেন? মাথামুণ্ড কিছু বুঝতে পারছি না আমি...! যদি না কোন ভজঘট হয়ে থাকে। সাংঘাতিক কোন গণ্ডগোল!'

চার

'আর দুশ্চিন্তা করার কিছু আছে বলে মনে হয় না আমার,' মিসেস মিলফোর্ড বললেন। 'বললই তো, যত শীঘ্রি সম্ভব আবার যোগাযোগ করবে। সঙ্গে জনি বিয়াভা আছে। ক্যাসি উল্টোপাল্টা কিছু করতে চাইলেও সে করতে দেবে না, ভালমন্দ দেখার জন্যেই তার সঙ্গে মেয়েকে দিয়েছে রোনাল্ড। হয়তো জরুরী কোন ব্যবসার কাজে ওখানে জড়িয়ে গেছে জনি। ক্যাসিকেও আটকে দিয়েছে। একা ছাড়ছে না। কাজ শেষ হলে সঙ্গে করে নিয়ে আসবে এখানে।'

'তা হতে পারে,' রবিন বলল। 'কিন্তু তাতেও গর্ডনের কথা জিজ্ঞেস করার ব্যাপারটা পরিষ্কার হচ্ছে না।'

'সব জট পাকিয়ে ফেলেছে আরকি। ছোটবেলা থেকেই তো ও অমন।

মগজের সমস্যা আছে। জনির সঙ্গে আছে যখন, ভালই থাকবে। বুঝেশুনেই জনির সঙ্গে দিয়েছে ওকে ওর বাবা।'

কিন্তু সন্তুষ্ট হতে পারল না রবিন। খচখচ করছেই মনের মধ্যে। গর্ডনের কথা সত্যি কি ভুলে গেল ক্যাসি? কি করে ভোলে?

'ফোন করে দেখব নাকি?' কিছুটা অনুরোধের সুরেই মাকে জিজ্ঞেস করল রবিন, 'আঙ্কেল হারলো আর আন্টিকে নিশ্চয় পাওয়া যাবে। জনির দেয়া নাম্বারটাতে করে দেখি?'

'দেখতে পারিস চেষ্টা করে,' আপত্তি করলেন না মিসেস মিলফোর্ড। 'তাতে যদি মনে শান্তি পাস। তবে নতুন কিছু জানতে পারবি বলে মনে হয় না। যাকগে...কর গিয়ে ফোন। আমার হয়ে বলে দিস, শেষ মুহূর্তে প্ল্যান বদল করে আমার ঘাড়ের যন্ত্রণাটা না বাড়ালেও চলত।'

প্রথমে ক্যাসিদের নিউ ইয়র্কের বাড়ির নম্বরে ডায়াল করল রবিন।

'রেকর্ড করা মেসেজ দিচ্ছে,' মাকে জানাল সে। 'বাড়ি নেই কেউ।'

'তারমানে রওনা হয়ে গেছে আরকি।'

'জনি যেটা দিয়েছে, সেটাতে করে দেখি,' হাল ছাড়তে রাজি নয় রবিন।

'কিন্তু এটা তো দিয়েছে তোকে কোন জরুরী প্রয়োজন পড়লে করার জন্যে। শুধু জানার জন্যে ফোন করেছিস শুনলে বিরক্তই হবে, ধন্যবাদ আশা করিসনে। জানি, রহস্যের গন্ধ পেতে আরম্ভ করেছিস। সত্যিকারের রহস্য থাকলে কিছু বলতাম না। কিন্তু শুধু শুধু লং ডিসট্যান্স কল করে পয়সা নষ্ট করার পেছনে কোন যুক্তি নেই।'

থমকে গেল রবিন। পয়সা নষ্ট করার কথা শুনে নয়, আঙ্কেল-আন্টি বিরক্ত হবেন ভেবে।

'নাহ্, তুমি ঠিকই বলেছ,' আস্তে করে রিসিভারটা নামিয়ে রাখল রবিন। 'বেড়াতে গেছেন ওঁরা, বিরক্ত করাটা ঠিক হবে না। তা ছাড়া মেয়ে ঠিকমত পৌঁছল কিনা জানার জন্যে আঙ্কেল তো ফোন করবেনই বলেছেন।'

'তাই তো, এ কথাটা তো ভুলেই গিয়েছিলাম,' মা বললেন। 'তাহলে আগেই তোকে ফোন করতে নিষেধ করতাম।'

ব্যাপারটা নিয়ে মাকে বা আর কাউকে বিরক্ত করাটা ঠিক হবে না। নিজেরও অহেতুক উৎকণ্ঠা বাড়ানোর কোন যুক্তি নেই। জনি ফোন করেছে। ক্যাসি কথা বলেছে। কোন গোলমাল হয়নি। ক্যাসির উল্টোপাল্টা কথা–ওটা নিশ্চয় ভুল। ক্যাসির কাছ থেকে আবার ফোন পাওয়ার অপেক্ষা করাই ভাল।

তবে অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে থাকতে ভাল লাগছে না তার। ক্যাসি কখন করবে, কোন ঠিক নেই। সবচেয়ে ভাল হতো, যদি রকি বীচে চলে আসত সে। সামনাসামনি সব তার মুখ থেকে শুনতে পারলে ভাল হতো। ভুলের আর অবকাশ থাকত না।

*

সে-রাতেই ফোন করলেন আঙ্কেল হারলো, ক্যাসি পৌঁছল কিনা শিওর হওয়ার জন্যে।

'আ-আমি কিছু বুঝতে পারছি না,' রবিন বলল। 'আমি মনে করেছিলাম, লস অ্যাঞ্জেলেসে ওরা কেন থেকে গেল, আপনি অন্তত জানবেন।'

'জনির ওখানে ব্যবসার জরুরী কাজ আছে,' সহজকণ্ঠে আঙ্কেল বললেন। 'সেজন্যেই রয়ে গেছে হয়তো। কিন্তু ওখানে থাকার কথা ক্যাসি আমাদের কিছু জানায়নি। তবে জনি যদি তোমাকে ফোন করে থাকে, ক্যাসিও কথা বলে থাকে, তাহলে চিন্তার কিছু নেই। টাকা আছে ক্যাসির কাছে। কোন অসুবিধে হবে না ওর। থাকুক না লস অ্যাঞ্জেলেসে, দেখুক-টেখুক। ঘুরতেই তো গেছে। যখন ইচ্ছে হবে যাবে তোমাদের বাড়িতে।'

'সেটা অবশ্য ঠিক...' কণ্ঠের অনিশ্চয়তা চাপা দিতে পারল না রবিন।

'মনে হচ্ছে তুমি সন্তুষ্ট হতে পারছ না?' হাসলেন আঙ্কেল। 'দেখো, রবিন, জনি আমার অনেক পুরানো লোক। বিশ্বস্ত বন্ধুর মত। ওকে আমি অবিশ্বাস করি না। ক্যাসি যতক্ষণ ওর সঙ্গে থাকবে, ভালই থাকবে।'

'ঠিক আছে, আপনি যখন বলছেন...ক্যাটস্কিল মাউনটেইন কেমন লাগছে?'

হাসলেন আঙ্কেল। 'আমার কাছে তো ভালই লাগছে। কিন্তু তোমার আন্টির কাছে বোধহয় সুবিধের মনে হচ্ছে না। অতিরিক্ত মানসিক চাপের মধ্যে রয়েছে সে। নিজের বাড়িতেই নাকি সবচেয়ে আরাম। দুই হপ্তা ক্যাম্পারের তাঁবুতে বাস করার ব্যাপারটা কোনমতেই মেনে নিতে পারছে না সে। ওকে তো চেনো,' তারের মধ্যে দিয়ে ভেসে এল তাঁর দরাজ হাসি। 'তবে আমার বিশ্বাস, সহ্য হয়ে যাবে। তখন আর খারাপ লাগবে না। রবিন, শোনো, আমাকে এখন ছাড়তে হচ্ছে। দুদিন পর আবার নাহয় করব,' রসিকতা করে বললেন, 'ক্যাসি আস্তই তোমাদের বাড়িতে পৌঁছল কিনা খোঁজ নেয়ার জন্যে।'

'ঠিক আছে। আন্ট সিনথিকে আমার ভালবাসা দেবেন।'

'দেব। ক্যাসিকে সামনে পেলে খুব একচোট গালমন্দ করে নিয়ো, তোমাকে এ ভাবে ভোগানোর জন্যে–আমি তোমাকে ঢালাও অনুমতি দিয়ে দিলাম।' হা-হা করে হাসলেন তিনি।

'যদি কোন সমস্যা হয় আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করব কিভাবে?' জানতে চাইল রবিন।

'নিউ ইয়র্কের নম্বর তো জানাই আছে তোমার। ওখানে করলে লোক পাবে। তাকে বললেই মেসেজ পাঠাবে আমার কাছে। তো, রাখি। ক্যাসিকে নিয়ে ভেবো না। দুশ্চিন্তার কিছু নেই।'

কেটে গেল লাইন।

পাঁচ

'এই হলো ঘটনা,' কিশোর আর মুসাকে সব জানিয়ে বলল রবিন। 'আঙ্কেল

বললেন, ক্যাসিকে নিয়ে দুশ্চিন্তা না করতে।'

'তাহলে কোরো না,' কিশোর বলল। 'ওর বাবাই যেখানে চিন্তিত নন, তুমি উদ্বিগ্ন হচ্ছ কেন?'

'জানি। কিন্তু কোনমতেই গর্ডনের কথাটা মাথা থেকে দূর করতে পারছি না আমি। আমি কি করব? কথা বলার সময় ক্যাসির গলাটাও জানি কেমন শোনাচ্ছিল।'

'কল্পনাটা একটু বেশিই চড়ে গেছে তোমার,' মুসা বলল।

'যা খুশি বলো,' রবিন দমল না। 'তবে আমাকে বোঝাতে পারবে না। কে কি বলল, তাতে আমার কিচ্ছু যায় আসে না। মা ভাবছে ক্যাসির মগজে গণ্ডগোল, আঙ্কেল ভাবছেন লস অ্যাঞ্জেলেস দেখার জন্যে রয়ে গেছে ক্যাসি; কিন্তু আমি তোমাদের একটা কথা জানিয়ে রাখি, ভজঘট কিছু একটা হয়েছে, এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই আমার। কি হয়েছে, জানি না, কিন্তু হয়েছে।'

'যেমন?' প্রশ্ন করল কিশোর।

'জানি না! কিশোর, ভাবনাটা পাগল করে দিচ্ছে আমাকে। কেউ আমার কথা বিশ্বাস করছে না।'

'বেশ, ধরে নিলাম তোমার কথাই ঠিক,' মুসা বলল, 'কি করতে চাও এখন? লস অ্যাঞ্জেলেসে গিয়ে জানার চেষ্টা করবে গোলমালটা কি? কোথায় উঠেছে ওরা, এটাও তো জানা নেই আমাদের।'

'তাই তো! এই দেখো,' রবিন ধরল কথাটা, 'কোথায় উঠেছে সেটা পর্যন্ত আমাদের জানায়নি ক্যাসি। কেন জানাল না? রকি বীচে কেন আসছে না এখন, কি অসুবিধা, সেটা তো অন্তত জানাতে পারত।'

'শহর দেখতে রয়ে গেছে,' ক্লান্ত ভঙ্গিতে বলল মুসা।

'তাহলে সেটা জানাতে পারত আমাদের। ও বলল, কথা বলতে পারবে না। কেন পারবে না?'

'হয়তো তার ঘাড়ের কাছে পিস্তল ধরে রেখেছিল ওই বদমাশ জনি বিয়াম্ভাটা।'

চোখ বড় বড় করে তার দিকে তাকিয়ে রইল রবিন।

'মজা করার জন্যে বলেছি,' হাসল মুসা। 'আমি এটা বিশ্বাস করি না।...হয়তো পে-ফোনে কথা বলছিল ক্যাসি। হয়তো দূরে কোথাও যাবার তাড়া ছিল। একশো একটা কারণ থাকতে পারে কথা শর্টকাট করার। এর কোনটাকেই সামান্যতম অস্বাভাবিক বলতে পারবে না।'

'মুসা ঠিকই বলেছে,' কিশোর বলল। 'তোমার আঙ্কেল বলেছেন দুদিন পর ফোন করবেন, তাই তো? ওই সময় পর্যন্ত চুপ থাকো। যদি ফোন না করেন, কিংবা ক্যাসির কাছ থেকে ফোন না পাও, তখন তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ কোরো। যা করা দরকার, তিনিই করবেন তখন। জনি বিয়াম্ভাকে ফোন করে জেনে নেয়া তাঁর জন্যে যত সহজ, আমাদের জন্যে মোটেও তা না।'

দুজনের মুখের দিকে তাকাতে লাগল রবিন। 'বেশ, হয়তো ভুলই করছি আমি। তবে একটা কথা তোমাদের বলে রাখি, দুদিনের মধ্যে যদি ক্যাসির

কাছ থেকে সাড়া না পাই, সোজা পুলিশের কাছে যাব আমি।' দুজনের দিকে তাকিয়ে ভ্রূকুটি করল সে। 'কে কি বলল তখন আর কেয়ারই করব না।'

*

পরদিন সকালের ডাকে একটা পার্সেল এসে হাজির হলো রবিনদের বাড়িতে। পোস্টমার্ক এতই অস্পষ্ট, কোথা থেকে এসেছে বোঝা অসম্ভব।

কে পাঠাল? অবাক হয়ে ভাবতে ভাবতে মোড়ক ছিঁড়ল রবিন। বড় এক বাক্স চকলেট!

তার জন্মদিন নয়, কোন অনুষ্ঠান নেই, উপহার পাঠানো হলো কোন উদ্দেশ্যে?

লেবেলের লেখা দেখে বোঝা গেল, ডার্ক চকলেট।

ডার্ক!

আরও অবাক রবিন।

ডার্ক একেবারেই পছন্দ নয় তার।

যে পাঠিয়েছে, সে তার রুচির খবর রাখে।

বাক্স বাঁধার ফিতের নিচে ভাঁজ করে ঢুকিয়ে রাখা একটা নোট পাওয়া গেল। তাতে পরিচিত হাতের লেখা: তোমার কাছে রেখে দিয়ো!

নিচে ক্যাসির নাম সই করা।

'এই যে,' মিসেস মিলফোর্ড বললেন, 'আমাদের যন্ত্রণা দিয়ে এখন লজ্জা পাচ্ছে সে। খুশি করতে চাইছে। আর যাই হোক, ভদ্রতাবোধটুকু ষোলোআনাই আছে এখনও।'

'কিন্তু মা, আমি তো ডার্ক চকলেট পছন্দ করি না,' রবিন বলল। 'ক্যাসি সেটা জানে।'

'এত বছর পরে কি আর মনে রেখেছে নাকি? কিংবা রাখলেও অন্য কিছু না পেয়ে হাতের কাছে যা পেয়েছে তাই পাঠিয়েছে। পাঠিয়েছে, সেটাই আসল কথা।' নাক চুলকালেন মিসেস মিলফোর্ড। 'ডার্ক চকলেট আমারও ভাল লাগে না।'

'কি করব তাহলে এগুলো নিয়ে?'

'দিয়ে দে কাউকে। কত মানুষ আছে খাওয়ার। মুসাকে দিলেই তো খেয়ে ফেলবে। ও তো সব খায়।'

ভুরু কুঁচকে চিন্তা করছে রবিন। মা'র কথা কানে ঢুকল বলে মনে হলো না। বিড়বিড় করে বলল, 'কিন্তু এই যদি হয় ক্যাসির খুশি করার জিনিস, ওর মাথাটা সত্যি পরীক্ষা করানো দরকার।'

অদ্ভুত পুরস্কারটা বিস্মিত করল ওকে।

ক্যাসির ব্যাপারটা নিয়ে যতই ভাবছে, ততই অবাক হচ্ছে রবিন। বার বার উল্টেপাল্টে দেখতে লাগল ক্যাসির নোটটা।

সত্যি কি ওদের খুশি করার জন্যে পাঠিয়েছে? না অন্য কোন কারণ আছে এর পেছনে? এই অদ্ভুত উপহার পাঠিয়ে কোন কিছু বোঝাতে চাইছে না তো ক্যাসি, মৃত কুকুরের নাম বলার মত? এমন কিছু, যেটা কেবল রবিন বুঝতে

পারে? কিন্তু কিছু বুঝতে পারছে না সে।

দুপুর নাগাদ এতটাই মাথা গরম হয়ে গেল, কিশোরকে ফোন না করে পারল না আর। মুসা আর কিশোর ওর কথা বিশ্বাস করছিল না। কিন্তু এখন? দু-দুটো অদ্ভুত সূত্র হাতে থাকার পরেও কি করবে না?

'সকালের ডাকে ক্যাসির কাছ থেকে একটা মজার জিনিস পেয়েছি,' কিশোরকে জানাল রবিন। 'তোমার সঙ্গে কথা বলা দরকার।'

'ক্যাসিকে জিম্মি রেখে টাকা চেয়ে পাঠিয়েছে কেউ?' জানতে চাইল কিশোর।

'না। বিচিত্র ঘটনা। এসো। নিজের চোখেই দেখতে পাবে।'

'ঠিক আছে, আসছি,' কিশোর বলল। 'তারচেয়ে আরেক কাজ করো না কেন, তুমিই চলে এসো। রাতে আমাদের এখানে খাবে। থাকবে। মজা হবে খুব। আজ আমার রাঁধতে ইচ্ছে করছে। মুসাকেও আসতে বলেছি। তিনজনে মিলে রান্না করব। খাব-দাব। তারপর হেডকোয়ার্টারে গিয়ে আলোচনায় বসব। ক্যাসি যদি ফোন করে, তাহলে ধরার জন্যে আন্টি তো আছেনই।'

কিশোরের প্রস্তাবটা রবিনেরও খুব পছন্দ হলো। রাজি হয়ে গেল সে। উত্তেজনাও কমে গেল অনেকখানি। 'বুদ্ধিটা মন্দ না। তোমাদের ওখানে চলে আসাই ভাল। নইলে সারাক্ষণ ফোনের কাছে বসে থাকতে থাকতেই অস্থির হয়ে যাব।'

'এত অস্থির হওয়ার কি হলো বুঝলাম না। ক্যাসির কাছ থেকে অন্তত খোঁজ-খবর তো পাচ্ছ এখন।'

'কিন্তু খোঁজটার মধ্যেও কেমন যেন একটা অন্য রকম গন্ধ আছে। দাঁড়াও, আসছি, বলব সব।'

'এসো। মুসাকেও এখনই চলে আসতে বলে দিচ্ছি।'

'যদি ঘোড়া নিয়ে বেরিয়ে গিয়ে থাকে? দৌড় করানোর জন্যে?'

'না-ও যেতে পারে। বলে রেখেছি, যে কোন সময় ডাকতে পারি।'

লাইন কেটে গেল। রিসিভারটা আস্তে করে নামিয়ে রাখল রবিন। চকলেটের বাক্স থেকে নোটটা খুলে নিয়ে পকেটে রাখল।

তারপর কি মনে করে বাক্সটাও তুলে নিল হাতে। এটাও নিয়ে যাবে।

*

বৃষ্টির পর দিনটাকে বেশ মচমচে আর উজ্জ্বল লাগছে। ক্রমাগত বৃষ্টির হুমকি দিতে থাকা ধূসর আকাশটার রঙ পাল্টে গিয়ে হয়ে উঠেছে হালকা নীল। সাদা সাদা পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে সারা আকাশময়।

ঘোড়া নিয়ে বেরিয়েছে মুসা। চলে এসেছে পাহাড়ের কাছে। প্রতিটি খানাখন্দ পানিতে ভরে গেছে। গর্জন করে বয়ে চলেছে পাহাড়ী ঢল। বৃষ্টির পানিতে হয়েছে এই অবস্থা।

কমেটের খুরের ঘায়ে কাদা-পানি ছিটাচ্ছে। ছিটকে উঠে এসে লাগছে মুসার প্যান্টের নিচে, জুতোয়।

কিশোর আর রবিন সবে রাযবেরি আইসক্রীমের প্রথম চামচটা মুখে

পুরতে যাবে, এই সময় হাজির হলো সে। পরিশ্রমে হাঁপাচ্ছে। পাহাড় থেকে ঘোড়া ছুটিয়ে এসেছে।

'কাপড়ের অবস্থা দেখো,' শুকিয়ে যাওয়া অদ্ভুত সাদা কাদা হাত দিয়ে ডলে তুলতে তুলতে বলল মুসা। 'পরের বার বৃষ্টি হলে ভুলেও যাব না ওদিকে। সাংঘাতিক অবস্থা।'

'এলে কোত্থেকে?' জানতে চাইল কিশোর। 'কাদাটা তো স্বাভাবিক কাদা মনে হচ্ছে না।'

'ঘুরতে গিয়েছিলাম, একটা নতুন জায়গায়। বড় একটা খালি বাড়ি আছে ওখানে। সামনে থকথকে সাদা কাদা। দেখে মনে হয় বৃষ্টিতে ভিজে নয়, আগ্নেয়গিরির লাভার মত মাটির তলা থেকে উঠে আসছে। পানি খেতে ঢুকেছিলাম। কাদার মধ্যে পা দিয়ে ফেলেছিল কমেট। ওর খুর দেখে এসোগে, মনে হবে সাদা রঙ করা...আরে আরে, সব শেষ করে ফেললে নাকি! আমার জন্যে রাখলে না!' রান্নাঘরের টেবিলে রাখা আইসক্রীমের খালি বাক্সটার দিকে শঙ্কিত চোখে তাকাল সে।

'ভয় নেই,' হেসে ফ্রিজের দিকে এগিয়ে গেল কিশোর, আইসক্রীম বের করার জন্যে। 'একটা খবর আছে। সকাল বেলা ডাকে একটা প্যাকেট পেয়েছে রবিন।'

'ক্যাসির কাছ থেকে,' রবিন বলল। 'চকলেট। সঙ্গে এই যে মেসেজ দিয়েছে একটা।' নোটটা বের করে বাড়িয়ে দিল মুসার দিকে।

'নিউ ইয়র্ক থেকে এসেছে?' বড় এক চামচ আইসক্রীম মুখে পুরে মুহূর্তে গিলে ফেলল মুসা। বরফের ঠাণ্ডা ওর কিছুই করতে পারল না। 'বাড়ি থেকে বেরোনোর আগেই নিশ্চয় পোস্ট করে দিয়েছিল।'

'উঁহু, জানি না,' মাথা নাড়ল রবিন। 'পোস্টমার্ক পড়ার সাধ্য নেই। তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, লস অ্যাঞ্জেলেস থেকেই পোস্ট করা হয়েছে।'

'হুঁ, বুঝতে পেরেছি,' মুখে আইসক্রীম নিয়ে বলল মুসা। 'আমাদের ঝামেলায় ফেলার জন্যে লজ্জিত। সেটা মেরামত করার জন্যে...' বাক্সটার দিকে চোখ পড়তে বলে উঠল, 'ডার্ক চকলেট? কিন্তু তুমি তো ওগুলো খাও না।'

'না, খাই না,' রবিন বলল। 'এটাই তো প্রশ্ন। ক্যাসি জানে আমি এ জিনিস পছন্দ করি না। তারমানে এটা কোন ধরনের মেসেজ, মৃত কুকুরের নাম বলার মত। আমি একেবারে শিওর।' দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের দৃষ্টিতে দুই বন্ধুর দিকে তাকিয়ে রইল সে। 'ক্যাসি আমাকে কিছু বোঝানোর চেষ্টা করছে।'

'বেশ,' লাল রঙের একটা বড় নোটবুক বের করল কিশোর। 'তোমার তথ্যগুলো আগে লিখে ফেলা যাক। তারপর সেটা নিয়ে আলোচনা করব।'

'ওফ্!' জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলল রবিন, মহাস্বস্তির। 'যাক, অবশেষে বোঝাতে পারলাম তোমাকে।'

'বুঝেছি কিনা এখনও জানি না,' কিশোর বলল। 'তবে তুমি যখন এতটাই শিওর, সেটাকে এ ভাবে উপেক্ষা করা ঠিক না। অন্তত আলোচনা তো করা

যেতে পারে।' লেখার সুবিধের জন্যে আইসক্রীমের বাক্সটা ঠেলে একপাশে সরিয়ে দিল সে। নোটবুকটা রেখে বলপেনের চোখা দিকটা পিস্তলের নলের মত করে রবিনের দিকে ধরে বলল, 'এক নম্বর : ক্যাসি সময় মত নিউ ইয়র্ক থেকে এসে পৌঁছায়নি, ঠিক যখন তার আসার কথা ছিল, যদিও প্লেন আর ট্রেনের টাইম টেবলে কোন গোলমাল হয়নি।'

মুসা বলল, 'দুই : রবিনকে ফোন করে একটা কুকুরের নাম বলল, বহুকাল আগেই যেটা মরে ভূত হয়ে গেছে।'

'ভূত হয়নি, মরে গেছে,' শুধরে দিল কিশোর। 'গোয়েন্দা গল্পে ভূতের স্থান নেই।'

'আচ্ছা, তিন : এবং এটা সবচেয়ে ইমপরট্যান্ট,' রবিন বলল, 'ক্যাসি কাউকে এমন করে ঝামেলায় ফেলার মেয়ে নয়। আমি ওকে চিনি। শুধু শহর দেখার জন্যে এমন করে ডোবাবে না আমাদের। তা ছাড়া আমাদের বাড়িতে বেড়াতে আসছে সে। শহর দেখতে চাইলে একা একা বেরোনোর চেয়ে আমাদের নিয়ে গেলে যে অনেক সুবিধে হবে, এটা না বোঝার কথা নয় তার।'

'হ্যাঁ, এটা সত্যি ইমপরট্যান্ট পয়েন্ট,' লিখে নিতে নিতে বলল কিশোর। 'চার নম্বর পয়েন্ট : আজ সকালে ক্যাসি একটা পার্সেল পাঠিয়েছে। লস অ্যাঞ্জেলেস থেকে। ডার্ক চকলেট।'

'খুশি করার জন্যে,' আইসক্রীম খেয়েই যাচ্ছে মুসা। রবিনের দিকে তাকাল। 'তোমার জন্যে থ্যাংক-ইউ প্রেজেন্ট হতে পারে।'

'জেনেশুনে এমন এক উপহার পাঠাল,' রবিন বলল, 'যেটা আমি পছন্দ করি না।'

বলপেন তুলে গালে ঠেকাল কিশোর, 'আর কিছু?'

'না,' মাথা নাড়ল রবিন, 'এ-ই।'

'হুঁ।' আবার বলপেন নামাল কিশোর। 'এখন দেখা দরকার, কোন্ কারণে আমরা ভাবতে পারছি না যে ও কোনও বিপদে পড়েছে।'

'ও ফোন করেছে,' মুসা বলল। 'আর জনি বিয়াভার সঙ্গে রয়েছে।'

'এবং জনি বিয়াভা ওর বাবার বিশ্বস্ত কর্মচারী,' কিশোর বলল।

বাটি থেকে চেঁছে চেঁছে আইসক্রীম তুলে মুখে পুরল মুসা। 'আর তোমার আঙ্কেল হারলো বলেছেন,' বাটির দিকে তাকিয়ে থেকে রবিনকে বলল সে, 'জনি বিয়াভার সঙ্গে থাকলে কোন সমস্যা হবে না ক্যাসির।' চকলেটের বাক্সটার দিকে তাকাল সে, 'আহা, আমার যদি এমন কিছু বন্ধু থাকত–আসবে বলে আসত না, তারপর লজ্জা পেয়ে চকলেট পাঠাত!'

'সরি, এখান থেকে তোমাকে দিতে পারব না,' রবিন বলল। 'কিশোরের কাছে শুনলাম, মেরিচাচী নাকি ডার্ক চকলেটই পছন্দ করেন। তিনি বাড়ি ফিরলে তাঁকেই দেব ভাবছি।' কিশোরের দিকে ফিরল আবার, 'শেষ জরুরী পয়েন্টটা হলো, আমি কোনমতেই সন্তুষ্ট হতে পারছি না যে ক্যাসির কিছু হয়নি। কি করা যায়, বলো তো?'

'সব সময়ই দেখেছি,' কিশোর বলল, 'যখন কোন সমস্যার সমাধান করা

যাচ্ছে না, কিছু সময়ের জন্যে সেই সমস্যাটা মাথা থেকে দূর করে দিয়ে অন্য কিছু ভাবলে আপনাআপনি সমাধানটা মাথায় চলে আসে।'

'কি করতে বলছ তাহলে এখন?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'এ সব সমস্যার কথা বাদছাদ দিয়ে চলো, রান্না শুরু করি।...মুসা, তোমার হলো?'

*

'বাড়িতে একটা ফোন করব নাকি?' কিছুক্ষণ পর বলল রবিন। 'ক্যাসি খোঁজ নিল কিনা জানা দরকার।'

'করো,' কিশোর বলল। রান্না প্রায় শেষ হয়ে এসেছে ওদের। 'মুসা, আবার চেখে দেখা শুরু করলে?'

'না না!' তাড়াতাড়ি হাত থেকে কাঁটাচামচটা ফেলে দিল মুসা। 'সব ঠিক আছে নাকি দেখছিলাম।'

ফোন সেরে ফিরে এল রবিন। ক্যাসির কাছ থেকে কোন মেসেজ আসেনি। ছেলেকে অস্থির হতে মানা করে দিয়েছেন রবিনের আম্মা। বলেছেন, ক্যাসির খবর আসামাত্র ফোন করবেন কিশোরদের বাড়িতে।

'মনে হয় আমার বাড়ি যাওয়া দরকার,' রবিন বলল। 'বলা তো যায় না!'

'কি বলা যায় না?' কিশোরের প্রশ্ন।

'আমি জানি না। যদি ক্যাসি ফোন করে এমন কিছু বলে যেটা কেবল আমিই বুঝতে পারব,' অনিশ্চিত ভঙ্গিতে একটা চেয়ারে বসে পড়ল রবিন। 'কেউ যখন কোন ব্যাপারে কাউকে বিশ্বাস না করে, বড় বিরক্ত লাগে।'

ওর কাঁধে একটা হাত রাখল কিশোর। 'আমরা তোমাকে বিশ্বাস করছি। কালকের মধ্যে যদি কোন খবর না আসে, তাহলে পুলিশের কাছে যাব।'

মুখ তুলে তাকাল রবিন। 'হ্যাঁ, এটাই করতে হবে।'

এ সময় ঘরে ঢুকলেন মেরিচাচী। টেবিলে রাখা বাক্সটা দেখেই চকচক করে উঠল চোখ, 'এই চকলেট কে এনেছেরে?'

'রবিন, চাচী,' কিশোর বলল। 'তোমার খুব পছন্দ তো...'

'তাহলেই বোঝ, ও আমার কথা কতটা ভাবে। তুই কি কখনও ভাবিস? কোনদিন এক বাক্স চকলেট এনে দিয়েছিস?'

'দেব আর কখন? সব সময়ই তো তোমার কাছে থাকে...'

'আনিসনি তাই বল।' বাক্সটা তুলে নিলেন মেরিচাচী। রবিনের দিকে তাকিয়ে হাসলেন। 'পরে খাব। রাতে টিভি দেখতে দেখতে। ওরকম সময়ে খেতেই সবচেয়ে ভাল লাগে।'

মুসার দিকে তাকিয়ে চোখ টিপল কিশোর। নীরব হাসি তিনজনের মুখেই।

দুপদাপ জুতোর শব্দ তুলে, সারা বাড়ি কাঁপিয়ে এসে ঘরে ঢুকল ডন। চিৎকার করে জিজ্ঞেস করল, 'কই, তোমাদের রান্না হলো? এত দেরি লাগে নাকি...'

ডন মেরিচাচীর বোনের ছেলে। ওর বাবা আইব্রাম হেনরি স্টোকার অনেক

বড় বিজ্ঞানী।

অ্যারিজোনায় থাকে ডনরা।

ওর বয়েস অল্প। মাত্র আট। বয়েসের তুলনায় ব্যাপক পড়াশোনা ছেলেটার। বুদ্ধিও আছে। আর আছে কথার হুল। ওর বাবা-মা বেশির ভাগ সময় দেশের বাইরে চলে যান। ডনকে রেখে যান মেরিচাচীর কাছে।

'দশ মিনিটের মধ্যেই হয়ে যাবে,' ডনের কথার জবাব দিল কিশোর।

'আরও দশ...'

'অত অস্থির হচ্ছিস কেন?' ধমক লাগালেন মেরিচাচী। 'হাতে এত ময়লা লাগিয়েছিস কোত্থেকে? দেখো কাণ্ড, গায়ে-মাথায়...এই, খালাসির কাজ করে এসেছিস নাকি? জলদি যা, হাত-মুখ সাফসুতরো করে আয়। দেখে আসিস, তোর খালুর হলো নাকি। বলবি, কিশোর, মুসা আর রবিন মিলে রান্না করেছে আজ। দশ মিনিটের মধ্যে যদি না আসে, সব খেয়ে সাফ করে ফেলব আমরা।'

পুরানো কয়েকটা কাঠের জিনিস পেয়েছেন রাশেদ পাশা। সেগুলো মেরামতে ব্যস্ত। খবর পেয়ে ছুটতে ছুটতে এলেন। ডনের হাত ধরে ঘরে ঢুকলেন তিনি।

'টেনে না আনলে জীবনেও আসত না,' হেসে বলল ডন। 'কিশোরভাই, আগে খালুকে দিয়ে তোমাদের খাবার টেস্ট করিয়ে নাও।'

'টেস্ট?' ভুরু কুঁচকাল কিশোর। 'খাবারের স্বাদ পরীক্ষা করাতে বলছ?'

'স্বাদ না, স্বাদ না, টি-ই-এস-টি টেস্ট, মানে পরীক্ষা,' ডন বলল। 'অন্য কারও ওপর দিয়ে যাক আগে, সেটাই চাই। বিষ খেতে রাজি নই আমি।'

'ঠিক আছে, টেস্টটা আমিই করব আগে,' আড়চোখে ডনের দিকে তাকালেন রাশেদ পাশা। 'তবে যেটা টেস্ট করব, সেটা আমি বেশি খাব। ভাল লাগলে সবটাও খেয়ে ফেলতে পারি। তখন কিছু বলা চলবে না।'

লাফ দিয়ে গিয়ে পড়ল ডন, 'এই মাংসের বড়াগুলো বাদে! বাকি যা ইচ্ছে খাও!'

মোটামুটি কাড়াকাড়ি করেই খেলেন রাশেদ পাশা আর ডন। মুসা ওদের সঙ্গে সামিল হতে পারল না। নিজেরা রান্না করেছে। চক্ষুলজ্জা বলে একটা ব্যাপার আছে। নির্লিপ্ত মুখভঙ্গি করে তাকিয়ে থাকতে হলো তাই। চোখে করুণ দৃষ্টি নিয়ে অল্প অল্প করে খেতে হলো। মনে মনে গেল রেগে। নিকুচি করি নিজের হাতের রান্নার!

খাওয়ার পর ডনকে আটকে ফেললেন রাশেদ পাশা। বেশি যেমন খেয়েছে, তার খেসারতও দিতে হবে। এঁটো বাসন-পেয়ালা ধোয়ায় তাঁর সহকারী বানালেন ডনকে। মুচকি হেসে চকলেটের বাক্স হাতে টেলিভিশন দেখতে চলে গেলেন মেরিচাচী। মুসা আর রবিনকে নিয়ে কিশোর চলে এল ওপরতলায়, তার নিজের ঘরে।

'ক্যাসি ফোন করল কিনা কে জানে!' ঘরে ঢুকে প্রথম কথাটা বলল রবিন। 'যদি এমন হয়, ও ফোন করল, মা জানল না, তখন?'

'ক্যাসির ব্যাপারটা তোমার মগজে চেপে গেছে,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর।

'এটা নিয়ে সকালে ভাবলেও তো চলে। দশ মন ভারী হয়ে গেছে আমার পেট। আমি আর বসে থাকতে পারছি না,' লম্বা হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল মুসা। 'এখন রহস্য নিয়ে আলোচনার অবস্থা নেই।'

'ক্যাসি এলে কি কি করব, সেটা নিয়ে বরং কথা বলা যাক,' কিশোর বলল।

'যদি আসতে পারে সে,' রবিন বলল।

কিশোর বুঝতে পারছে, রবিনের দুশ্চিন্তা কাটানোর একটাই উপায়, সেটা হলো ক্যাসিকে নিরাপদে রকি বীচে ফিরিয়ে আনা। উঠে গিয়ে ক্যাসেট প্লেয়ার চালিয়ে দিল। গান ভালবাসে রবিন। তার একটা প্রিয় গান বাজতে লাগল।

গানটা অর্ধেক শেষ হয়েছে, এই সময় দরজায় থাবা মারতে শুরু করল ডন। 'রবিনভাই, রবিনভাই, দরজা খোলো। টেলিফোন! তোমার আম্মা!'

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল রবিন। দুই বন্ধুর দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে বলল, 'ক্যাসি!' বলেই দৌড়ে চলে গেল।

উজ্জ্বল হাসি নিয়ে বেরিয়েছিল, মুখ চুন করে ফিরে এল রবিন। 'মাকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ফিরে এসে দেখে সারা বাড়ি তছনছ। এক্ষুণি যেতে হবে আমাকে।'

ছয়

চোখ বড় বড় করে একে অন্যের দিকে তাকাতে লাগল ওরা।

'হঠাৎ করে এ ভাবে আমাদের বাড়িতে ডাকাত পড়ল কেন?' চিৎকার করে উঠল রবিন। 'বাড়িতে তো দামী কিছু থাকে না। মা বলল, আলমারি আর টেবিলের যেখানে যতগুলো ড্রয়ার পেয়েছে, টেনে টেনে খুলেছে। সব নাকি ওলট-পালট করে ফেলেছে। বেচারা মা, মাথা খারাপ হয়ে গেছে নিশ্চয়! আমার যাওয়া ছাড়া উপায় নেই।'

'কি রে, খারাপ কিছু?' দরজা খোলা দেখে উঁকি দিয়েছেন মেরিচাচী। হাতে একগাদা পুরানো খবরের কাগজ। গুছিয়ে রাখবেন বোধহয়।

ফিরে তাকাল রবিন। 'আমাদের বাড়িতে ডাকাত পড়েছে!'

'ডাকাত! বলো কি! আমি কি কোন সাহায্য করতে পারি?' আন্তরিক সহানুভূতি দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলেন মেরিচাচী। 'দাঁড়াও, এক মিনিট! চট করে কোটটা নিয়ে আসি আমি। গাড়িতে করে পৌঁছে দিয়ে আসব তোমাকে।'

'আমরাও যাচ্ছি,' কিশোর বলল। 'চলো। আন্টি কি পুলিশে ফোন করেছেন?'

'মনে হয় না,' রবিন বলল। 'দেখি, মাকে ফোন করে আরেকবার কথা

বল্লে...'

'রবিন,' মেরিচাচী বললেন কোমল স্বরে, 'তোমার আম্মাও নিশ্চয় পুলিশের কথা ভেবেছেন। তোমার অত উতলা হওয়ার দরকার নেই।'

'তা ঠিক,' মাথা ঝাঁকাল রবিন। 'আমরা যেমন প্রথমেই পুলিশের কথা ভেবেছি, মা-ও ভাববে। তবে আমার তাড়াতাড়ি বাড়ি যাওয়া জরুরী। মাকে সাহায্য করা দরকার।'

মেরিচাচী হাসলেন। রবিনের কাঁধে আলতো চাপড় দিলেন। তারপর রওনা হলেন গাড়িতে ওঠার জন্যে।

রবিনদের বাড়িতে এসে দুটো পুলিশ-কারের মাঝখানে গাড়ি ঢোকালেন তিনি।

'আমার কিছু করা লাগবে?' মিসেস মিলফোর্ডকে দরজায় বেরোতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন।

মুখচোখ লাল হয়ে গেছে রবিনের আম্মার। বাড়ি ঢুকে ঘরের অবস্থা দেখে রীতিমত একটা ধাক্কা খেয়েছেন। 'জিনিসপত্র অগোছাল করে রেখে গেছে, গেছে, তা নিয়ে ভাবছি না। রাগ লাগছে আমার জিনিসপত্র হাতড়ে বেড়িয়েছে কে না কে, সে-কথা ভেবে।'

দরজা থেকে সরে দাঁড়ালেন ঘরে ঢোকার জায়গা করে দেয়ার জন্যে। নাটকীয় ভঙ্গিতে হাত তুলে দেখালেন, ঘরের কি অবস্থা।

প্রতিটি ড্রয়ারের জিনিসপত্র টেনে বের করে ছড়িয়ে ফেলা হয়েছে মেঝেতে। সারা ঘরের জিনিস সব তো তছনছ করেছেই, সোফার কুশনগুলো পর্যন্ত কেটে, ছিঁড়ে ভেতরের তুলোটুলো সমস্ত কিছু বের করে ফেলেছে। অস্বস্তিকর দৃশ্য।

মায়ের কাছে গিয়ে দাঁড়াল রবিন। 'কি করে ঘটল এ সব? ঢুকল কিভাবে?'

'একটা ফোন এল,' মিসেস মিলফোর্ড বললেন। 'অচেনা একটা কণ্ঠ আমাকে বলল, তুই অ্যাক্সিডেন্ট করেছিস, হাসপাতালে আছিস। কোন কিছু না ভেবে দিলাম দৌড়।' মাথার চুলে আঙুল চালালেন তিনি। 'হাসপাতালে গিয়ে দেখি কিছু না, এ রকম কোন অ্যাক্সিডেন্টের কথা শোনেইনি ওরা। ফিরে এলাম। ঘরে ঢুকে দেখি এই অবস্থা।'

'তারমানে বোকা বানিয়ে তোমাকে বের করে নিয়ে গিয়েছিল,' তিক্তকণ্ঠে বলল রবিন। 'বাড়িটাকে পুরোপুরি খালি করতে চেয়েছিল ওরা।'

একটা কফি টেবিলের কিনারে বসে পড়লেন মিসেস মিলফোর্ড। হাঁটু কাঁপছে। 'এত্তবড় শয়তান লোক! ফোন করে মিথ্যে কথা বলে ভোগাল আমাকে। তারপর ঘরে ঢুকে জিনিসপত্র তছনছ...'

'কিছু কিছু শয়তান লোক থাকেই দুনিয়ায় মানুষকে যন্ত্রণা দেয়ার জন্যে,' মেরিচাচী বললেন। 'জিনিসপত্র বেশি নিয়েছে নাকি? দেখেছেন?'

শুকনো, বিষণ্ণ হাসি হাসলেন মিসেস মিলফোর্ড। 'এখনও তো কিছু বুঝতে পারছি না। টেলিভিশনটা ওই যে, জায়গামতই আছে। ভিসিআরটাও আছে। যা যা নেয়ার মত, সবই আছে দেখতে পাচ্ছি। কাণ্ড দেখে মনে হতে

পারে, জিনিস নিতে নয়, জায়গাটাকে ভেঙেচুরে লণ্ডভণ্ড করতেই যেন ঢুকেছিল ওরা।'

একটা কুশন তুলে নিয়ে সোফায় রাখল রবিন।

'রবিন, থাক থাক!' কিশোর বলল। 'পুলিশে...'

বাধা দিয়ে মিসেস মিলফোর্ড বললেন, 'না না, ঠিক আছে। পুলিশ এখানকার কাজ শেষ করে গেছে।' রবিনের দিকে তাকালেন তিনি। 'ওপরতলার অবস্থা আরও ভয়াবহ। তোর ঘরটা, বিশেষ করে। সবগুলো ড্রয়ার খুলেছে। ওয়ারড্রোবের ভেতরে বলতে গেলে কোন জিনিসই রাখেনি। সব বের করে ছড়িয়েছে। আর রান্নাঘরে...' হতাশ ভঙ্গিতে কেবল মাথা নাড়তে লাগলেন তিনি। মেরিচাচীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনারা এসেছেন, খুশি হয়েছি। কিন্তু আপাতত কিছুই করার নেই আপনাদের। পুলিশ এখনও সারা বাড়ির ছবি তুলে বেড়াচ্ছে। ওদের শেষ না হলে কিছু ছোঁয়া যাবে না। ওরা চলে গেলে আমাকে আর রবিনকেই সব করতে হবে,' গলা কাঁপছে তাঁর। ছেলের দিকে তাকালেন। 'তোর সন্ধেটাই মাটি হলো আজ, রবিন।'

'না, হয়নি,' রবিন বলল, 'তুমি কিছু ভেবো না। এ মুহূর্তে তোমার অবস্থাই বরং আমার চেয়ে খারাপ।'

'আমরা থাকি, আন্টি,' মুসা বলল। 'পুলিশ চলে গেলে সব সাফসুতরো করতে আপনাদের সাহায্য করতে পারব।'

'এমন লণ্ডভণ্ড করেছে, কোনখান থেকে যে শুরু করব, তা-ই বুঝতে পারছি না,' মিসেস মিলফোর্ড বললেন।

'আপনার আর দুশ্চিন্তা করে কাজ নেই,' মেরিচাচী বললেন। 'কষ্টও করতে হবে না। মুসা আর কিশোর থাক। ওরা যদি হেঁটে বাড়ি ফিরতে না চায়, দরকার হয় পরে এসে ওদের তুলে নিয়ে যেতে পারব।' মিসেস মিলফোর্ডের বাহুতে হাত রাখলেন তিনি, 'কোন কিছুর প্রয়োজন হলে জানাবেন আমাকে।'

সিটিং রুমের কাজ সেরে গেছে পুলিশ। এখানে গোছাতে বাধা নেই। গোছাতে শুরু করল তিন গোয়েন্দা, একজন সার্জেন্ট উঁকি দিল দরজায়। 'মিসেস মিলফোর্ড, আমরা এখন যাচ্ছি। কি কি চুরি হয়েছে লিস্ট করে পরে আমাদের জানাবেন। একটা কথা, শুনে কোন লাভ হবে না আপনার, তা-ও বলি; কাঁচা চোরের কাজ এটা। ছোকরাবয়েসী চোর, নেশা করার টাকা জোগাড়ের জন্যে হাতাতে এসেছিল সম্ভবত। পেশাদার মোটেও নয়, কাজ দেখেই বোঝা যায়।'

'আমার ঘরে যেতে পারব এখন?' জানতে চাইল রবিন।

মাথা ঝাঁকাল অফিসার।

দোতলায় দৌড়ে উঠে এল তিনজনে।

দরজায় দাঁড়িয়ে তাকিয়ে রইল রবিনের ঘরের ভেতরে। ঠিকই বলেছেন মিসেস মিলফোর্ড, ঘরের অবস্থা ভয়াবহ। বিছানাটা পর্যন্ত উল্টে ফেলেছে। কাত হয়ে পড়ে আছে ফাইলিং কেবিনেটটা। ড্রয়ারগুলো খোলা। জিনিসপত্র আর কাগজ সারা ঘরের কার্পেটের ওপর ছড়ানো।

'ওফ, আর তাকাতে পারছি না!' চিৎকার করে উঠল রবিন। 'দেখো খালি, অবস্থাটা কি করেছে!'

সান্ত্বনা দেয়ার জন্যে ওর কাঁধে হাত রাখল কিশোর। 'নিচে গিয়ে বরং আন্টিকে সাহায্য করো তুমি। আমি আর মুসা এখানটা গুছিয়ে ফেলি।'

'না, আমিও থাকি...' রাগে গলা আটকে আসছে রবিনের। 'কোন শয়তানে যে এ কাজ করল, ব্যাটাকে ধরতে পারলে...' রাগ দমন করে নিজেকে শান্ত করার আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল সে। 'আমার ঘর আমিই গোছাতে পারব, আস্তে-ধীরে। তোমরা বরং গিয়ে মাকে সাহায্য করো। ঘর গোছানো না হলে আর মনে শান্তি পাবে না মা।'

নিচতলায় নেমে এল মুসা আর কিশোর। মিসেস মিলফোর্ড রান্নাঘর পরিষ্কার করছেন। ওরা দুজন ঢুকল বসার ঘরে।

জানালা দিয়ে তাকিয়ে হঠাৎ অস্ফুট শব্দ করে উঠল কিশোর।

'কি হলো?' জানতে চাইল মুসা।

'গাড়িটা। দেখো?'

অন্ধকার রাস্তার দিকে তাকাল মুসাও। রাস্তার উল্টোধারে আলো নিভিয়ে বসে আছে একটা সবুজ রঙের গাড়ি। ড্রাইভিং সীটে বসে থাকা লোকটাকে চেনা যাচ্ছে না, তবে আছে যে বোঝা যাচ্ছে। আবছা একটা মুখ কাত হয়ে পাশের জানালা দিয়ে তাকিয়ে আছে এ দিকে।

'কে লোকটা?' প্রশ্ন করে জবাবটাও মুসা নিজেই দিল, 'অতি কৌতূহলী কেউ যাচ্ছিল হয়তো এ পথে। পুলিশ দেখে দাঁড়িয়ে গেছে কি ঘটছে দেখার জন্যে। এ ধরনের মানুষগুলোকে তো চেনো; কাজ নেই কর্ম নেই, কোথাও কিছু ঘটতে দেখলেই সব কিছু বাদ দিয়ে দাঁড়িয়ে যায়।'

'আমরা আসার আগে থেকেই ও আছে ওখানে,' চিন্তিত ভঙ্গিতে নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর। 'গাড়ি থেকে নামার সময়ই দেখেছি।'

'খবরের কাগজের লোক নাকি? রিপোর্টার?'

'তাহলে জানতে আসছে না কেন কি হয়েছে?' দরজার দিকে এগিয়ে গেল কিশোর। 'ওর সঙ্গে কথা বলতে যাচ্ছি আমি।'

জানালা দিয়ে তাকিয়ে রইল মুসা। ঘরের ভেতরের আলো গিয়ে তেরছা হয়ে পড়েছে খোলা দরজা দিয়ে গাড়ি বারান্দায়। সেই আলোর মধ্যে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে কিশোর।

ওর উদ্দেশ্য বোধহয় বুঝে ফেলল লোকটা। জ্বলে উঠল হেডলাইট। সোজা এসে কিশোরের ওপর পড়ল। নড়ে উঠল গাড়িটা। ইঞ্জিনের জোরাল শব্দ তুলে দ্রুত সরে পড়ল।

বসার ঘরে ফিরে এল কিশোর।

'তোমাকে দেখেই ভয়ে পালাল,' মুসা বলল। 'চেহারা দেখেছে নাকি?'

'না, তবে নাম্বার প্লেটটা দেখেছি,' পকেট থেকে নোটবুক বের করে তাতে নম্বরটা টুকে রাখল কিশোর। 'পেছনের জানালায় একটা স্টিকার লাগানো, দাবার ছকের মত। চাকাগুলোও অদ্ভুত, সাদাটে মনে হলো।'

'চুরির সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক আছে ভাবছ নাকি? এত সময় ধরে এখানে বসেই বা আছে কেন?'

'চোরের দলের কিনা জানি না,' কিশোর বলল। 'তবে এতক্ষণ ধরে বসে যেহেতু ছিল, কিছু না কিছু নিশ্চয় চোখে পড়েছে।...গাড়ির নম্বরটা পুলিশকে দিতে হবে। কোনখান থেকে কি বেরিয়ে পড়বে, কে জানে।'

সিটিং রুমটাকে আগের পর্যায়ে ফিরিয়ে আনার যথাসাধ্য চেষ্টা করল দুজনে। তারপর রওনা হলো রবিনের কতদূর হয়েছে দেখার জন্যে।

রবিনকেও গাড়িটার কথা বলল কিশোর। ওর চোখে পড়েছে কিনা জিজ্ঞেস করল। কিন্তু নিজের কাজে এত ব্যস্ত ছিল রবিন, কিছুই লক্ষ করেনি। সব শুনে মুসার মত তারও ধারণা হলো, কোন কৌতূহলী লোক এ পথে যেতে যেতে কি ঘটেছে দেখার জন্যে থেমে গিয়েছিল।

'অন্যের বিপদে মজা পাওয়া লোকগুলো যে কি সাংঘাতিক!' একগাদা কাগজ নিয়ে গিয়ে ডেস্কে ফেলল রবিন।

'কিছু খোয়া গেছে নাকি?' জানতে চাইল মুসা।

'মনে হয় না। কি জন্যে যে ঢুকেছিল ব্যাটারা, খোদাই জানে! কি খুঁজতে এসেছিল? দামী তো কোন কিছুই নেই এখানে। মা'র ঘরে অলঙ্কারপাতি আছে, কিন্তু আমার ঘরে তো কিচ্ছু নেই।'

'ঢুকেছিল যেহেতু,' কিশোর বলল, 'কোন না কোন জিনিসের খোঁজে নিশ্চয় এসেছিল। এত ঘাঁটাঘাঁটি শুধু শুধু করেনি। এমন কিছু, ওরা মনে করেছিল ড্রয়ারে কিংবা বিছানার নিচে লুকানো আছে।'

'কার কাছে খোঁজ পেয়ে এল?' মুসার প্রশ্ন।

'কি জিনিসের জন্যে এল?' রবিনের প্রশ্ন।

খপ করে ওর হাত খামচে ধরল কিশোর। 'রবিন! জিনিসটা একটা ছোট প্যাকেট হতে পারে! আজ সকালে ক্যাসির কাছ থেকে যে জিনিসটা এসেছিল, ওরকম কিছু!'

মগজের বেয়ারিংগুলো ঝড়ের গতিতে চালু হয়ে গেছে কিশোরের। 'রবিন, মনে হচ্ছে, শুরু থেকে ঠিক সন্দেহটাই করে এসেছ তুমি!' হাঁ হয়ে যাওয়া দুই সহকারীর দিকে তাকিয়ে বলল সে, 'সত্যি কি কোন বিপদ হলো ক্যাসির? চকলেটের বাক্সে করে কোন মেসেজ পাঠায়নি তো? যে লোকগুলো ওকে আটকে রেখেছে, ওরা কি জেনে গেছে বাক্সে করে কি পাঠিয়েছে ও? কি করবে এখন ওরা?'

'কোন্ লোকের কথা বলছ?' রবিনের প্রশ্ন। 'ও তো রয়েছে জনি বিয়াভার সঙ্গে।'

'সত্যি কি? জনি বিয়াভার গলা কি তুমি চেনো? চেনো না। ফোনে যে কেউ কথা বলে থাকতে পারে। এমনও তো হতে পারে, জনি আর ক্যাসি–দুজনকেই আটকে ফেলেছে ওরা।'

ভ্রূকুটি করল রবিন, 'এটা তো ভাবিনি! কিশোর...'

'আমিও না,' কিশোর বলল। 'বের করার একটাই উপায়। চকলেটের

বাক্সটাতে খোঁজা। আমার অনুমান ভুল হয়ে থাকলে বাক্সের মধ্যে কিছুই পাব না।'

'কিন্তু যদি ঠিক হয়,' মুসা বলল, 'ধরে নিতে হবে গোড়া থেকেই ঠিক সন্দেহ করছিল রবিন।' কিশোরের দিকে তাকাল সে, 'মেরিচাচীর কাছ থেকে বাক্সটা এখন আদায় করতে হবে আবার। ইতিমধ্যে যদি খুলে ফেলেন...'

'ভাল কথা মনে করেছ! এখুনি চাচীকে মানা করে দিতে হবে বাক্সটা যাতে না খোলে,' রবিনের দিকে তাকাল কিশোর। 'তোমাদের বাড়ি থেকেই ফোন করব। বাড়ি গিয়ে বাক্সটা দেখে তোমাকে ফোন করে জানাব, কিছু পাওয়া গেল কিনা। মুসা, এসো।'

প্রায় ছুটে বেরিয়ে গেল কিশোর।

সাত

বাক্সটা নিয়ে মুসাকে সহ সোজা নিজের ঘরে চলে এল কিশোর।

খোলার জন্যে তর সইছে না। কিন্তু তাড়াহুড়া করল না। বেশি তাড়াতাড়ি করতে গেলে সূত্র নষ্ট করে ফেলার ভয় আছে। খুব সাবধানে ফিতে খুলে বাক্সের ডালা তুলল।

ওপরে রয়েছে এক টুকরো কুঁচকানো কাগজ। কাঁপা হাতে ওটা তুলে উল্টে দেখল কিশোর।

দেখার জন্যে গলা বাড়িয়ে এল মুসা। সারি দিয়ে সুন্দর করে সাজানো চকলেট। খুব স্বাভাবিক মনে হচ্ছে। কুঁচকানো কাগজটা কিশোরের হাত থেকে নিয়ে আলোর দিকে তুলে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখতে দেখতে বলল, 'অদৃশ্য কালি দিয়ে সাঙ্কেতিক মেসেজে লেখেনি তো?'

'অদৃশ্য কালি? মাঝে মাঝে কল্পনাটা একটু বেশি করে ফেলো তুমি। পুরো অবস্থাটা চিন্তা করে দেখো। একটা মেয়েকে জোর করে ধরে নিয়ে গেল কেউ। তোমার কি মনে হয় ওই সময় এত চিন্তা করে অদৃশ্য কালি কেনার সুযোগ বা সময় কোনটাও পাবে সে?'

'আমি একটা যুক্তির কথা বললাম আরকি,' মুসা বলল। 'হতেই হবে এমন কোন কথা নেই।' বাদাম বসানো একটা চকলেট তুলে নিয়ে কামড় বসাল। 'হুঁম,' মাথা দুলিয়ে বলল, 'খারাপ না। এগুলোর নিচে কি আছে?'

'মুসা, এগুলো খাওয়ার জন্যে না।'

'খাচ্ছি না তো। চিবিয়ে দেখছি, ভেতরে কিছু ভরে দিয়েছে নাকি ক্যাসি,' বোকার হাসি হাসল মুসা। 'আরেকটা খেয়ে দেখব?'

'না, হাত সরাও।'

চকলেটের প্রতি দুটো স্তরের মাঝখানে ঢেউ খেলানো টিনের মত শক্ত তৈলাক্ত কাগজ, আলাদা করে রাখার জন্যে, যাতে লেগে যেতে না পারে।

কাগজটা ধরে ওপরের স্তরের চকলেটগুলো সব তুলে ফেলল কিশোর।

দুজনেই তাকাল, নিচে কি আছে দেখার জন্যে। আরেক স্তর চকলেট থাকার কথা। কিন্তু কিছুই নেই। তার জায়গায় রয়েছে টিস্যু পেপারে মোড়া কি যেন।

'খাইছে!' হাঁ করে মোড়কটার দিকে তাকিয়ে আছে মুসা। 'তুলে দেখো না কি আছে!'

সাবধানে মোড়ক সহ জিনিসটা তুলে আনল কিশোর। মুসার দিকে তাকাল। 'কি আছে, আন্দাজ করো তো?'

'পারব না। খোলো।'

'বোমা-টোমা না হলেই হয়। ভারী তো যথেষ্ট,' অস্বস্তি বোধ করছে কিশোর। হাতের তালুতে নিয়ে মোড়কটার ওজন আন্দাজ করল। 'আসলেই ভারী।'

'রবিনকে নিশ্চয় বোমা পাঠাবে না ক্যাসি, তাই না?' অধৈর্য হয়ে হাত বাড়াল মুসা, 'দেখি, তোমার ভয় লাগলে দাও আমার কাছে।' কিশোরের হাত থেকে প্রায় কেড়ে নিয়ে ছিঁড়ে ফেলতে শুরু করল মোড়কটা। 'দেখলে তো, বোমা না···কিশোর! দেখো দেখো!'

আলোয় ঝলমল করে উঠল একটা নেকলেস। হীরা আর চুনি বসানো অতি চমৎকার একটা হার, যা কোন রাজকুমারীর গলাতেই মানায়।

স্তব্ধ বিস্ময়ে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইল দুই গোয়েন্দা। মুসার হাতে ঝুলছে নেকলেসটা। আলো লেগে ঝিক-ঝিক করে উঠছে পাথরগুলো।

আট

মুসার হাত থেকে নেকলেসটা নিয়ে নিল কিশোর।

'বাপরে বাপ, কি জিনিস!'

ধীরে ধীরে হারটা দুলছে তার হাতে। রূপার খাঁজে বসানো পাথরগুলো দ্যুতি ছড়াচ্ছে ক্রমাগত। বৈদ্যুতিক আলো শুষে নিয়ে যেন ছড়িয়ে দিচ্ছে নিজের দেহ থেকে।

জিভ দিয়ে শুকনো ঠোঁট ভেজাল মুসা। 'কি মনে হয় তোমার? আসল হীরা না নিশ্চয়?'

দ্যুতি ছড়ানো হীরার সম্মোহন থেকে জোর করে দৃষ্টি সরিয়ে নিল কিশোর। মুসার দিকে তাকাল। 'না, মনে হয় না। এটা সম্ভবত ক্যাসির বাবার নকল ডিজাইনগুলোর একটা। কিন্তু···'

'নকল হলেও সাংঘাতিক! আসলের মতই লাগছে দেখতে। যদিও আসল-নকলের পার্থক্য আমি বুঝতে পারছি না।'

'এইটাই হলো কথা,' মাথা দোলাল কিশোর। 'নকল হলে কেউ পরতে

চাইবে না।'

'বোকার মত একটা প্রশ্ন করি, অ্যাঁ? টিটকারি দিয়ো না। বাক্সের নিচে এল কি করে ওটা, বুঝতে পারছ কিছু?'

বাক্সটার দিকে তাকানোর কথা মনে পড়ল এতক্ষণে কিশোরের। ভাল করে দেখল, আর কিছু আছে নাকি বাক্সে। ক্যাসির দেয়া কোন নোট বা মেসেজ। কিন্তু ওসব কিছু নেই।

'নিরাপদে থাকার জন্যে দিয়েছে,' কিশোর বলল। 'আর কেন দেবে?'

'হ্যাঁ, তা বটে,' এমন ভঙ্গিতে ঠোঁট চোখা করে মাথা দোলাল মুসা, যেন সব বুঝে ফেলেছে। 'কিন্তু কার কাছ থেকে নিরাপদ? রবিনের কাছে পাঠাল কেন ক্যাসি?'

'রবিন!' চমকে গেল যেন কিশোর। 'আরে বাক্সের মধ্যে কি আছে দেখে ওকে তো ফোন করার কথা। ভুলেই গিয়েছিলাম।' আলতো করে আবার টিস্যু পেপারটা দিয়ে নেকলেসটা মুড়িয়ে রাখল সে। 'ফোন করতে যাচ্ছি।'

সিঁড়ির গোড়ায় দেখা হয়ে গেল চাচার সঙ্গে।

'কোথায় যাচ্ছিস?'

'রবিনকে ফোন করতে।'

'এত রাতে? ঘড়ি দেখেছিস ক'টা বাজে?'

দেখল কিশোর। মাঝরাত পেরিয়ে গেছে। 'রবিনকে শুধু দুটো কথা বলব।'

'দুটো কেন, দশটা বল্‌গে, যদি পাওয়া যায়। সে নিশ্চয় এখন বিছানায়। রবিন না ঘুমালেও মিসেস মিলফোর্ড ঘুমিয়ে পড়েছেন। এত রাতে ফোনের শব্দে ঘুম ভেঙে যাবে তাঁর। বিরক্ত করা উচিত হবে না। বরং সকালে করিস। অত জরুরী নিশ্চয় নয়?'

'না···মানে···থাক, বলছ যখন, সকালেই করব।'

ঘরে ফিরে এল কিশোর।

'কি হলো, যাওনি?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'নাহ্, এত রাতে নিশ্চয় ঘুমিয়ে পড়েছে···'

'কক্ষনো না। ও আমাদের অপেক্ষা করবে। আমাদের কাছ থেকে খবর না পেয়ে ঘুমাবেই না।'

'আন্টির অসুবিধে হতে পারে।' চাচার সঙ্গে দেখা হওয়ার কথা জানাল কিশোর। চাচা কি বলেছেন, বলল মুসাকে।

মুসাও ভেবে দেখল, কথাটা ঠিক।

নেকলেসটা ড্রেসিং টেবিলের কোনায় ঝুলিয়ে রেখে শোয়ার জন্যে তৈরি হলো কিশোর। মুসা আগেই চিত হয়ে পড়েছে বিছানায়। আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ল কিশোর। বেডসাইড ল্যাম্পের আলোয় এখনও চকচক করছে নেকলেসটা।

'রবিনের আঙ্কেলের নতুন ডিজাইনে বানানো বোধহয় হারটা,' কিশোর বলল। 'থাইল্যান্ডের রাজকীয় ডিজাইনে। কি বলো? দেখে রাজকীয় জিনিস

মনে হয় না?'

'খুব হয়'। দাম কেমন হতে পারে, বলো তো?' ঘুম ঘুম স্বরে জিজ্ঞেস করল মুসা।

'আসল না নকল সেটাই বুঝতে পারছি না। আসল হলে অনেক দাম হবে।'

'হুঁ।'

'ক্লিওপেট্রার নতুন ডিজাইনই হবে সম্ভবত,' কিশোর বলল। 'তাহলেও এটা অনেক দামী। টপ সিক্রেট জিনিস। রবিন কি বলেছিল মনে আছে? নতুন ডিজাইনের জিনিস বাজারে ছাড়ার আগে গোপন রাখে, প্রতিদ্বন্দ্বী কোম্পানিদের ভয়ে। ওদের হাতে ডিজাইনটা পড়লে আগেই বানিয়ে বাজারে ছেড়ে দিতে পারে।'

ঘুম দূর হয়ে গেল মুসার। লাফ দিয়ে বিছানায় উঠে বসল। 'তাহলে তোমার কি মনে হচ্ছে এটা আনকোরা নতুন ডিজাইনের নেকলেস?' উত্তেজনায় গলা কাঁপছে তার। 'কিন্তু এ জিনিস নিজের কাছে না রেখে সাধারণ একটা চকলেটের বাক্সে ভরে রবিনের কাছে পাঠিয়েছে কেন?'

'কেন বুঝতে পারছ না?'

'না।'

'বেশ, বুঝিয়ে দিচ্ছি। ক্যাসি আর জনি বিয়াম্ভা লস অ্যাঞ্জেলেসে এসেছে ব্যবসার কাজে। সঙ্গে করে নতুন ডিজাইনের স্যাম্পল নিয়ে এলে সেটা বিক্রির চেষ্টা করবে। নাকি?'

'হ্যাঁ, করবে।'

'তাদের পেছনে প্রতিদ্বন্দ্বী কোম্পানির চর লেগে যেতে পারে। একই প্লেনে করে নিউ ইয়র্ক থেকে আসতে পারে, কিংবা আগেই এসে দলবল নিয়ে বসে থাকতে পারে লস অ্যাঞ্জেলেসে। নতুন ডিজাইনটা কেড়ে নেয়ার চেষ্টা করতে পারে।'

'এবং ক্যাসি আর জনি সেটা আঁচ করে ফেলেছিল!' কিশোরের কথাটা শেষ করে দিল মুসা। 'হাতে সময় কম। কিন্তু নেকলেসটা সরিয়ে দেয়া দরকার। শত্রুদের নাগালের বাইরে।'

'এই তো বুঝতে পারছ!' উত্তেজনার চোটে কিশোরও আর শুয়ে থাকতে পারল না। উঠে বসল। 'পাঠিয়ে দিয়েছে রবিনের কাছে। এত কম সময়ে নিরাপত্তার এরচেয়ে ভাল ব্যবস্থা আর কি হতে পারে? হারটা পাঠানোর পর পরই শত্রুর গুপ্তচর ধরে ফেলেছে ওদের। আটকে রেখেছে। ওদের জিনিসটা আদায় না করা পর্যন্ত আর ছাড়বে না।'

'তাহলে ফোন যে করল? উল্টোপাল্টা তো কিছুই বলল না। একেবারে স্বাভাবিক কথাবার্তা।'

'ওটা স্রেফ ধোঁকাবাজি,' কিশোর বলল। 'ফোনটা করিয়েছে ওদেরকে আটকে ফেলার পর। ক্যাসি সম্ভবত ওর এখানে আসার কথা বলেছে। সুতরাং তাকে ফোন করতে বাধ্য করেছে, যাতে সে সময়মত না এলে রবিনদের কোন

সন্দেহের উদ্রেক না হয়।'

কিশোরের দিকে তাকিয়ে আছে মুসা, 'এবং তারপর কোনভাবে প্যাকেটটার কথা জেনে গেছে। ওটার খোঁজে তছনছ করে দিয়ে গেছে রবিনদের বাড়িটা।'

'পায়নি, তার কারণ,' নিজেকেই বোঝাল কিশোর, 'ওটা এখানে নিয়ে এসেছে রবিন। কিছুই না জেনে, এর মধ্যে কি আছে।'

'প্রথমবারে তো বেঁচে গেল,' হারটার দিকে তাকিয়ে ভারী একটা নিঃশ্বাস ফেলল মুসা। 'কিন্তু এরপর? এটাকে বাঁচানোর কি উপায়? এখনও কেউ জানে না এটা আমাদের কাছে আছে। জানলে এখানেও আসবে। কি করব?'

'প্রথমে হারটা লুকানোর ব্যবস্থা করতে হবে,' কিশোর বলল। 'তারপর পুলিশের কাছে যাওয়া। কাল সকালে উঠেই রবিনদের বাড়ি যাব। তাকে নিয়ে পুলিশের কাছে যাব।'

একটা মুহূর্ত চুপ করে থেকে ভাবল মুসা। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'কিন্তু হারটা কোথায় লুকাব? সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা কোনখানে?'

'তোমাদের বাড়িতে।'

'আমাদের বাড়িতে কেন!'

'কারণ, ওরা যদি রবিনদের বাড়ির ওপর চোখ রেখে থাকে–আমার দৃঢ় বিশ্বাস তা-ই রেখেছে ওরা, তাহলে শিওর হয়ে যাবে ওর যাতায়াত আমাদের এখানে বেশি। হারটা এখানে রেখে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। সুতরাং আমাদের বাড়ির দিকে নজর দেবে ওরা। তোমাদের বাড়িতে আমাদের কাউকে এ পর্যন্ত যেতে দেখেনি ওরা। অতএব অতটা গুরুত্ব দেবে না। এবং সেই সুযোগটাই নেব আমরা।'

'হুঁ। রাখতে অসুবিধে নেই,' মুসা বলল। 'বাবার দেয়াল আলমারিটায় রেখে দেব। সবচেয়ে নিরাপদে থাকবে।'

'ঠিক আছে,' হাই তুলল কিশোর। 'অনেক রাত হলো। নাও, এবার শুয়ে পড়ো। সকাল সকাল উঠতে হবে আবার।'

নয়

জিনিসপত্র গোছগাছ করতে করতে অনেক রাত হয়ে গেল। মাকে প্রায় জোর করে শুতে পাঠাল রবিন। নিজে জেগে রইল, কারণ কিশোর বলে গেছে বাক্সে কিছু থাকলে ফোন করে জানাবে।

মা চলে যাওয়ার পর সবগুলো ঘর আরেকবার ঘুরে দেখল রবিন। জানালা-দরজা সব ঠিকমত লাগানো হয়েছে কিনা দেখল। সব ঠিক আছে। বন্ধ। ছিটকানি লাগানো। খোলা পেয়ে চট করে ঢুকে পড়তে পারবে না আর কেউ।

অনেক রাত। এখনও যখন ফোন এল না, ধরেই নিল সে-বাক্সে কিছু পাওয়া যায়নি, তাই ফোন করাটা আর জরুরী মনে করেনি কিশোর। কিন্তু তা-ও খুঁতখুঁত করতেই থাকল মনটা। না পেলেও তো জানাবে বলেছে কিশোর।

বিছানায় এসে শুয়ে পড়ল। ভাবতে লাগল আকাশ পাতাল। ক্যাসির পাঠানো প্যাকেটটার জন্যেই যে ওদের বাড়িতে তল্লাশি চালানো হয়েছে তাতে কোন সন্দেহই নেই তার।

'গোড়া থেকেই সন্দেহটা ছিল আমার,' ভাবছে সে, 'কিন্তু কেউ আমার কথা বিশ্বাস করেনি। মুসা আর কিশোর করেছে এখন। বাকিদেরও করাতে হবে।'

লাফ দিয়ে বিছানায় উঠে বসল উত্তেজিত রবিন। আঙ্কেল হারলোকেও করাতে হবে।

কিন্তু পরক্ষণে হতাশ হয়ে গেল। কোথায় পাবে আঙ্কেলকে? তিনি তো এখন ক্যাটস্কিল মাউনটেইনে।

জনি একটা নম্বর দিয়েছে, জরুরী মুহূর্তে টেলিফোন করার জন্যে। নিউ ইয়র্কে যদি যোগাযোগ করতে পারে, আর ওরা মেসেজ পাঠায় আঙ্কেল হারলোর কাছে, তিনি জানতে পারেন তাঁর মেয়ে বিপদের মধ্যে রয়েছে, উদ্ধারের একটা ব্যবস্থা নিশ্চয় করবেন।

বেডসাইড লাইটটা জ্বেলে ঘড়ি দেখল রবিন। অনেক রাত। কিন্তু ফোন নিশ্চয় ধরবে। রাতে তো আর জরুরী ফোন ছাড়া করে না লোকে।

নম্বরটা বাড়ির, নাকি অফিসের জানে না সে। তবে সারাক্ষণ নিশ্চয় কেউ না কেউ থাকে ডিউটিতে। যদি প্রয়োজনের সময় যোগাযোগই করা না গেল তাহলে জরুরী নম্বর রেখে লাভটা কি?

শব্দ না করে ঘর থেকে বেরিয়ে এল রবিন। মায়ের কানে কোন শব্দ গেলেই এখন চমকে যাবে। চেঁচামেচি শুরু করবে। ঘুমটাও যাবে। বাবা যে ঘরটাকে অফিস হিসেবে ব্যবহার করে, সেটাতে চলে এল সে। জানালার পর্দাগুলো টানা। বাইরের আলোর আভা আসছে পর্দা ভেদ করে। সেই আলোতে নম্বর দেখে দেখে ডায়াল করল।

রিঙ হচ্ছে। অফিসের নম্বর হলে অ্যানসারিং মেশিনের জবাব শুনতে হতে পারে। তাহলে নিজের নম্বর দিয়ে বলতে হবে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে।

রিঙ বন্ধ হয়ে গিয়ে কণ্ঠটা কানে আসতে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সে।

'হালো?' শব্দটা শুনতেই রিসিভারে আঙুলগুলো আপনাআপনি শক্ত হয়ে গেল রবিনের। 'আমি মিস্টার রোনাল্ড হারলোর সঙ্গে কথা বলতে চাই। অত্যন্ত জরুরী।'

'কিন্তু তিনি তো এখন ছুটিতে। কার সঙ্গে কথা বলছি?'

'তিনি আমার খালু। আমি লস অ্যাঞ্জেলেসের রকি বীচ থেকে বলছি।'

'ও,' বিশেষ গুরুত্ব দিল না কণ্ঠটা। 'যা বলার আমাকেই বলো। আমি জানিয়ে দেব মিস্টার হারলোকে।'

'কথাটা তাঁর মেয়ের সম্পর্কে,' রবিন বলল। 'এখন তার আমাদের বাড়িতে থাকার কথা। কিন্তু কোন একটা অঘটন ঘটেছে তার।' এ যাবৎ যা যা ঘটেছে সব সংক্ষেপে জানাতে গিয়ে গলা চড়ে যাচ্ছে তার। সবশেষে জানাল ওদের বাড়িতে চোর ঢোকার ঘটনাটা। বলার পর বলল, 'আঙ্কেলকে বলবেন, রকি বীচের পুলিশকে জানাব আমরা।'

'আমার মনে হয় এ ধরনের কিছু করার আগে তোমার আঙ্কেলের জন্যে অপেক্ষা করা দরকার,' হঠাৎ সতর্ক হয়ে উঠল কণ্ঠটা। 'হুট করে কিছু করে পরে যদি জানতে পারো, দুদিন শহর দেখার জন্যে রয়ে গিয়েছিল মিস হারলো, লজ্জায় পড়ে যাবে।'

চুপ হয়ে গেল রবিন। লোকটা কি কোন রকম গুরুত্ব দিচ্ছে তার কথার?

'কিন্তু আমি জানি, গণ্ডগোল হয়েছে,' রবিন বলল।

'কিন্তু আমার তা মনে হয় না,' লোকটা বলল। 'খানিক আগেও মিস্টার বিয়াভার সঙ্গে কথা হয়েছে আমার। তিনি জানালেন, শহর ঘুরে দেখতে বেরোচ্ছেন তাঁরা।'

'আপনার সঙ্গে তার কথা হয়েছে?' বিশ্বাস করতে পারছে না রবিন। 'তারমানে আপনি জানেন ওরা কোথায় আছে?'

'জানি। হোটেলে। তারমানে বুঝতেই পারছ, অহেতুক দুশ্চিন্তা করছ তুমি...'

'কোন হোটেল?'

'সরি। আমাকে সেটা বলেনি। শোনো, রবিন, তোমার কথা আমি জানাব মিস্টার হারলোকে। আমার অনুরোধ থাকবে, তিনি তোমার সঙ্গে যোগাযোগ না করা পর্যন্ত পুলিশের কাছে যাওয়ার মত কোন পদক্ষেপ তোমরা নেবে না। তাঁর ফোনের জন্যে অপেক্ষা করবে।'

'কিছুই হয়নি' বলে লোকটা তাকে যতই বোঝানোর চেষ্টা করুক, বুঝতে চাইল না রবিন। তবে তর্ক করল না আর। বলল, 'বেশ। কিন্তু একটা সাহায্য তো করতে পারেন আপনি। ক্যাসি আমাকে বলেছে, তার কুকুরটা নাকি অসুস্থ, গর্ডনের কথা বলছি। আপনি কি জানেন ওটা সুস্থ হলো কিনা?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, গর্ডন তো?...কুকুরটা...ভাল হয়ে গেছে। কোন সমস্যা নেই।'

রিসিভার নামিয়ে রাখল রবিন।

বুঝতে পারছে, পুরো ব্যাপারটাই সাজানো হয়েছে ওদের ধোঁকা দেয়ার জন্যে। সোজা কথা, ক্যাসি এখন বিপদের মধ্যে রয়েছে।

কি করা যায় এখন?

পর্দার ওপাশে উজ্জ্বল আলো দেখা গেল হঠাৎ। বাড়ির পেছন দিকে ঘোরাঘুরি করছে আলোটা।

জ্বলছে। নিভছে। জ্বলছে।

নড়ছে।

টর্চ!

অন্য কোন রাতে হলে সে ভাবত, বিড়াল হারিয়েছে পড়শীর, খুঁজতে

বেরিয়েছে। কিন্তু আজকে আর সেটা ভাবল না। বিড়াল খুঁজতে আসেনি কেউ। অন্য কিছু খুঁজতে এসেছে।

অদ্ভুত শিহরণ বয়ে গেল সারা গায়ে।

এগিয়ে আসছে আলো।

মখমলের ভারী পর্দাটার আড়ালে লুকিয়ে পড়ল সে। জানালার কাছে দাঁড়িয়ে জানালা খোলার চেষ্টা করল লোকটা। না পেরে সরে গেল। সরে যাচ্ছে আলোটা।

দম আটকে রেখেছে রবিন। এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে মাথা সরিয়ে বের করে এনে দেখার চেষ্টা করল কোনদিকে গেছে আলোটা।

দেখতে পেল লোকটাকে। গাঢ় রঙের ট্রাউজার পরা। বাড়ির দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ওপর দিকে তাকিয়ে আছে।

রবিনের বেডরুমের দিকে।

রান্নাঘরের পাশে বৃষ্টির পানি নামার পাইপ। ওটার কাছে গিয়ে একটা মুহূর্ত কি দেখল লোকটা। তারপর বেয়ে উঠতে শুরু করল।

দশ

আবার পর্দার আড়ালে থেকে বেরিয়ে এল রবিন। হাত বাড়াল টেলিফোনের দিকে। পুলিশকে ফোন করবে। হাতেনাতে ধরিয়ে দিতে পারলে বিশ্বাস করানো সহজ হবে।

কিন্তু হঠাৎ করে মায়ের ঘরের আলো জ্বলে উঠল। গায়ে এসে পড়ল লোকটার। যেটুকু উঠেছিল, ওখান থেকেই লাফ দিয়ে মাটিতে পড়ল সে। ছুটে হারিয়ে গেল অন্ধকারে।

খানিক পর একটা গাড়ি স্টার্ট নিল রাস্তার দিকে।

ফোন থেকে হাত সরিয়ে আনল রবিন। ডেস্কের ওপরের আলোটা জ্বালার আগে পর্দাটা ভালমত টেনে দিল।

*

'রবিন!'

হলের আলো জ্বলল। দরজায় এসে দাঁড়ালেন মিসেস মিলফোর্ড। 'কি করছিস? আমার জান উড়িয়ে দিয়েছিলি!'

'আমি...পুলিশকে ফোন করতে যাচ্ছিলাম,' গলা কাঁপছে রবিনের। 'ঘুম আসছিল না, তাই পানি খেতে নেমেছিলাম,' নিউ ইয়র্কে ফোন করার কথাটা চেপে গেল সে। 'এই সময় বাগানে দেখি একটা লোক, টর্চ জ্বালল...এগিয়ে গেল পেছনের পানির পাইপটার দিকে। বেয়ে উঠতে শুরু করেছিল আমার ঘরে। তুমি আলো জ্বালতে পালিয়ে গেল।'

আঁতকে উঠলেন মিসেস মিলফোর্ড। 'কি বলছিস তুই! তাহলে তো

এক্ষুণি পুলিশকে ফোন করা দরকার। দেখি, দে তো, আমার কাছে দে।'

এগিয়ে এসে রিসিভার তুলে নিলেন তিনি। কথা বললেন পুলিশের সঙ্গে। রিসিভার রেখে রবিনকে জানালেন, 'একটা শব্দ শুনে জেগে গিয়েছিলাম।'

'ওই লোকটাই করে থাকবে,' রবিন বলল। 'আমি কোন শব্দই করিনি।'

'হবে হয়তো। ভাবলাম, আবার চোর এসেছে। পা টিপে টিপে নেমে এলাম।' হাসলেন মিসেস মিলফোর্ড। 'বাড়ি মারার জন্যে একটা লাঠিটাঠি খুঁজছিলাম...'

'কিন্তু একটা ভুল করে ফেলেছিলে, আলো জ্বেলে। আলো দেখেই লোকটা পালিয়েছে। লাঠি পেলেও বাড়ি মারার জন্যে মাথাটা পেতে না।'

'মনে হয় আগের লোকটাই, কি বলিস?...কিন্তু বার বার কেন আসছে এ ভাবে? কি নিতে?'

বলতে গিয়েও বলল না রবিন।

হলঘরে এসে বসল দুজনে পুলিশের অপেক্ষায়।

তার সন্দেহের কথা বলে ফেলল রবিন। জানাল, ক্যাসির পাঠানো চকলেটের বাক্সটা নিতে আসছে চোর।

'শুরু থেকেই সন্দেহ হচ্ছিল আমার,' বলল সে, 'ক্যাসির কিছু হয়েছে।'

ভুরু কুঁচকে রবিনের দিকে তাকালেন মিসেস মিলফোর্ড, 'আগেও বলেছিস এ কথা।'

'বলেছি, কিন্তু তোমাকে তো বিশ্বাস করাতে পারছি না।'

'চকলেটের বাক্সটা এখন কোথায়?'

'কিশোরদের বাড়িতে।'

এক মুহূর্ত ভাবলেন মিসেস মিলফোর্ড। 'পুলিশকে সব বলে দেয়া দরকার।' ছেলের দিকে তাকিয়ে ক্লান্ত ভঙ্গিতে হাসলেন। 'ভাবিসনে। ক্যাসিকে ওরা খুঁজে বের করবে।'

কিন্তু নিশ্চিন্ত হতে পারল না রবিন। 'পারলে তো ভালই।'

*

সব শুনে গম্ভীর ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল পুলিশ অফিসার।

একজন নোট বইতে সব কথা লিখে নিতে লাগল, আরেকজন টর্চ নিয়ে বাগানে গেল সূত্র খুঁজতে।

ফিরে এসে জানাল, 'জুতোর ছাপ আছে কিছু। সকাল বেলা কাউকে পাঠিয়ে দেব, ছাঁচ তুলে নিয়ে যাবে।'

নোট লিখছিল যে অফিসার, মিসেস মিলফোর্ডের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কোন চিন্তা করবেন না এ নিয়ে। রাস্তায় পাহারা রেখে যাব। গোপনে নজর রাখবে। চোরটা আবার এলেই যাতে ধরতে পারে।'

'ক্যাসির বাবাকে একটা খবর যদি দিতে পারতেন,' মিসেস মিলফোর্ড বললেন, 'ভাল হত।'

'দেব,' বলে রবিনের দিকে তাকাল অফিসার। 'মাকে নিয়ে কাল যত তাড়াতাড়ি পারো থানায় চলে এসো। সঙ্গে করে চকলেটের বাক্সটাও নিয়ে

যেয়ো।'

'ক্যাসিকে খুঁজে বের করুন আপনারা,' রবিন বলল।

'তা তো করবই। দুশ্চিন্তা কোরো না।'

*

টেলিফোনের তীক্ষ্ণ শব্দে ঘুম ভেঙে গেল রবিনের। চমকে উঠে বসল বিছানায়। ঘড়ি দেখল দশটা বাজে।

বেরিয়ে এল ঘর থেকে। যে ঘরে বাজছে সেখানে ঢুকে তুলে নিল রিসিভার।

ভেসে এল কিশোরের উত্তেজিত কণ্ঠ, 'রবিন?...কল্পনাও করতে পারবে না চকলেটের বাক্সটায় কি পেয়েছি।'

'তোমরাও কল্পনা করতে পারবে না কাল রাতে আরও কত কি ঘটে গেছে। আবার চোর এসেছিল, পুলিশ ডাকা হয়েছিল। ক্যাসির কথা সব বলে দিয়েছি ওদের।...কিশোর, বাক্সটা কি এখনও তোমার কাছেই আছে?'

'হ্যাঁ, আমাদের কাছে,' জবাব দিল কিশোর। 'মুসাদের বাড়ি থেকে বলছি আমি। বাক্সের মধ্যে একটা নেকলেস ছিল, বুঝলে?...হার, হার। হীরা আর চুনি বসানো একটা হার।'

'হার!'

'বললাম না, কল্পনাও করতে পারবে না। মনে হয় তোমার হারলো আঙ্কেলের নতুন ডিজাইন। দারুণ জিনিস।'

'এখনই আসছি আমি। তুমি থাকো ওখানে।'

দৌড়ে এসে মা'র বেডরুমের দরজায় দাঁড়াল রবিন। টোকা দিল। তারপর দরজা খুলল।

দেখল, মা ঘুমাচ্ছে। এত গভীর ঘুম দেখে ডেকে আর বিরক্ত করতে মন চাইল না। বিড়বিড় করে বলল, 'ঠিক আছে, মা, তুমি ঘুমাও। আমি যাচ্ছি।'

*

রবিনকে দেখেই বলে উঠল মুসা, 'বিছানা থেকে উঠে এলে নাকি? দেখে তো মনে হচ্ছে সাইক্লোনের মধ্যে পড়েছিলে।'

'সাইক্লোনই ধরতে পারো,' জবাব দিল রবিন। 'সারাটা রাতই প্রায় ঘুমাতে পারিনি।'

যা যা ঘটেছে, সব খুলে বলল রবিন। স্তব্ধ হয়ে সমস্ত কথা শুনল মুসা আর কিশোর।

সব শোনার পর কিশোর বলল, 'শিওর, সেই লোকটাই। প্রথমবার যে এসে খোঁজাখুঁজি করে গেছে। ক্যাসি আর জনি বিয়াভাকে ধরে আটক করেছে। এখন নেকলেসটা খুঁজছে।' জোরে নিঃশ্বাস ফেলল সে। 'তবে ওটা আর পাচ্ছে না। নিরাপদে রয়েছে এখন মুসার বাবার আয়রন সেফে।'

ক্লান্ত ভঙ্গিতে হাসল রবিন, 'থাকুক, ভাল। কিন্তু আমাকে তো অন্তত একবার চোখের দেখা দেখতে দেবে?'

বের করে দিল মুসা। চোখ বড় বড় করে দেখতে লাগল রবিন। 'বাপরে!

একেবারে আসলের মত লাগছে। এ জন্যেই এর পেছনে লেগেছে আঙ্কেলের শত্রুরা। তারমানে ক্লিওপেট্রার নকল জিনিসগুলোও আসলের মতই লাগে। দাম কেমন হবে?...হাজার পাউন্ড?...লাখ?'

'এই একটা জিনিসের দাম হয়তো খুব বেশি নয়। তবে ডিজাইনটার দাম অনেক বেশি। কয়েক লক্ষ ডলার হলেও অবাক হব না। অন্য কোন জুয়েলারের হাতে পড়লে এটা দেখে দেখে যত খুশি কপি বানাবে আর বিক্রি করবে। সাধে কি আর বার বার তোমাদের বাড়িতে যাচ্ছে চুরি করে আনার জন্যে।'

'কিন্তু ব্যাটাকে ধরব কি করে? কোন সূত্র...'

'দাঁড়াও দাঁড়াও!' তুড়ি বাজাল কিশোর। 'গাড়িটা দেখেছি। ওটার পেছনের জানালায় দাবার ছকের মত স্টিকার লাগানো ছিল...'

কিশোরের মুখের কথা কেড়ে নিল রবিন, 'দাবার ছকের মত স্টিকার! আরে, চিনি তো! একটা গাড়ি ভাড়া দেয়ার কোম্পানির মনোগ্রাম ওই ছক। কোম্পানিটার নাম চেকবোর্ড হুইল। মা'র গাড়িটা গ্যারেজে দিলে কয়েক দিন চালানোর জন্যে ওদের কাছ থেকে গাড়ি ভাড়া করে আনে মা।'

'মুসা!' চিৎকার করে উঠল কিশোর। 'জলদি গিয়ে ফোনবুকটা নিয়ে এসো। নম্বর জানি, গাড়িটার রঙ দেখেছি, এখন কোম্পানির নামও জানলাম।' দুই সহকারীর দিকে তাকিয়ে উত্তেজিত হাসি হাসল সে। 'এই হারে এগোতে থাকলে পুলিশের আগেই রহস্যটার সমাধান করে ফেলতে পারব আমরা।'

এগারো

চেকবোর্ড হুইলের নম্বর জোগাড় করাটা কঠিন কোন ব্যাপার হলো না। কিশোর ডায়াল করছে, মুসা আর রবিন আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে আছে ওর দিকে।

সবুজ গাড়িটার বর্ণনা দিয়ে যখন জিজ্ঞেস করল কিশোর, প্রথমে বেশ ভদ্র আর মোলায়েম ব্যবহার করল অন্য পাশের মহিলা। বলল, 'হ্যাঁ, আমাদের গাড়ি বলেই তো মনে হচ্ছে।'

দুই সহকারীর দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল কিশোর। ইঙ্গিতে বোঝাতে চাইল—কাজ হচ্ছে। আর কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই জেনে যাবে, গাড়ির লোকটা জনি বিয়ান্ডা ছিল কিনা।

'কি জানতে চাও আসলে?' জিজ্ঞেস করল মহিলা। 'অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে নাকি?'

'না না, ওসব কিছু না। আমি শুধু জানতে চাচ্ছি, কালকে গাড়িটা কে ভাড়া করেছিল।'

'সরি,' মুহূর্তে বদলে গেল ওপাশের কণ্ঠস্বরটা। মোলায়েম ভঙ্গিটা থাকল না আর। 'এ ধরনের তথ্য কাউকে জানাই না আমরা।'

'দেখুন,' মরিয়া হয়ে উঠল কিশোর, 'ব্যাপারটা খুব সিরিয়াস।'
'আমি দুঃখিত,' শীতল জবাব।
আস্তে করে রিসিভার নামিয়ে রেখে দুই সহকারীর দিকে তাকাল কিশোর। মাথা নাড়ল।
'ধূর!' হতাশ ভঙ্গিতে বলল রবিন। 'আমি ভাবছিলাম কত সহজেই না হয়ে যাচ্ছে।' ঘড়ি দেখল সে। 'থানায় যাওয়া দরকার। দেরি হয়ে যাচ্ছে। পুলিশ সকাল সকাল যেতে বলে দিয়েছিল।'
'হারটা নেব নাকি?' তুলে দেখাল মুসা।
'না নেয়াই বোধহয় ভাল,' রবিন বলল। 'যদি পিছু নেয়? আমাদের গতিবিধির ওপর কড়া নজর রেখেছে ওরা।'
'তাহলে আলমারিতেই রেখে দিই। দেখতে চাইলে যে কোন সময় এসে দেখে যেতে পারবে পুলিশ।'
আলমারিতে হারটা রেখে দিল মুসা।
বেরোতে যাবে ওরা, এ সময় বাজল টেলিফোন।
ধরতে গেল মুসা। হলঘরে অপেক্ষা করতে লাগল কিশোর আর রবিন।
একটু পরেই ফিরে এল মুসা। মুখচোখ থমথমে। 'মা। দোকান থেকে করেছে। রাতের পচা পার্টির জন্যে জিনিস কিনে পাঠাচ্ছে। আমাকে থাকতে হবে সেগুলো রিসিভ করার জন্যে। বলো, জেদ লাগে না!'
ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল সে। 'আমাকে বাদ দিয়েই যেতে হবে তোমাদের।'
সিঁড়িতে ধপ করে বসে পড়ে থুতনিতে চিবুক রাখল সে। 'এ সব পার্টিফার্টির হাত থেকে কবে যে রেহাই পাব!'
তাকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্যে মনে করিয়ে দিল কিশোর, 'এই পার্টিগুলো প্রচুর দানের টাকা আনে। সমাজসেবার একটা আনন্দ আছে।'
'আনন্দ না কচু! নেই কাজ তো খই ভাজ। মা'র খেয়েদেয়ে আর কোন কাজ নেই তো…'
কি যেন চিন্তা করল কিশোর। রবিনের দিকে তাকাল, 'বরং এক কাজ করো। তুমি একাই চলে যাও থানায়। আমি মুসার সঙ্গে থাকি।'
রবিন বলল, 'ঠিক আছে। থানায় সবার যাওয়ার দরকারও নেই অবশ্য। তোমরা বসে বসে নেকলেসটা পাহারা দাও। এটাই বরং জরুরী।' কিশোরের দিকে তাকাল সে। 'তো, আবার দেখা হবে কোথায়? এখানে তো পার্টি। ঝামেলা না?'
'সে তো বটেই। এখানে হই-হট্টগোলের মাঝে শান্তিতে কথা বলতে পারব না। বরং বাইরেই কোথাও দেখাটা হতে পারে।'
গুঙিয়ে উঠল মুসা। 'কিন্তু বাইরে যদি বেরোতে না দেয় আমাকে? এই শাস্তির মধ্যে একা ফেলে দুজনে চলে যাবে?'
'আমি অবশ্য পার্টিতে এমনিতেও থাকতে পারব না,' রবিন বলল। 'বাড়িতে থাকাটাই উচিত। ক্যাসি আবার কখন ফোন করে বসে। তা ছাড়া

মাকেও একা ফেলে সন্ধ্যার পর বেরোনো ঠিক হবে না আজ। চোরের উপদ্রবে মা'র মনটন ভাল না।'

'না না,' বলে উঠল মুসা, 'বেরোনো তোমার মোটেও উচিত হবে না। তোমার আসার দরকার নেই। কিশোর, তুমি কি করবে?'

'দেখি, আমি নাহয় রবিনের সঙ্গে দেখা করে আবার ফিরেই আসব,' রবিনের দিকে তাকাল সে। 'কোথায় দেখা করতে চাও?'

'ডুগানের কফি শপে, বেলা আড়াইটায়?...তুমি ঠিক সময়ে রওনা হয়ে যেয়ো। যদি দেরি হয়েও যায় তোমার কোন কারণে, অসুবিধে নেই, তা-ও যেয়ো। আমি বসে থাকব। তবে যেতে অতিরিক্ত দেরি করে ফেলো না আবার।'

রবিনকে গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এল মুসা আর কিশোর।

বারো

'ভাবছি, বুঝলে?' মুসা বলল।

রবিন চলে যাওয়ার দুই ঘণ্টা পর সিটিং রূমে বসে কথা বলছে মুসা আর কিশোর। দুজনের জন্যে প্লেটে করে স্যান্ডউইচ এনে রেখেছে মুসা।

'কি?' একটা স্যান্ডউইচ তুলে নিল কিশোর।

দোকানের লোক এসে মালপত্র দিয়ে যাওয়ার অপেক্ষার ফাঁকে টেলিভিশন দেখতে দেখতে ক্যাসিকে নিয়ে আলোচনার অনেক সময় পেয়েছে ওরা।

'ওই তো, ক্যাসির কথাই,' স্যান্ডউইচে কামড় বসাল মুসা। 'যুক্তি দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করছি মনটাকে। ক্যাসির আসলে কি হয়েছে বলো তো?'

'আমার সন্দেহ, জনি বিয়াভাও এ সবের পেছনে রয়েছে,' জবাব দিল কিশোর। 'আর সেটা যদি সত্যি হয়, তাহলে কোথাও বন্দি করে রেখেছে ক্যাসিকে সে। নেকলেসটা না পাওয়া পর্যন্ত ছাড়বে না।'

'নেকলেসটা কোনখান থেকে পাঠাল ক্যাসি?'

'লস অ্যাঞ্জেলেস। পোস্টমার্কটা পড়া না গেলেও আমি শিওর।'

'তারমানে লস অ্যাঞ্জেলেসেই ওকে আটকে রাখা হয়েছে?'

'মনে হয়।'

'তাহলে রকি বীচে আসে কি করে জনি, নেকলেস খুঁজতে? বহু মাইল দূর থেকে আসতে হবে তাকে। ক্যাসিকে একা ফেলে আসবে না এ ভাবে? বরং এমন জায়গায় তো রাখার কথা, যেখানে সব সময় তাকে চোখে চোখে রাখতে পারে।'

'তুমি কি বলতে চাইছ, বুঝতে পারছি,' স্যান্ডউইচ চিবানো থামিয়ে দিল কিশোর। একটা নতুন আইডিয়া ঢুকতে আরম্ভ করেছে তার মাথায়। 'জনি বিয়াভা আর তার দলবল যদি রকি বীচে চলে এসে থাকে, তাহলে সঙ্গে করে

ক্যাসিকেও নিয়ে এসেছে। এখানেই আশেপাশে কোনখানে রয়েছে এখন সে, এই তো বলতে চাও? হুঁম্‌ম্‌!' চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা দোলাল কিশোর। 'কথাটা কিন্তু একেবারে অযৌক্তিক বলোনি। ক্যাসি এখন আমাদের হাতের কাছেই আছে, অথচ কোন সাহায্য করতে পারছি না আমরা। ভাবলে রাগই লাগে!'

'কিছুই কি করা যায় না? কোন রকম চেষ্টা?'

'দাঁড়াও, ভাবতে দাও,' মুখের খাবারটুকু আস্তে আস্তে চিবিয়ে গিলে নিল কিশোর। ভাবার জন্যে সময় নিল। উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার চোখমুখ। 'এক কাজ করা যেতে পারে। তোমার আম্মার ভয়াবহ্‌ পার্টিটাকেই কাজে লাগাতে পারি আমরা। রাতের মধ্যে যদি নেকলেসটা না নিতে আসে পুলিশ, সুযোগটা পেয়ে যাব আমরা। ভাগ্য ভাল হলে চোরের দলের খোঁজ পেয়েও যেতে পারি।'

আগ্রহে খাবার চিবানো বন্ধ করে দিয়েছে মুসা। ডান হাতটা শূন্যে স্থির। আধখাওয়া স্যান্ডউইচটা ধরে রেখেছে আঙুলগুলো। 'জলদি বলো! আমার আর সহ্য হচ্ছে না! পার্টির সঙ্গে চোরের কি সম্পর্ক?'

'কোন্‌ ধরনের মানুষকে দাওয়াত করেছেন আন্টি, সেটা তো ভাল করেই জানো। আমিও জানি,' কিশোর বলল। 'একটু আগে তুমি যখন স্যান্ডউইচ আনতে গেলে, দাওয়াতের তালিকাটা দেখে নিয়েছি আমি। রকি বীচে বড় বড় যত ধনী ব্যবসায়ী আছে, সবাইকে দাওয়াত করা হয়েছে।'

'তাতে কি?' বুঝতে পারল না মুসা।

'কোম্পানির ডিরেক্টর, মালিক আর বড় বড় দোকানের ম্যানেজারে ভরে যাবে তোমাদের বাড়ি,' মুসার বোকা হয়ে যাওয়া মুখের দিকে তাকিয়ে হাসল কিশোর। 'এখনও বুঝতে পারছ্‌ না, তাই না?...আচ্ছা বলো, কোন ধরনের লোকেরা নেকলেসটার ডিজাইন কিনতে কিংবা চুরি করতে আগ্রহী?'

'জুয়েলার!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা।

'ঠিক। পার্টিতে স্থানীয় কয়েকজন বড় বড় জুয়েলারও থাকবে। এমনকি ভাগ্য ভাল হলে, ঠিক যে লোকটাকে আমরা খুঁজছি, তাকেও দেখতে পাব পার্টিতে।' হাতের আধখাওয়া স্যান্ডউইচটায় কামড় বসানোর কথা এতক্ষণে মনে পড়ল কিশোরের। মুসাকে বলল, 'খাও। খেতে খেতেও কথা বলা যায়।...হ্যাঁ, যা বলছিলাম। ভেবে দেখো, যে লোকটা ক্লিওপেট্রার নতুন ডিজাইন চায়, কারও গলায় সে-ডিজাইনের নেকলেস দেখলে কি রকম চমকে উঠবে।'

'হার্ট অ্যাটাক হয়ে যাবে!' স্যান্ডউইচে কামড় বসাতে গিয়েও থেমে গেল মুসা।

হাসিটা বাড়ল কিশোরের। 'কথায় কথায় খাওয়া বন্ধ করে দিচ্ছ কেন? খাও।...যা বলছিলাম, লোকটার হার্ট অ্যাটাক না হলেও ভীষণ চমকে উঠবে।'

হাঁ করে কিশোরের দিকে তাকিয়ে রইল মুসা। 'আর চমকে গেলেই হাঁ হয়ে যাবে, কিংবা চোখ বড় বড় হয়ে যাবে। আমরা লক্ষ রাখব কার ওরকম প্রতিক্রিয়া হচ্ছে। দারুণ! দারুণ!' বাঁ হাত দিয়ে ছোট কফি টেবিলে কিল মারল

সে। 'কিন্তু একটা সমস্যা আছে। কার গলায় থাকবে নেকলেসটা?'

হাতের বাকি স্যান্ডউইচটা মুখে পুরে দিল কিশোর। ধীরে সুস্থে চিবিয়ে তারপর গিলল। মুসাকে টেনশনে রেখে মজা পাচ্ছে সে।

'আরে বলো না!' সহ্য করতে না পেরে চেঁচিয়ে উঠল মুসা।

'তুমি,' জবাব দিল কিশোর।

'ঠাট্টা রাখো!'

'তুমি,' শান্তকণ্ঠে বলল আবার কিশোর। 'তোমার কথাই বলছি। মুখে ভালমত রঙটঙ মেখে, বিউটি পার্লার থেকে ভাড়া করে একটা দামী পোশাক এনে, পরে, ভালমত সেজেগুজে ছদ্মবেশ নিতে পারলে দারুণ দেখাবে তোমাকে। যা লম্বা তুমি, আজকেই কৃষ্ণ সুন্দরী হিসেবে তোমাকে যদি মডেলিঙের অফার দিয়ে বসে কেউ, অবাক হব না।'

'সত্যি বলছ আমি···আমাকে মেয়ে সাজতে হবে···'

'হ্যাঁ। পচা পার্টিটা আর মোটেও একঘেয়ে লাগবে না তখন আমাদের কাছে।'

'কিন্তু, কিশোর,' উত্তেজনা অনেকটা কমে এসেছে মুসার, তার জায়গায় ঠাঁই নিয়েছে অস্বস্তি। 'ছদ্মবেশের ওস্তাদ হলে তুমি। তুমি মেয়ে সাজলে ভাল হত না?'

'না, হত না। কারণ নজরটা রাখতে হবে আমাকে। এটা নিশ্চয় স্বীকার করবে, সন্দেহজনক জিনিস তোমার চেয়ে আমার নজরে বেশি পড়ে। তুমি মেয়ে সেজে ঘুরে বেড়াবে, ডিজাইন-চোরের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে, আর আমি চোখ রাখব তোমার ওপর, তোমাকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করে খুঁজে বেড়াব তাকে···'

বাইরে গাড়ির শব্দ হলো। গেট দিয়ে ঢুকছে।

'ওই যে,' বলে উঠল মুসা, 'মাল নিয়ে এসেছে বোধহয়।'

কয়েক সেকেন্ড পরেই দরজার ঘণ্টা বাজল। খুলে দিতে গেল মুসা।

হ্যাঁ, দোকানের লোকই এসেছে।

দশ মিনিট পর, বাক্সগুলো হলঘরে রেখে চলে গেল লোকটা।

ঘড়ি দেখল কিশোর। 'বেরোনো দরকার। রবিনকে বসিয়ে রেখে লাভ নেই।'

'আর তো এখানে কোন কাজও নেই আমার,' মুসা বলল। 'চলো, আমিও যাব। মেয়ে সেজে গলায় হার পরে পার্টিতে ঘুরে বেড়াব আমি, এ কথা শুনলে রবিনের মুখের অবস্থাটা কি হয়, না দেখে থাকতে পারব না।'

হাসতে লাগল মুসা।

তার হাসিতে যোগ দিল কিশোর।

তেরো

ডুগান'স কফি শপের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে মুসা আর কিশোর।

'মনে হয় একটু সকাল সকাল চলে এসেছি,' জানালা দিয়ে ভেতরটা দেখতে দেখতে বলল মুসা। বিকেলের খরিদ্দারে বোঝাই ছোট্ট চায়ের দোকানটা। সাদা টেবিলক্লথে ঢাকা ছোট ছোট গোল টেবিল ঘিরে বসে আছে। গরম চা ঢালছে কাপে। চকচকে চীনামাটির প্লেট থেকে তুলে তুলে স্যান্ডউইচ আর স্কোন খাচ্ছে।

'কই, কোথাও তো দেখছি না,' আবার বলল মুসা। 'ভেতরে গিয়ে বসব নাকি?'

ঘড়ি দেখল কিশোর। 'তারচেয়ে বরং সময়টা কাজে লাগানো যাক। ডিপার্টমেন্ট স্টোরে গিয়ে রাতের জন্যে তোমার মেক-আপটা সেরে ফেলি।'

কিশোরের মুখোমুখি তাকাল মুসা। 'আসলেই বলছ! আমি তো ভাবছিলাম রসিকতা করছ।'

'এ কথা মনে হওয়ার কারণ কি?'

'না...এমনি...দেখো, কিশোর, আমার লজ্জা লাগছে!'

'আরে দূর, ব্যাটাছেলের আবার লজ্জা।' মুসার হাত ধরে টান দিল কিশোর, 'এসো।'

'কিন্তু রবিন এসে যদি চলে যায়?'

'যাবে না। তোমাকে বসিয়ে দিয়ে এসে আমি দাঁড়িয়ে থাকব।'

'আমার কাছে পয়সা নেই।'

'পয়সা তোমার কাছে আছে, আমি জানি সেটা। আর না থাকলে আমি দেব।...শোনো, একটা কথা আমাকে সত্যি সত্যি বলো তো। আজকে পার্টিতে তুমি থাকতে চাও, নাকি না?'

'চাই। কিন্তু মেয়ে সাজতে পারব না।'

'আরেকটা প্রশ্ন, ক্যাসিকে সাহায্য করতে চাও, নাকি চাও না?'

'ক্যাসি?' থমকে গেল মুসা। দ্বিধা করতে লাগল। তারপর বলল, 'আমি মেয়ে সাজলে ওর সাহায্য হবে?'

'হবে বলেই তো বলছি।'

'ঠিক আছে, যাও, একটা মেয়েকে বাঁচাতে যদি মেয়েই সাজতে হয়, সাজব। চলো, কোথায় যেতে হবে।'

*

মুসাকে বিউটি পার্লারে বসিয়ে দিয়ে এসে ডিপার্টমেন্ট স্টোরের গ্রাউন্ড ফ্লোরে ঘোরাফেরা করতে লাগল কিশোর।

পার্লারে ঢোকার পর সাজবে না বলে আবার মোচড় দিয়েছিল মুসা।

কিশোর আর বিউটিশিয়ান মহিলা জোর করে চেয়ারে বসিয়েছে তাকে। তবে প্রথমে মহিলাকে বোঝাতেও কিছুটা সময় লেগেছে কিশোরের।

আইলাইনার, মাসকারা, ব্লাশার, লিপস্টিক লাগাতে মুসার ভীষণ আপত্তি। কিন্তু মহিলা তার কোন আপত্তির ধার ধারেনি। তারপর একটার পর একটা লাগানো শুরু করেছে। কয়েক মিনিট দেখে কিশোরের যখন পেট ফেটে হাসি আসার জোগাড় হলো, আর দাঁড়িয়ে থাকেনি। বেরিয়ে চলে এসেছে।

কিন্তু শুধু শুধু ঘোরাফেরা করতে গেলে সময়ও কাটতে চায় না, বিরক্তও লাগে। তারচেয়ে কোন একটা কাজের মধ্যে নিজেকে ঢুকিয়ে ফেললে সময় কাটানো অনেক সহজ হয়ে যায়। তার যে কাজ সেটাই শুরু করল–গোয়েন্দাগিরি। দোকানগুলোর সামনে ঘুরে ঘুরে পাহারা দিতে লাগল, চোর ধরার জন্যে। এ সব বড় বড় ডিপার্টমেন্ট স্টোরে প্রায়ই চোর ঢুকে পড়ে। একআধটাকে যদি ধরা যায়, মন্দ হয় না।

কিন্তু তেমন কোন চোরের দেখা সে পেল না। কাউকে পাকড়াও করতে পারল না।

ঘড়ি দেখল। এতক্ষণে থানার কাজ শেষ করে রবিনের অবশ্যই চলে আসার কথা। নিশ্চয় এখন কফি শপে বসে আছে ওদের অপেক্ষায়।

কাঁচের একটা কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে কতগুলো কারুকাজ করা রঙিন ঘড়ি দেখছে কিশোর, একটা হাত পড়ল তার কাঁধে। কঠিন আঙুলগুলো কাঁধের মাংস খামচে ধরল তার।

'ধরেছি,' বলে উঠল একটা খসখসে কণ্ঠ। 'ঘড়ি চুরি করছিলে, না? রোজই চুরি যায়, ধরতে আর পারি না। আজ যাবে কোথায়?'

ফিরে তাকাল কিশোর। বিশালদেহী এক নিগ্রো তরুণী। রীতিমত সুন্দরী। হাতে ডিপার্টমেন্ট স্টোরের লোগো ছাপ দেয়া একটা প্লাস্টিকের ব্যাগ।

'আপনি ভুল করছেন, ম্যাডাম,' কিশোর বলল। 'আমি চোর নই। বরং চোর ধরার জন্যে ঘোরাঘুরি করছিলাম। বিশ্বাস না হলে পুলিশ চীফকে ফোন করে দেখুন।'

'সব চোরই প্রথমে এই কথা বলে,' গম্ভীর স্বরে বলল মহিলা। ব্যাগটা তুলে নাচাল কিশোরের নাকের নিচে। যেন ওটা দিয়েই বাড়ি মারবে।

'কিন্তু…কিন্তু আমার পকেটে কোন চোরাই মাল নেই, দেখুন!' পকেট উল্টে দেখাতে শুরু করল কিশোর।

'এটাও আরেকটা ভাঁওতা,' কণ্ঠস্বর বদল হলো না তরুণীর। 'সব ব্যাটার সঙ্গেই সহযোগী থাকে। পাচার করে দেয়। আমি তোমাকে স্পষ্ট ঘড়িটা তুলতে দেখলাম…'

'মিথ্যে কথা!' রেগে উঠল কিশোর।

'তা ঠিক, মিথ্যে কথাই বলেছি,' কণ্ঠস্বর বদলে গেল তরুণীর। খসখসে মহিলা কণ্ঠ আর নেই। পুরুষের গলা। হাসল হা-হা করে। 'তারমানে ছদ্মবেশটা ভালই হয়েছে। তুমিই যখন ধরতে পারোনি, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে, অভিনেতা হিসেবে আমিও খারাপ নই।'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত স্থির দৃষ্টিতে মুসার দিকে তাকিয়ে রইল কিশোর। তারপর মাথা ঝাঁকাল, 'হ্যাঁ, খুব ভাল হয়েছে।...চলো, জলদি, রবিনকে চমকে দেয়া যাক। ও নিশ্চয় অনেকক্ষণ ধরে বসে আছে।'

বাইরের উজ্জ্বল রোদে বেরিয়ে এল ওরা। দ্রুত হেঁটে চলল ফুটপাথ ধরে।

ডুগান'স কফি শপে এখন তিল ধারণের জায়গা নেই। দরজায় দাঁড়িয়ে ভেতরে উঁকি দিল কিশোর। রবিনকে দেখতে পেল না।

'কই, নেই তো। আরও বিশ মিনিট আগে চলে আসার কথা ছিল।'

'এই হট্টগোলের মধ্যে বসে থাকতে থাকতে বিরক্ত হয়ে উঠে চলে গেছে হয়তো।'

'উঁহু!' মাথা নাড়ল কিশোর। 'আমার তা মনে হয় না। আমি ভেতরে ঢুকে দেখে আসি।'

ওদের ঢুকতে দেখে এগিয়ে এল একজন ওয়েইট্রেস।

'সরি, জায়গা দিতে পারছি না এখন,' কিশোরের দিকে তাকিয়ে বলল সে। 'একটু পরে হলে...'

'বসার জন্যে আসিনি আমরা,' কিশোর বলল। 'একজনকে খুঁজতে এসেছি। আমার বয়েসী একটা ছেলে, বাদামী চুল, গোলগাল চেহারা; ইঞ্চিখানেক খাটো হবে। এমন কাউকে নিশ্চয় দেখেননি?'

নিজের অজান্তেই পুরো ঘরে নজর ঘুরে এল একবার মেয়েটার। মাথা নাড়ল, 'নাহ্, এত ভিড়ের মধ্যে কি আর কাউকে আলাদা করে চিনে মনে রাখার উপায় আছে?'

'তা ঠিক,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'যাই হোক, থ্যাংকস।'

বেরোনোর জন্যে পা বাড়াতে যাবে সে, এই সময় একটা টেবিল থেকে উঠে দাঁড়াল দুটো মেয়ে।

'ওই যে, খালি হয়েছে,' সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল মুসা। 'চলো, বসে পড়ি।'

মেয়ের মুখে ছেলের গলা শুনে কৌতূহলী হয়ে তাকাতে লাগল কেউ কেউ।

'আর বসে কি হবে?' কোন রকম উৎসাহ দেখাল না কিশোর। 'আমার মনে হয়, বাড়ি চলে গেছে রবিন। শুধু শুধু বসে থেকে সময় নষ্ট করার কোন মানে হয় না।'

'কিন্তু এতদূর এসে একেবারে খালি মুখে ফিরে যাব?' মুখটাকে করুণ করে ফেলল মুসা। মহিলা সাজার কারণে করুণ ভঙ্গিটা আরও বেশি করুণ দেখাল। 'দু'একটা স্যান্ডউইচ আর এক কাপ চকলেট অন্তত...'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে,' মহিলা-মুসার অনুরোধ ফেলতে পারল না কিশোর। 'তবে আধঘণ্টার বেশি বসব না। এর মধ্যে রবিন আসুক বা না আসুক বেরিয়ে যাব আমরা।'

চোদ্দ

কিন্তু রবিন এল না।

বাড়ি ফিরে এল মুসা। সঙ্গে কিশোর। ঘরে ঢুকে দেখল একটা থ্রী-রিং সার্কাসের মত তৈরি করে বসে আছেন মিসেস আমান। আর সেই সার্কাসের রিং-মাস্টার হলেন তিনি নিজে।

সাজানোর জন্যে ক্যাটারাররা এসে গেছে। পেছনের লম্বা ঘরটাতে টেবিল সাজাচ্ছে ওরা। যতটা সম্ভব সুন্দর করে। দামী খাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

হেসে কিশোরকে বলল মুসা, 'এটাই হলো মা'র গোপন অস্ত্র। ভাল জায়গায় এনে, ভাল ভাল খাবার খাইয়ে মুগ্ধ করা, তারপর মোটা মোটা চেকের জন্যে প্লেট বাড়িয়ে দেয়া। চক্ষুলজ্জায় হলেও তখন আর টাকা দিতে না করতে পারে না কেউ।'

'তুমি যেভাবে দেখছ ব্যাপারটাকে এতটা খারাপ ভাবে দেখার কোন কারণ নেই,' কিশোর বলল। 'নিজের টাকা খরচ করে, গায়ে খেটে, লোকের কাছ থেকে ভিক্ষে করে এতিমদের জন্যে টাকা আদায় করার মধ্যে একটা বিরাট মহত্ত্ব আছে। মাকে ব্যঙ্গ না করে তাঁর জন্যে তোমার গর্বিত হওয়া উচিত।'

লজ্জা পেয়ে চুপ হয়ে গেল মুসা।

ঘরে ঢুকলেন মিসেস আমান। কিশোরের সঙ্গে নিগ্রো তরুণীকে দেখে কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকালেন। 'কে উনি? তোমার পরিচিত কেউ নিশ্চয়?'

হাসল কিশোর। মাথা ঝাঁকাল। 'আমার বন্ধু।'

ভুরু কুঁচকে গেল মিসেস আমানের। কিশোরের মেয়ে বন্ধু। তা-ও এই সাইজের একজন যুবতী! স্তব্ধ হয়ে তাকাতে লাগলেন দুজনের দিকে।

আর থাকতে পারল না মুসা। হেসে ফেলল, 'মা, আমি।'

'মু-মু-মুসা, তুই! খোদা! এ কি কাণ্ড!'

'এ ভাবেই পার্টিতে যোগ দেব আমি, মা।'

'এ ভাবে...পার্টিতে...পাগল হয়ে গেছিস নাকি?'

'না, আন্টি,' জবাব দিল কিশোর। 'আমিই ধরে নিয়ে গিয়ে ওকে মেয়ে সাজিয়ে এনেছি। আমাদের নতুন একটা কেসের তদন্ত। তাতে মুসার ছদ্মবেশ নেয়াটা খুব জরুরী।'

'ও!' বিমূঢ়তা কাটছে না তা-ও মিসেস আমানের। স্থির দৃষ্টিতে ছেলের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হেসে ফেললেন হঠাৎ, 'ভাগ্যিস মেয়ে হোসনি। ভয়াবহ লাগত দেখতে। জঘন্য!'

'কেন, জঘন্য কেন?' আহতই হলো মুসা।

'অত্তবড় শরীর হলে কি আর কোন মেয়েকে দেখতে ভাল লাগে?'

'মেয়ে হলে কি আর এমন শরীর হত?'

'যদি হত...' ক্যাটারারদের দিকে চোখ পড়তেই বদলে গেল তাঁর মুখের ভঙ্গি। চিৎকার করে উঠলেন, 'আরে না না, ও কি করছ! ওভাবে না, ওভাবে না!' মুসার কথা ভুলে ছুটে গেলেন তিনি। 'এই ভাবে রাখো।'

মুখটাকে ফজলি আম বানিয়ে কিশোরের দিকে তাকাল মুসা। মনে হচ্ছে কেঁদে ফেলবে। 'তুমি বললে মডেলিঙে ডাকবে! মা যে অমন করে বলল?'

'আন্টির বোধহয় ছেলেদের বেশি পছন্দ,' হাসি লুকানোর জন্যে অন্যদিকে তাকিয়ে আছে কিশোর। ভাবছে, মুসার এই রূপ রবিনকে দেখাতে না পারলে একটা বিরাট মিস হয়ে যাবে। রবিনের কথা মনে পড়তেই ফিরে তাকাল, 'মুসা, রবিনকে একটা ফোন করা দরকার।'

'হ্যাঁ, তাই তো। ভুলেই গিয়েছিলাম।'

ফোন করতে চলল ওরা। কিন্তু ওদের আগেই বেরিয়ে গিয়ে ফোনটা যে ঘরে আছে, সে-ঘরে ঢুকলেন মিসেস আমান। ফোন তুলে নিলেন। একজন লোক ওখানে বসে গ্র্যান্ড পিয়ানো প্র্যাকটিস করছে পার্টিতে বাজানোর জন্যে।

ফোনটা তুলে নিয়ে কোণের দিকে গিয়ে একটা মোটামুটি নীরব জায়গায় বসলেন মিসেস আমান, যাতে পিয়ানোর শব্দ খুব বেশি বিরক্ত করতে না পারে।

কাছে গিয়ে দাঁড়াল মুসা।

মুখ তুলে তাকালেন মিসেস আমান। 'কি?'

'মা, একটা ফোন করব। রবিনকে।'

ততক্ষণে ডায়াল করে ফেলেছেন মিসেস আমান। 'হ্যালো।...হ্যাঁ, হ্যাঁ। মিস্টার অ্যালানকে দিন।' ছেলের দিকে তাকালেন, 'পরে। অনেকের সঙ্গে কথা বলতে হবে আমার এখন। পার্টির আগেই শেষ করতে হবে।...কে, মিস্টার অ্যালান?'

কয়েক মিনিট পর মুখ ফিরিয়ে মুসাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বললেন, 'এক সেকেন্ড, মিসেস হ্যারিয়েট।' মাউথপিসে হাত চাপা দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'দাঁড়িয়ে আছিস কেন?'

'মা, রবিনদের বাড়ি থেকে ঘুরে আসি চট করে? আধঘণ্টার বেশি লাগবে না।'

'এখন!' আঁতকে উঠলেন মিসেস আমান, 'না না, এখন কোথাও যাওয়া চলবে না! তোর বাবার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করছি। মনে করিয়ে না দিলে ঠিক দেরি করে আসবে। হয়তো ভুলেই যাবে আসার কথা।...কিশোর, তুমি কিছু মনে কোরো না। আজকের কাজটা আমার উদ্ধার করে দাও, কাল থেকে সারাক্ষণ তোমাদের ছুটি।'

এরপর আর কিছু বলা চলে না। সরে এল দুজনে।

মুখ বাঁকিয়ে বলল মুসা, 'ভয়ঙ্কর জীবন!'

'থাক থাক, বেশি বিরক্তি প্রকাশ কোরো না,' সাবধান করল কিশোর। 'ওরকম মুখ বাঁকাতে থাকলে মুখের রঙ, মাসকারা-টাসকারা সব নষ্ট হয়ে যাবে। লিপস্টিক তো এখনই উঠে গেছে। পার্টির আগে নতুন করে লাগিয়ে

নিতে হবে আন্টির কাছ থেকে ধার করে।'

'আমি লাগাতে পারব না!' ঝাঁজিয়ে উঠল মুসা।

হেসে ফেলল কিশোর, 'ঠিক আছে, আমিই লাগিয়ে দেব।'

*

'বাপরে বাপ, মেয়েমানুষ হওয়ার যে কি যন্ত্রণা!' গজগজ করতে থাকল মুসা। 'এ ঘোড়ার ডিমও মানুষ লাগায়!'

মুসার ঠোঁটে লিপস্টিক লাগিয়ে দিতে দিতে কিশোর বলল, 'আহ্, থামো না। সব নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তো আবার।'

'কার মুখ দেখে যে আজ ঘুম থেকে উঠেছিলাম। নইলে মেয়েমানুষ সাজতে হয়...'

'তুমি চুপ করবে, নাকি! নইলে গেলাম আমি চলে। থাকগে গোয়েন্দাগিরি...'

অবশেষে চুপ করল মুসা। কালো মুখটাকে আরও কালো করে ঘনঘোর অমবস্যার রাত বানিয়ে ফেলল।

হারটা গলায় পরিয়ে পেছনের হুক আটকে দিল কিশোর। এপাশ থেকে, ওপাশ থেকে দেখেটেখে শেষে আয়নার ভেতরে তাকাল। 'দারুণ লাগছে কিন্তু, সত্যি।'

'আরে দূর, রাখো তোমার দারুণ! মা যে বলেছে, ভয়াবহ, আসলে তাই। আমার মধ্যে মেয়েলী কি আছে যে মেয়েমানুষ সাজলে মানাবে?'

'আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, খারাপই লাগছে,' কোনমতেই মুসাকে খুশি করতে না পেরে হাল ছেড়ে দিল কিশোর। 'আমাদের কাজ উদ্ধার হলেই হলো। নাও, চলো।'

*

নিচে নামতেই হলঘরের দরজার কাছে দেখা হয়ে গেল মিস্টার আমানের সঙ্গে। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন তিনি। কিশোরের আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব অনেককেই চেনেন তিনি। কিন্তু এ রকম কোন মহিলাকে কখনও দেখেননি, তা-ও আবার নিগ্রো।

জিজ্ঞেস করলেন, 'কিশোর, ইনি কে?'

'ফারহা আমান,' মুখটাকে স্বাভাবিক রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করছে কিশোর।

'মানে?'

'মানে, আমান। মিস ফারহা আমান। আপনার বোন।'

হাঁ হয়ে গেলেন মিস্টার আমান। নিচের চোয়াল ঝুলে পড়ল। 'আ-আমার বোন...মানে...আমার...'

'বাবা, আস্তে বলো, আমি,' ফিসফিস করে বলল মুসা। 'একটা জরুরী তদন্তের কাজে আমাকে তোমার বোন সাজতে হয়েছে।'

চোয়ালটা আরেকটু ঝোলা সম্ভব হলে সেটুকুও ঝুলে যেত মিস্টার আমানের। দীর্ঘ একটা মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে হেসে ফেললেন। 'বুদ্ধিটা কার?

নিশ্চয় কিশোরের?'

'হ্যাঁ,' ভোঁতা স্বরে বলল কিশোর।

'মনে হচ্ছে রেগে আছিস খুব,' মুসাকে বললেন তিনি। 'রাগছিস কেন, ভালই তো লাগছে দেখতে। মেয়ে হলে সুন্দরীই হতি। তবে খাওয়া কমিয়ে শরীরটা আরেকটু স্লিম করা লাগত⋯অত দামী হার পেলি কোথায়?'

'অনেক কথা। এখন বলতে পারব না। অত দামী নয়, এটা নকল।'

'দেখে কিন্তু একেবারে আসলের মত লাগছে।'

'সেজন্যেই তো এত দাম।'

'কি বলছিস আবোল-তাবোল! একবার বলছিস নকল, আবার বলছিস নকল বলেই এত দাম⋯'

'বললাম তো, সব বলার সময় নেই এখন।'

'হুঁ। তোর মা দেখেছে?'

'দেখেছে।'

'কি বলল?'

'জঘন্য।'

আবার হাসলেন মিস্টার আমান। 'ঠিক বলেনি⋯'

কথা শেষ হলো না। একজন লম্বা সুবেশী লোককে ঢুকতে দেখে তাড়াতাড়ি তাঁকে স্বাগত জানাতে এগিয়ে গেলেন মিস্টার আমান।

পনেরো

পার্টি রুম থেকে বহু মানুষের কণ্ঠ একযোগে এসে যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল দরজার বাইরে। উঁকি দিল দুই গোয়েন্দা। ঘরের অবস্থা আমূল বদলে গেছে আগের বার যা দেখে গিয়েছিল তারচেয়ে। গিজগিজ করছে দামী দামী পোশাক পরা নারী-পুরুষ। সবাই কথা বলছে। একজনের কথা আরেকজনকে শোনানোর চেষ্টা করছে। তাতে কারও কথা কেউ শুনতে পাচ্ছে কিনা সন্দেহ।

'মানুষগুলো না, সব পাগল,' তিক্তকণ্ঠে মুসা বলল। 'বড় বড় বয়স্ক মানুষ, কিন্তু কি কাণ্ড শুরু করেছে। এ সব এদের মানায়?'

'তোমার মেজাজ পুরো খিঁচড়ে আছে আজ। কোন কিছুই সহ্য হচ্ছে না তাই,' কিশোর বলল। 'আমার কাছে তো অত খারাপ লাগছে না।'

এককোণে পিয়ানো বাজাচ্ছে একজন অল্পবয়েসী মহিলা। হই-চইয়ের মাঝে সামান্যই কানে আসে তার বাজনা।

'তো?' হলের দিকে তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞেস করল মুসা, 'চোরা-জুয়েলারটা কই আমাদের?'

'আমি কি করে বলব?' কিশোরও তাকাচ্ছে প্রতিটি মুখের দিকে। 'আমি কি আগে দেখেছি ওকে।'

'আমি ভাবলাম তুমি চিনে ফেলতেও পারো।'
'সেটা আমার ওপর তোমার অতিবিশ্বাস।'
'কি জানি। তাহলে চিনব কি করে?'
'চলো, ওদের মাঝে ঘুরে বেড়াই। হয়তো চিনে ফেলব।'
মুসার ঘুরে বেড়ানো মানে সোজা খাবারের টেবিলগুলোর কাছে চলে আসা, থরে থরে নানা রকম লোভনীয় খাবার সাজানো আছে যেখানে।
কিন্তু যেতে দিল না কিশোর। একজন সুন্দরী মহিলার পাশ দিয়ে যাবার সময় ডাক দিল মহিলা, 'অ্যাই কিশোর, তোমার সঙ্গে মেয়েটি কে?'
'আফ্রিকা থেকে এসেছে। মুসার ফুফু। ছোট ফুফু।'
'ও, তাই তো বলি। চেহারায় মিল কেন? এক্কেবারে মুসার মত। গায়ে-গতরে...মেয়ে না হয়ে ছেলে হলে মুসা বলে চালিয়ে দেয়া যেত।'
হেসে জ্ঞানগর্ভ নৃ-তত্ত্ব ঝাড়ল কিশোর, 'ফুফুর সঙ্গে ভাইপোর চেহারার বরাবরই খুব মিল থাকে। আমার ফুফুর সঙ্গে আমার...'
কিশোরের হাত ধরে টেনে সরিয়ে আনল মুসা। ফুঁসে উঠল। 'চোর-ছ্যাঁচড় নেই এখানে। শুধু শুধু কষ্ট করছি। এখনই ওপরে গিয়ে প্যান্ট-শার্ট পরে আসছি আমি।'
'আরে রাখো রাখো, শান্ত হও। আর একটু ধৈর্য ধরো। কষ্ট তো যা করার করেই ফেলেছ।'
'কিন্তু আমার দিকে তাকিয়ে যে ভাবে হাসাহাসি করে, দেখেছ!'
'হাসুক। আমাদের কাজটা যখন উদ্ধার হয়ে যাবে, আমরা ওদের দিকে তাকিয়ে হাসব।'
ভিড়ের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগল দুজনে। কান পেতে রেখেছে—বিশেষ করে কিশোর, কে কে আলোচনা করে শোনার জন্যে। অচেনা কাউকে দেখলেই তার মুখের দিকে তাকাচ্ছে। ভালমত দেখছে।
'এ ভাবে হবে না। কথা বলতে হবে। এক কাজ করো,' নিচু স্বরে মুসাকে বলল কিশোর, 'লোকের সঙ্গে কথা বলা শুরু করো।'
'কি বলব?'
'যে কোন কথা। আলাপ জমাতে জানো না? পার্টিতে যে কোন বিষয় নিয়ে যার-তার সঙ্গে কথা বলা যায়। আগের পরিচয় থাকা লাগে না। আলাপ করে নিলেই হলো।'
'কিন্তু আমি কি বলব? আমি কি কোন কথা জানি, ব্যায়াম, খেলা আর খাওয়া বাদে?'
'তারমানে তিনটে বড় বড় প্রয়োজনীয় বিষয়ে জ্ঞান আছে তোমার। মানুষের জীবনে এ তিনটে বিষয়ই তো আসল। মাসের পর মাস আলোচনা করে কাটিয়ে দেয়া যায় এ নিয়ে।' লম্বা, ধূসর হয়ে আসা চুল, অভিজাত পোশাক পরা এক ভদ্রলোকের ওপর দৃষ্টি স্থির হলো কিশোরের। দুজন লোকের সঙ্গে কথা বলছে। 'ওই যে, চেনো ওঁকে?'
'মিস্টার আব্রাহাম। জুয়েলার। আব্রাহাম অ্যান্ড গোল্ডমিথের মালিক। রকি

বীচে কে না চেনে।'

'চলো, তাঁকে নেকলেসটা দেখাই। দেখি কৌতূহলী বা আগ্রহী হন কিনা।'

কয়েক পা এগোতেই মাকে চোখে পড়ল মুসার। একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলছেন। ভদ্রলোককে মুসার দিকে স্থির তাকিয়ে থাকতে দেখে তিনিও তাকালেন। স্থির হয়ে গেলেন তিনিও। মুসাকে দেখে নয়, তার গলার হারটা দেখে।

হারটা নিয়ে কোন বেফাঁস প্রশ্ন করে না মুসার ছদ্মবেশ ফাঁসিয়ে দেন মিসেস আমান, এ জন্যে তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল কিশোর। 'আন্টি, ফারহা আন্টিকে নিয়ে একটা বিপদেই আছি আমি। আপনি তো আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে মুক্ত আছেন। উনি এত লাজুক, খালি ঘরে চলে যেতে চাইছেন।'

'আপনার আত্মীয় বুঝি?' মিসেস আমানকে জিজ্ঞেস করলেন পাশে দাঁড়ানো ভদ্রলোক।

'মিস্টার আমানের বোন, ফারহা আমান,' তাড়াতাড়ি পরিচয় করিয়ে দিল কিশোর। মিসেস আমানের স্তম্ভিত মুখ দেখে দ্রুত সরে আসতে যাবে, এই সময় জিজ্ঞেস করলেন ভদ্রলোক, 'নেকলেসটা তো অনেক দামী মনে হচ্ছে?'

ধক করে উঠল কিশোরের বুকের মধ্যে। 'না না, দামী মোটেও না। নকল জিনিস...'

'কোন দোকান থেকে কেনা হয়েছে?'

দোকানের নাম বলতে যাচ্ছিল কিশোর, কিন্তু নিতান্তই অভদ্র ভাবে তাকে সেখান থেকে টেনে সরিয়ে আনল মুসা।

এই প্রথম রেগে গেল কিশোর, 'তোমাকে কাজটা করতে দেয়াটাই বোকামি হয়ে গেছে আমার। তারচেয়ে রবিনকে যদি বলতাম...'

'রাগছ কেন?'

'রাগব না? এত ঘোরাঘুরির পর একজন লোককে যা-ও বা আগ্রহী দেখা গেল, তার কাছ থেকে তথ্য আদায়ের সুযোগ না দিয়েই টেনে নিয়ে এলে আমাকে।'

'তুমি চেনো, উনি কে?'

মুসার কণ্ঠস্বর থমকে দিল কিশোরকে। 'তুমি চেনো?'

মাথা ঝাঁকাল মুসা। 'মিস্টার ডগলাস ব্র্যান। লস অ্যাঞ্জেলেস পুলিশের বড় কর্তা। মা'র বন্ধু।'

'তাই নাকি!' ফাটা বেলুনের মত চুপসে গেল কিশোর।

এতক্ষণে খুশি হলো মুসা। 'অনেক তো ঘোরা হলো। এবার বুফে টেবিলের দিকে নিশ্চয় যাওয়া যায়। আমার পেটের মধ্যে নাড়ীভুঁড়িগুলোও আর নেই, বুঝলে। সব হজম হয়ে গেছে।'

বিনাবাক্যব্যয়ে মুসার সঙ্গে সঙ্গে টেবিলের দিকে এগোল কিশোর।

কাগজের প্লেটে কাঁটাচামচ দিয়ে স্যান্ডউইচ তুলছে মুসা, এই সময় একটা পরিচিত শব্দ কানে আসতে কান খাড়া করে ফেলল কিশোর। ফিসফিস করে

মুসাকে বলল, 'ক্লিওপেট্রার নাম বলতে শুনলাম!'

সতর্ক হয়ে গেল মুসাও। খাবারের দিকে আগ্রহ কমে গেল। ঘুরে তাকাতে লাগল চারপাশে। কে বলেছে, বোঝার চেষ্টা করল।

জুয়েলার মিস্টার আব্রাহামকে দেখল আরেকজন লোকের সঙ্গে কথা বলতে।

ইঙ্গিতে মুসাকে ওদের দিকে সরাসরি তাকাতে নিষেধ করল কিশোর। টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে খাওয়ার ভান করতে লাগল। কান খাড়া।

'জেলে যাবে ও, যে কাণ্ড করেছে!' নিচুস্বরে বলল আব্রাহাম। 'বলে দিলাম, দেখো। মনে রেখো আমার কথা।'

মাথা ঝাঁকাল অন্য লোকটা। 'তারপরেও তো আসল জিনিসটা রাখতে পারল না। মিস্টার আব্রাহাম, এত অল্প চেনা একটা লোকের কথা বিশ্বাস করে কারবার করাই উচিত হয়নি আপনার।'

চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল আব্রাহাম, 'হুঁ, মনে হচ্ছে ভুলই করলাম। কিন্তু জিনিসটা এত দামী, একেবারে রয়্যাল ফ্যামিলির খাঁটি জিনিস, লোভ সামলাতে পারলাম না। আর সে-সুযোগই নিল শয়তানটা।'

মুসার কানে কানে বলল কিশোর, 'কথাবার্তা সন্দেহজনক মনে হচ্ছে। ঘোরো তার দিকে। নেকলেসটা দেখাও।'

খেতে খেতে খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে ঘুরে দাঁড়াল মুসা। আরেকটু হলে গায়ে লেগে যাচ্ছিল মিস্টার আব্রাহামের। 'এক্সকিউজ মি!' বলে সরে গিয়েও দুই কদমের বেশি সরল না।

মুসার গলার দিকে চোখ পড়ল মিস্টার আব্রাহামের।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে কিশোর। কি প্রতিক্রিয়া হয় দেখতে চাইছে।

পলকের জন্যে চোখে আগুন ঝিলিক দিয়ে উঠল বলে মনে হলো জুয়েলারের। নাকি চোখের ভুল?—ভাবল কিশোর।

তাকিয়েই আছে আব্রাহাম।

আস্তে করে মুসাকে টেনে সরিয়ে আনল কিশোর। কয়েক পা এসে চট করে একবার পলকের জন্যে ফিরে তাকিয়েই আবার ঘুরে গেল। তবে এক পলকই যথেষ্ট। যা দেখার দেখে ফেলেছে। আব্রাহাম আর তার সঙ্গী স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মুসার দিকে।

'মনে হয় পেয়ে গেছি আমাদের লোক,' উত্তেজিত স্বরে বলল কিশোর। 'আর থাকার দরকার নেই এখানে। চলো, ওপরে চলো।'

সোজা এসে মুসার শোবার ঘরে ঢুকল দুজনে। দরজা লাগিয়ে দিল কিশোর। প্রায় হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'ওরা কি বলাবলি করছিল বুঝতে পেরেছ? দামী কোন গহনার কথা বলছিল। রয়্যাল ফ্যামিলির।'

'খাইছে! থাইল্যান্ডের রাজ পরিবার!'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'আর খাঁটি যেহেতু বলল, জিনিসটা নকল হতে পারে না!'

থমকে গেল মুসা। 'কি বলতে চাও?'

হাত বাড়াল কিশোর। হাতটা কাঁপছে। 'দেখি, হারটা খুলে দাও!'

মুসারও হাত কাঁপা শুরু হয়ে গেল। খুলে নিয়ে ফেলে দিল কিশোরের বাড়ানো হাতের তালুতে। বৈদ্যুতিক আলোতে ঝিক করে উঠল হীরাগুলো। চুনিগুলো যেন আগুন ছড়াতে লাগল।

'যদি আসল হয়, কি করে প্রমাণ করবে?' কথা বলতে গিয়ে গলা কেঁপে উঠল মুসারও। ভীষণ উত্তেজিত হয়ে পড়েছে দুজনেই।

কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'হীরার প্রধান গুণটা কি, বলো তো? আসল কাঁচের সঙ্গে তফাৎটা কোথায়?'

কিশোরের হাতের নেকলেসটার দিকে তাকিয়ে আছে মুসা। চিন্তা করছে। হঠাৎ বলল, 'হীরা কাঁচ কাটে!'

'কারেক্ট!' মাথা ঝাঁকাল কিশোর। কাটার মত একটা কাঁচের জন্যে চারপাশে তাকাতে লাগল। চোখে পড়ল দেয়ালে ঝোলানো মুসার ঘোড়া কমেটের বাঁধানো ছবিটা। লাফ দিয়ে উঠে গেল হারটা হাতে নিয়ে। দেয়াল থেকে খুলে নিয়ে এল ছবিটা। ফিরে এসে বসল বিছানায়।

তাকিয়ে আছে মুসা।

ছবিটা বিছানার ওপর চিত করে ফেলল কিশোর। নেকলেসের একটা হীরা বেছে নিয়ে একটা চোখা ধার চেপে ধরল ছবিটার কাঁচের ওপর। চাপ রেখে ওপর থেকে নিচের দিকে দিল এক টান।

কিরিচ্ করে মৃদু, মসৃণ একটা শব্দ হলো। পরিষ্কার, সাদা একটা গভীর দাগ পড়ে গেছে কাঁচের ওপর।

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে দাগটার দিকে তাকিয়ে রইল দুজনে।

তারপর বলে উঠল মুসা, 'কিশোর, আমাকে ধরো! আমি বেহুঁশ হয়ে যাচ্ছি!'

ষোলো

'বাপরে বাপ!' মুসা বলল। 'সারাটা বিকেল চার-পাঁচ লাখ টাকার হার গলায় ঝুলিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছি ভাবতেই গায়ের লোম খাড়া হয়ে যাচ্ছে।' কিশোরের দিকে তাকাল সে, 'লস অ্যাঞ্জেলেসের পুলিশ চীফ ডগলাস ব্র্যানকেও দেখিয়ে এসেছি হারটা। কি সাংঘাতিক!'

'হুঁ,' মাথা দোলাল কিশোর।

'হুঁ মানে?'

'হারটা পাওয়ার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছে লোকগুলো এ কারণেই।' লাফ দিয়ে বিছানা থেকে নেমে গিয়ে টেলিফোন তুলে নিল কিশোর।

'কাকে? পুলিশকে?' মুসা বলল, 'পুলিশকে ফোন করার দরকার নেই। ডগলাস ব্র্যান নিচেই আছেন।'

'পুলিশকে করছি না,' কিশোর বলল। 'রবিনকে। ওকে না জানিয়ে হারটা পুলিশের হাতে তুলে দিলে ও খুন করবে আমাদের।'

রিসিভার কানে ঠেকিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল কিশোর। কয়েক সেকেন্ড পরেই মুখটাকে বিকৃত করে বলল, 'এহ্হে, ওদের অ্যানসারিং মেশিন। আন্টি, রবিন, দুজনেই বোধহয় বাইরে।'

'বাইরে? বাইরে কোথায়? রবিন তো বলল, সারাক্ষণ ফোনের কাছে থাকবে, ক্যাসির ফোনের অপেক্ষায়।'

'কিন্তু জবাব তো দিচ্ছে ওদের অ্যানসারিং মেশিনই।'

'কিছু হয়নি তো ওদের? চোরগুলো ফিরে এসে যদি কিছু করে থাকে?'

রবিন আর মিসেস মিলফোর্ডের হাত-পা বাঁধা অসহায় অবস্থার চিত্রটা ফুটে উঠল কিশোরের চোখের সামনে।

মুসা বলল, 'দেরি করা উচিত হবে না। চলো, মিস্টার ব্র্যানকে বলে দিইগে।'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর।

নিচে নামার জন্যে বেরিয়ে সিঁড়ির মাথায় এসেই দাঁড়িয়ে গেল মুসা। কিশোরের হাত ধরে তাকে টেনে থামাল। হাত তুলে দেখাল। সামনের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে মুসার আম্মা কথা বলছেন মিস্টার আব্রাহামের সঙ্গে।

'এত তাড়াতাড়িই যাবেন?' মিসেস আমান বললেন।

'সরি, মিসেস আমান,' আব্রাহাম বলল, 'খুব জরুরী কাজ না হলে যেতাম না। আর থাকতে পারছি না।'

'হঠাৎ করে হলো কি ওর?' ফিসফিস করে বলল মুসা। 'চলে যাবার এই তাড়া কেন? একটু আগেও তো দেখলাম ঢিলেঢালা মেজাজে কথা বলছে। নেকলেসটা চিনে ফেলল নাকি?'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'কোন সন্দেহ নেই তাতে। এসো, জলদি।'

'কোথায়?'

'ও কি করে দেখতে হবে।'

পেছন দিয়ে নামার আরেকটা সিঁড়ি আছে। সেটার দিকে ছুটল দুজনে।

সরু সিঁড়ি বেয়ে লাফাতে লাফাতে নেমে এল ওরা। বেরিয়ে এল সন্ধ্যার শীতল অন্ধকারে।

ঘুরে চলে এল বাড়ির সামনের দিকে। গাড়িতে বোঝাই ড্রাইভওয়ে। দ্রুতপায়ে হেঁটে আসতে দেখল আব্রাহামকে। মুখচোখ থমথমে।

'দেখে না যেন!' চট করে দেয়ালের আড়ালে সরে এল কিশোর।

ওদের কাছ থেকে কয়েক ফুট দূরে একটা গাড়ির কাছে এসে দাঁড়াল আব্রাহাম। দরজা খুলল। সেটা ফাঁক করে রেখেই কার-ফোনের বোতাম টিপল।

রিসিভার কানে ঠেকিয়ে অপেক্ষা করতে করতে অবশেষে বলল, 'আব্রাহাম বলছি।...শোনো, আমি ওটা দেখেছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, এখানে। আরে শোনো না...কি বললে?' কয়েক সেকেন্ড নীরবতা। 'সারা বিকেল আমার সঙ্গে

যোগাযোগের চেষ্টা করেছিলে মানে?...লাইন পাওনি? ও!' আবার নীরবতা। 'ওকেও কিডন্যাপ করেছ! সর্বনাশ! মাথাটাতা ঠিক আছে তো তোমার, জনি!...ওর কাছে তো নেই জিনিসটা, ওকে ধরে নিয়ে গিয়ে করবেটা কি? জিনিসটা এখানে আছে। বোকা মেয়েমানুষটার বাড়িতে...হ্যাঁ হ্যাঁ, মিসেস আমান।...কি করে এখানে এল তা আমি কি করে বলব?'

আবার খানিকক্ষণ চুপ করে ওপাশের কথা শুনে আব্রাহাম বলল, 'দূর, কি যে বলো, আমি পেয়ে গেলে কি আর তোমাকে ফোন করতাম?...চিনব না মানে?...হ্যাঁ, আসলটাই। কোন সন্দেহ নেই আমার। যেটার ছবি দেখিয়েছ। ওটাতে খুঁত না থাকলে আমার দেখায়ও কোন খুঁত নেই।...আমি আসছি। আমি আসার পর যা করার কোরো।...পনেরো মিনিট লাগবে আমার আসতে।...দেখো, জনি, তুমি আমাকে এর মধ্যে ঢুকিয়েছ। এখন কিভাবে উদ্ধার করবে, সেটাও তুমিই জানো। এ থেকে বেরোনোর একটা বুদ্ধি বের করো, সেটা তোমার নিজের জন্যেও ভাল হবে।'

রিসিভারটা আছাড় দিয়ে নামিয়ে রাখল আব্রাহাম। দড়াম করে দরজা বন্ধ করল। গাড়িটা সামনে দিয়ে চলে যাওয়ার সময় অদ্ভুত একটা জিনিস চোখে পড়ল কিশোরের। সাদা কাদায় মাখামাখি হয়ে আছে গাড়িটার মাডগার্ড আর চাকা।

গেট দিয়ে বেরিয়ে গেল গাড়ি।

আড়াল থেকে বেরোল দুই গোয়েন্দা।

'আমার মাকে বোকা মেয়েমানুষ বলেছে ও!' দাঁত কিড়মিড় করল মুসা। 'মা শুনলে...দেখলে তো দাওয়াত করে আনার ফল?'

'জনির সঙ্গে কথা বলেছে ও,' কিশোর বলল। 'জনি বিয়াভা।...কাউকে কিডন্যাপ করেছে জনি। ক্যাসিকে তো আগেই করেছে। রবিনের খোঁজ যেহেতু পাওয়া যাচ্ছে না, আমার বিশ্বাস রবিনের কথাই বলেছে।' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল একবার সে। 'কোথায় ওকে নিয়ে গেছে, তা-ও বুঝতে পারছি।'

'কোথায়?' অবাক হয়ে কিশোরের দিকে তাকিয়ে রইল মুসা। 'কোন জায়গার নাম তো বলেনি।'

'নাম বলার দরকারও ছিল না,' কিশোর বলল। 'কাল তুমি পাহাড়ের দিকে ঘোড়া দৌড়াতে গিয়ে সাদা কাদা লাগিয়ে এসেছিলে জুতোয়, কমেটের খুরে, মনে আছে? রাতে গাড়ির চাকা সাদা লেগেছিল। কেন বলো তো? ওই সাদা কাদা লেগে থাকার কারণে। নইলে টায়ার কখনও ওরকম সাদা হয় না। তুমি বলেছ, কাদাটা লাগিয়েছ একটা বড় বাড়ির ড্রাইভওয়ে থেকে। কল থেকে পানি খেতে ঢুকে।' মুসার দিকে তাকাল সে, 'ওখানকার যে কোন বাড়ির ড্রাইভওয়ে থেকে লাগতে পারে ওই কাদা।'

'উঁহু, নেই,' মাথা নাড়ল মুসা। 'ওই এলাকা আমার মুখস্থ। আর কোন বাড়ির ড্রাইভওয়েতে ওরকম অদ্ভুত কাদা দেখিনি।'

'তাহলে তো আরও ভাল। শিওর হয়ে গেলাম। বেশি খোঁজাখুঁজি করা লাগল না আমাদের,' কিশোর বলল। 'তবে ওখানে যাবার আগে রবিনদের বাড়ি

থেকে হয়ে যেতে হবে। দেখে যাওয়া দরকার, ওকেই কিডন্যাপ করা হলো কিনা–যদিও কোন সন্দেহই নেই আমার। দশ মিনিটের বেশি লাগবে না।'

'পুলিশকে জানাবে না?'

'পরে। আগে আরও-শিওর হয়ে নিই।'

দ্বিধা করতে লাগল মুসা।

'দাঁড়িয়ে রইলে কেন?' তাগাদা দিল কিশোর। 'এসো।'

নিজের পোশাক দেখাল মুসা, 'এগুলো পরেই যাব?'

এতক্ষণে যেন লক্ষ করল কিশোর, মেয়েমানুষের পোশাক পরে আছে এখনও মুসা। বলল, 'না, বদলে এসো। আধ মিনিটের মধ্যে। কুইক! চলো, আমিও যাচ্ছি। তুমি কাপড় বদলাতে বদলাতে দেখি আরেকবার চেষ্টা করে, রবিনদের বাড়িতে ফোন করে।'

ঘরে এসে মুসা গেল ওয়ারড্রোবের দিকে। কিশোর তুলে নিল মুসার এক্সটারনাল টেলিফোনটা। ডায়াল করল রবিনদের নম্বরে। সেই একই অবস্থা। জবাব দিল অ্যানসারিং মেশিন।

একটা মেসেজ রেখে দেয়ার কথা ভাবল কিশোর। মুসার দিকে তাকাল, 'সাদা কাদাওয়ালা বাড়িটার কি কোন নাম আছে? মনে করতে পারবে?'

'স্টোনশেক ভিলা।'

সতেরো

অন্ধকারে ঢেকে আছে রবিনদের বাড়িটা।

রবিনের আম্মা যে গাড়িটা ব্যবহার করেন, সেটা দাঁড় করানো গ্যারেজের বাইরে। জানালাগুলো অন্ধকার।

সাইকেল নিয়ে এসেছে মুসা আর কিশোর। ব্রেক কষে দাঁড় করাল। স্ট্যান্ডে তোলার সময় নেই। কাত করে মাটিতে ফেলে দিয়ে দৌড়ে এসে বেল টিপল কিশোর।

অন্ধকার নীরবতার মাঝে বাড়ির ভেতর থেকে ঘণ্টার জোরাল শব্দ কানে এল ওদের।

কেউ সাড়া দিল না। কেউ বেরোল না। আলো জ্বলল না।

দরজা ঠেলে দেখল। নবে মোচড় দিয়ে দেখল। তালা লাগানো।

'কোন সন্দেহ নেই আর,' কিশোর বলল। 'আগেও ছিল না। তবু শিওর হয়ে নিলাম। রবিনকেই ধরে নিয়ে গেছে ওরা।'

'কিন্তু আন্টি কোথায়? তাঁকেও কি ধরে নিয়ে গেছে?'

'মনে হয় না। দরজায়ও তো তালা। হয়তো কোথাও বেরিয়েছেন। রবিনকে যদি ধরেই নিয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে আন্টিকে ঘরের মধ্যে হাত-পা বেঁধে ফেলে যাবে না। যাওয়ার কোন দরকার নেই।'

'যদি ঘর থেকে রবিনকে নিয়ে গিয়ে থাকে?' মুসার প্রশ্ন।

'না, নেয়নি। দুপুর থেকেই ওর দেখা পাচ্ছি না আমরা। থানায় যাওয়ার পথেই তাকে কিডন্যাপ করা হয়েছে। সেজন্যেই ডুগানের কফি শপে আসেনি সে। চলো, দেরি করে লাভ নেই।'

দৌড়ে এসে কাত হয়ে পড়ে থাকা সাইকেলটা তুলে নিল কিশোর। লাফ দিয়ে চেপে বসল।

মুসাও চেপে বসেছে তার সাইকেলে।

*

তারাখচিত আকাশে ঝুলে আছে যেন দুধ-সাদা চাঁদটা। অন্য সময় হলে এই অপূর্ব জ্যোৎস্না প্রাণভরে উপভোগ করত কিশোর। কিন্তু এখন দেখারও সময় নেই।

পাহাড়ী, উঁচুনিচু খোয়া বিছানো পথে প্রাণপণে সাইকেল চালিয়ে চলেছে দুজনে। দুই ধারে কোথাও চষা খেত, কোথাও ঘাসে ঢাকা পতিত জমি। আগে আগে চলেছে মুসা। মাঝে মাঝে থেমে অপেক্ষা করছে কিশোরের। পেছনে ফিরে হাঁক দিচ্ছে, 'এসো!'

মুসার সঙ্গে সাইকেল চালিয়ে কখনোই পারে না কিশোর। হাঁপ ধরে গেছে তার। জোরে জোরে নিঃশ্বাস পড়ছে। কিন্তু থামছে না।

কিছুদূর এগোনোর পর খোয়া শেষ হয়ে গেল। এরপর কাঁচা রাস্তা। বৃষ্টি হয়েছিল, কাদা হয়ে আছে। তার ওপর খাড়া পথ। মাঝে মাঝেই চাকা পিছলে যেতে চায়। পিছলে গিয়ে পাশের খাদে পড়লে একটা হাড়ও আর আস্ত থাকবে না। হ্যান্ডেল চেপে ধরে রাখতে রাখতে হাত ব্যথা হয়ে গেল। কিন্তু হাল ছাড়ল না ওরা।

অবশেষে শেষ হলো বিভীষিকার পথ। পাহাড়ের ওপরে উঠে এল ওরা। নিচে চাঁদের আলোয় দেখা গেল ছড়ানো ঘাসে ঢাকা জমি। হ্যান্ডেলে ভর দিয়ে জোরে জোরে দম নিতে লাগল দুজনে। টেনে নিল পাহাড়ী রাতের তাজা, ঠাণ্ডা বাতাস।

'ওই যে বাড়িটা...' হাত তুলে দেখাল মুসা।

অনেক নিচে ছায়াঘেরা উপত্যকার কোল ঘেঁষে পাহাড়ের ঢালে দাঁড়িয়ে আছে একটা বড় বাড়ি। দূর থেকেও দেখা যাচ্ছে ড্রাইভওয়েটা, চাঁদের আলোয় সাদা। মনে হচ্ছে সাদা কাগজ বিছিয়ে রাখা হয়েছে। এ রকম অদ্ভুত কাদা আর দেখেনি কিশোর। মাটিতে কোন ধরনের ধাতুর আধিক্যের কারণে ঘটেছে এটা, অনুমান করল সে, কি ধাতু বুঝতে পারল না। সেটা নিয়ে মাথাও ঘামাল না। ভৌগোলিক রহস্যের অনুসন্ধানে আসেনি ওরা। এসেছে মানুষ খুঁজতে। সেটাই করা দরকার।

ড্রাইভওয়ের শেষ মাথায় দুটো গাড়ি চোখে পড়ছে।

মুসার দিকে তাকাল কিশোর। বড় করে দম নিয়ে বলল, 'চলো, নামি।'

খাড়াই বেয়ে উঠেছিল, অন্যপাশে নামতে হবে ঢাল বেয়ে। প্যাডেলে গায়ের জোর দিতে হবে না সত্যি, কিন্তু পাথরে ভরা, কাদা হয়ে থাকা ঢালু পথে

পুরোপুরি সাইকেল ছেড়ে দিতে ভরসা পেল না ওরা। ব্রেক চেপে ধরে নামতে শুরু করল। গতি কিছুটা কমল তাতে। কিন্তু ঝাঁকুনি এড়াতে পারল না। ঝাঁকির চোটে মনে হলো, হাড়গুলো সব ঝরঝরে হয়ে যাবে, খুলে আসবে জোড়া থেকে।

কোন প্রতিকূলতাই ঠেকাতে পারল না ওদের। এগিয়ে চলল বাড়িটা লক্ষ্য করে।

আঠারো

থানায় যাওয়ার জন্যে বাসে চেপেছিল রবিন। বাস থেকে নেমে হেঁটে যাওয়া লাগে খানিকটা। নির্জন ওই রাস্তাটা পেরোচ্ছিল সে, এই সময় পাশে এসে থামল একটা গাড়ি। ঝটকা দিয়ে খুলে গেল একপাশের দরজা। পেছনের সীট থেকে লাফিয়ে নেমে এল একটা লোক। পিস্তল চেপে ধরল রবিনের পেটের একপাশে। কঠিন, শীতল কণ্ঠে হুকুম দিল, 'একদম চুপ! চেঁচালে পেট ফুটো করে দেব! যাও, গাড়িতে ওঠো!'

আর কোন উপায় না দেখে নির্বিবাদে গাড়িতে উঠে বসল রবিন। লোকটা একহাতে তার গায়ে পিস্তলের নল চেপে ধরে রেখে আরেক হাতে দরজা বন্ধ করল। ততক্ষণে চলতে শুরু করেছে গাড়ি।

লোকটাকে ভালমত দেখার সুযোগ পেল রবিন। লম্বা ছিপছিপে শরীর, ইঁদুরমুখো, মাথায় কোঁকড়া সোনালি চুল।

'কে আপনি? কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন আমাকে?'

হাসল লোকটা। মুখটা লম্বাটে হওয়ায় বিশ্রী লাগল হাসিটা। 'আমার নাম জনি বিয়ান্ডা। কোথায় নিয়ে যাচ্ছি, গেলেই দেখতে পাবে।'

জনি! জনি বিয়ান্ডা! তারমানে তার সন্দেহই ঠিক, হারলো আঙ্কেল ভুল লোককে বিশ্বাস করেছেন।

'ক্যাসি কোথায়?' জানতে চাইল রবিন।

'সেটাও দেখতে পাবে।'

'লস অ্যাঞ্জেলেসে যাচ্ছেন?'

'বড় বেশি কথা বলো তুমি!' হাসিটা মিলিয়ে গেল জনির। 'চুপ করে বসে থাকো।...আর হ্যাঁ, আমি যা জিজ্ঞেস করব, ঠিক ঠিক জবাব দেবে।'

সামনের দিকে লম্বা মুখটা বাড়িয়ে দিল সে। রবিনের প্রায় মুখের কাছে মুখ এনে ভুরু নাচাল। 'কোথায় ওটা?' জানার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছে। তর সইছে না।

প্রথমে বুঝতে পারল না রবিন। 'কিসের কথা জিজ্ঞেস করছেন?'

পেটের ওপর নলের চাপ বাড়ল। 'কোথায়?'

'সত্যি বলছি, আপনি কিসের কথা জিজ্ঞেস করছেন আমি বুঝতে পারছি

না। আপনার কোন জিনিস আমি নিয়েছি বলে তো মনে পড়ে না।'

'নিয়েছ। ক্যাসির কাছ থেকে পাওয়া একটা ছোট্ট উপহার।'

'চকলেটের বাক্সটার কথা বলছেন?'

'হ্যাঁ।'

বোকা সেজে থাকো, রবিন—নিজেকে বোঝাল সে, না জানার ভান করো। ওকে বোঝাও, সত্যি তুমি জানো না কিছু।

'বাক্সটা কোথায় বলো, তোমাকে এখানেই নামিয়ে দেব আমি।'

'বাক্সটা এখন কোথায় আমি বলতে পারব না। ফেলে দিয়েছি। ডার্ক চকলেট একটুও পছন্দ না আমার।'

'তুমি বোকা না দুঃসাহসী বুঝতে পারছি না।'

'সাহস আমার মোটেও নেই।'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত স্থির দৃষ্টিতে রবিনের দিকে তাকিয়ে রইল জনি। বোঝার চেষ্টা করল রবিন সত্যি বলছে না মিথ্যে। বুঝতে না পেরেই বোধহয় রেগে গেল। খসখসে গলায় ধমকে উঠল, 'পেছন ফেরো!'

'কি করব?'

'কথা বুঝতে পারো না? পেছন ফেরো। হাত আনো পেছনে। দুই হাত।'

জনির হাতে পিস্তল আছে। তা ছাড়া ক্যাসি কোথায় আছে, দেখার এই সুযোগ হাত ছাড়া করল না রবিন। জনি যা যা করতে বলল, করল সে।

রবিনের হাত পিছমোড়া করে বাঁধল জনি। তারপর একটা কাপড় দিয়ে তার চোখও বেঁধে দিল, যাতে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে দেখতে না পারে রবিন।

একসময় শেষ হয়ে গেল মসৃণ রাস্তা। শুরু হলো ঝাঁকুনি। অনুমানে বুঝল রবিন, পাহাড়ী রাস্তা ধরে চলেছে গাড়ি। ওপরে ওঠা টের পেল। নিচে নামাও বুঝতে পারল। গতি কমিয়ে মোড় নিল। কাদার শব্দ শোনা গেল। বুঝল সে, কাদায় ভরা কোন ড্রাইভওয়েতে গাড়ি ঢুকেছে।

আরও কয়েক গজ এগিয়ে থেমে গেল গাড়ি। দরজা খোলার শব্দ হলো।

রবিনের চোখের বাঁধন খুলে দিল জনি। আদেশ দিল, 'বেরোও!'

'উঁ!' অনেকক্ষণ বাঁধা থাকায় প্রথমে কোন কিছু স্পষ্ট দেখতে পেল না রবিন। হাত বাঁধা থাকায় চোখও ডলতে পারছে না।

'নামো! বার বার এক কথা বলা লাগে কেন! কথা বোঝো না নাকি?'

নামল রবিন। নরম মাটিতে পা পড়ল। কাদা হয়েছিল, মাটি আর খোয়া ফেলে ঢেকে দেয়া হয়েছে।

বাড়িটার দিকে তাকাল সে। বাংলো টাইপের একটা বড় বাড়ি।

পা বাড়াল। মাটি আর খোয়াও তলার কাদা ঢাকতে পারেনি। পায়ের চাপে ফচ করে উঠে এল তরল কাদা। জুতোয় লেগে গেল।

পেছন থেকে ধাক্কা দিয়ে তাকে তাড়াতাড়ি এগোতে বলা হলো।

বড়, উঁচু ছাতওয়ালা একটা ঘরে নিয়ে আসা হলো তাকে। বসতে বলা হলো। জনি বসল একটা ডেস্কের সামনে। তাতে টেলিফোন আছে। স্পীকার-ফোন।

রিসিভারটা তুলে নিয়ে কানে ঠেকিয়ে নম্বর টেপার আগে রবিনকে বলল জনি, 'যা যা বলতে বলব, ঠিক তাই বলবে। নইলে দুঃখ আছে কপালে। তোমাদের বাড়িতে করছি। তোমার মাকে বলবে, বন্ধুদের সঙ্গে যাচ্ছ তুমি। বেড়াতে। ফিরতে দেরি হবে।'

'কিন্তু...'

'কোন কথা নয়!' টেবিলে রাখা পিস্তলটা রবিনের দিকে তুলে নল নাচাল সে। নীল চোখে সাপের দৃষ্টি।

চুপ হয়ে গেল রবিন।

নম্বর টিপল জনি। তিন-চার সেকেন্ড পর মাউথপীসটা হাত দিয়ে চেপে ধরে চোখের ইশারায় কাছে আসতে বলল রবিনকে। রবিনের হাত বাঁধা থাকায় নিজেই রিসিভারটা ধরল তার মুখের কাছে। আরেকবার হুঁশিয়ার করল, 'সাবধান, একটাও বেফাঁস কথা নয়!' মাউথপীসের ওপর থেকে হাত সরাল সে।

'হ্যালো!' রবিন বলল। 'মা? আমি!'

'রবিন, কোথায় তুই?' শোনা গেল মায়ের উৎকণ্ঠিত গলা। স্পীকার অন করা থাকায় জনিও শুনতে পাচ্ছে।

'আমি ভালই আছি, মা। একটা ফোন বুদ থেকে করছি,' জনির ওপর স্থির হয়ে আছে তার দৃষ্টি। 'কিশোরদের সঙ্গে এক জায়গায় যেতে হবে, তাই করলাম। অনেক দূর। ফিরতে দেরি হবে। তুমি কোন চিন্তা কোরো না।'

'তুই এখন কোথায়?'

'বললাম তো, চিন্তা কোরো না...'

কানের কাছে ফিসফিস করে বলল জনি, 'হয়েছে। গুড-বাই বলে দাও।'

জনির কথা পালন করল রবিন। মাকে 'গুড-বাই' জানানোর সঙ্গে সঙ্গে লাইন কেটে দিল জনি।

'হয়েছে,' মাথা ঝাঁকাল জনি। 'এবার এসো আমার সঙ্গে।'

অনেক গলি-ঘুপচি-ঘর-করিডর-সিঁড়ি পার করিয়ে রবিনকে নিয়ে আসা হলো একটা পুরানো দরজার সামনে। চাবি দিয়ে দরজার কড়ায় লাগানো তালা খুলল জনি। পাল্লা খুলল। তারপর ধাক্কা দিয়ে তাকে ঠেলে দিল ঘরের ভেতরে। লাগিয়ে দিল আবার দরজাটা।

অন্ধকার ঘর। কিছুই চোখে পড়ল না প্রথমে। চোখের পাতা তুলে, চোখ টান টান করে দেখার চেষ্টা করল রবিন। ধীরে ধীরে চোখে সয়ে এল ঘরের আবছা আলো। নিচু একটা জানালা দিয়ে আসছে অস্পষ্ট ধূসর আলো। চট বা ওই জাতীয় মোটা কোন কাপড় দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়েছে জানালাটা।

আসবাবপত্র বলতে এককোণে একটা অনেক পুরানো খাট। তাতে নোংরা ম্যাট্রেস পাতা। খাটের মাথার কাছে দেয়াল ঘেঁষে একটা নড়বড়ে টেবিল আর একটা চেয়ার।

বাঁ দিকে একটা দরজা। আধখোলা।

দরজার দিকে এগোল সে। পায়ের চাপে ক্যাচম্যাচ করে প্রতিবাদ

জানাতে লাগল মেঝের তক্তা।

এখানে যদি আটকেই থাকতে হয়, জায়গাটা ভালমত দেখে নেয়া দরকার–ভাবল সে। অন্তত হাতের বাঁধন কাটার তো একটা ব্যবস্থা করতে হয়।

আধখোলা দরজাটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। কাঁধ দিয়ে ধাক্কা মেরে পুরো খুলে ফেলল পাল্লাটা।

সঙ্গে সঙ্গে একটা অদ্ভুত শব্দ ভেসে এল দরজার ওপাশ থেকে। বিশাল বাদুড়ের মত কালো কি একটা যেন হুশ্‌শ্‌ করে ছুটে এল তীব্র গতিতে। ঝট করে মাথা নিচু করে ফেলল সে। ওর চুল ছুঁয়ে চলে গেল জিনিসটা।

'শয়তান! জানোয়ার!' অন্ধকারের ভেতর থেকে চিৎকার করে উঠল একটা মেয়ে। 'মর্‌ এখন!'

'ক্যাসি নাকি!' রবিনও চিৎকার করে উঠল।

'কে?'

'ক্যাসি, আমি। রবিন।'

'রবিন!' ফ্যাকাসে হয়ে যাওয়া একটা মুখ উঁকি দিল দরজায়। ওর দিকে তাকিয়ে রইল। 'সত্যি তুমি, রবিন? আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। আমি ভেবেছি ওই শয়তান জনিটা।' ওপর দিকে দেখাল সে। দড়িতে বাঁধা একটা তক্তা ঝুলছে। ওদের মাথার কয়েক ইঞ্চি ওপরে। 'ওর মত লম্বা না বলে বেঁচে গেছ তুমি। বুবি ট্র্যাপ। এমন করে বানিয়েছিলাম, যাতে সোজা গিয়ে দাঁতে বাড়ি খায়।'

'পেলে কোথায় দড়ি আর তক্তা?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'এ ঘরে,' যে ঘরটা থেকে বেরিয়ে এসেছে ক্যাসি, সেটা দেখাল। 'স্টোর রুম ছিল বোধহয়।' রবিনের হাত চেপে ধরল সে। 'তুমি আমাকে বের করে নিয়ে যেতে এসেছ, তাই না?' বলার পর রবিনের হাতের বাঁধনটা চোখে পড়ল ওর।

'না, নিতে আসিনি,' ক্যাসির দিকে তাকাতে পারছে না রবিন।

'কি?' আনন্দ খসে পড়ল ক্যাসির মুখ থেকে। 'তারমানে...? দারুণ! চমৎকার! তুমিও আমার মত বন্দী!' রবিনের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল সে। 'আচ্ছা, একটা কথা বলো। নেকলেসটা পেয়েছ?'

'পেয়েছি।'

'পুলিশকে দিয়েছ?'

ঠোঁট কামড়ে ধরল রবিন। 'না, ক্যাসি...মানে...'

'রবিন!'

'বাক্সে হারটা যে আছে, এটা বুঝতেই অনেক সময় লেগে গেছে আমাদের। সঙ্গে একটা নোট দিলে পারতে।'

'দিয়েছি,' চিৎকার করে উঠল ক্যাসি। 'নোটে লিখে দিয়েছি জিনিসটা তোমার কাছে রাখার জন্যে। বড় হয়ে তুমি যে এতটা হাঁদা হয়ে গেছ, রবিন, জানতাম না। ফোনে গর্ডনের কথা বলেও ইঙ্গিত দিয়েছি, বোঝাতে চেয়েছি

গণ্ডগোল হয়েছে। তা-ও তুমি বুঝলে না?'

'বুঝেছি,' রবিনও আর রাগ চাপা দিতে পারছে না। 'কিন্তু সবাই মিলে এমন কাণ্ড শুরু করে দিল—ক্যাসি ঠিক আছে কিনা ঠিক আছে বলে, মাথাটাই খারাপ করে দিচ্ছিল আমার। তা ছাড়া কি করে জানব তোমার কি হয়েছে?'

'তোমাকে খবর না দিয়ে টম অ্যান্ড জেরীকে খবর পাঠানো উচিত ছিল আমার!' ক্যাসিরও রাগ যাচ্ছে না। 'নিজেরাও ধরা পড়ত না, আমাকেও উদ্ধার করে নিয়ে যেতে পারত এখান থেকে।'

'দেখো, ক্যাসি,' নিজেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করল রবিন, 'না জেনে চেঁচামেচি কোরো না। আমাকে জোর করে ধরে আনা হয়েছে এখানে, পিস্তলের মুখে। হয়তো ছাড়া পাওয়ার চেষ্টা করতে পারতাম। তাতে বরং খারাপ হত। তা ছাড়া আমি বুঝতে পারছিলাম ওরা আমাকে তোমার কাছে নিয়ে আসবে। সেজন্যেই চুপ করে ছিলাম, বাধা দিইনি। এখন পৌঁছে গেছি, পালানোর চেষ্টা করব। কোন না কোন উপায় বেরিয়ে যাবেই।...নাও, এখন আগে আমার বাঁধনটা খোলো তো দেখি।'

আর চিৎকার করল না ক্যাসি। 'সরি, রবিন,' শান্ত হয়ে এল ওর কণ্ঠস্বর। 'আসলেই বোকার মত তোমার সঙ্গে চিৎকার-চেঁচামেচি করেছি। জনি বিয়াড্ডা কি শয়তানি করছে সেটা তোমার জানার কথা নয়।'

কয়েক সেকেন্ডেই রবিনের বাঁধন খুলে দিল ক্যাসি।

রক্ত চলাচল স্বাভাবিক করার জন্যে হাত ডলতে লাগল রবিন। মলিন হাসি হাসল। 'তবে এখন আমি জানি সব। তোমার বাবার ডিজাইন চুরি করার মতলব এঁটেছে, তাই না? প্রতিদ্বন্দ্বী কোম্পানিগুলোর কাছে বেচে দিতে চায়।'

হাঁ করে রবিনের দিকে তাকিয়ে রইল ক্যাসি, 'ও, তারমানে তুমি এখনও জানো না!'

রবিন অবাক। 'কি জানি না?'

'নেকলেস, রবিন। ওটা নকল নয়। ওটা আমার বাবার কপি করা ডিজাইন নয়। ওটা আসল।'

শরীরটাকে ছেড়ে দিল রবিন। দরজার গায়ে হেলান না দিয়ে যেন আর দাঁড়াতে পারছে না। মাথার মধ্যে চক্কর মারছে। 'ক্যাসি, পুরো ব্যাপারটা আমাকে খুলে বলো তো! এ ভাবে অন্ধকারের মধ্যে থাকতে আর ভাল লাগছে না। ঘটনাটা কি ঘটছে এখানে আসলে?'

উনিশ

খাটের ওপর পাশাপাশি বসল দুজনে। জানালা থেকে চটটা খুলে ফেলেছে ক্যাসি। আকাশ চোখে পড়ছে এখন।

'কয়েক মাস আগে থেকেই আব্বা সন্দেহ করছে, কোম্পানিটার বারোটা

বাজাতে চাইছে কেউ,' ক্যাসি বলল। 'কিন্তু কাজটা যে কার ধরতে পারছিল না। ভেতরে ভেতরে তদন্তও চালানো হয়ে গেছে। আব্বা মনে করেছে কোন একজন ডিজাইনারের কাজ। কেউ একজন লোভী হয়ে উঠে গোপনে গোপনে প্রতিদ্বন্দ্বী কোম্পানিগুলোর কাছে ডিজাইনের নকল বিক্রি করে দিচ্ছে। সারা কোম্পানিতে একমাত্র জনি বিয়াভাকে বিশ্বাস করত। তদন্তের ভারও জনির ওপরই দিয়েছিল। এতটাই বিশ্বাস করত ওকে আব্বা। থাইল্যান্ডের রাজপরিবার থেকে অলঙ্কার ধার এনে ডিজাইন নকল করার বুদ্ধিটাও জনির মাথা থেকেই বেরিয়েছে। আব্বার কাছে এটা সাংঘাতিক আইডিয়া মনে হয়েছিল। সব ব্যবস্থা জনিই করেছে। কোম্পানিতে জিনিসগুলো আনা, ওগুলো পাহারা দেয়া–সব কিছু। সে-কারণেই শয়তানিটা করার সুযোগ পেয়েছে এত সহজে।'

'কিন্তু তুমি বুঝলে কি করে?' জানতে চাইল রবিন।

'প্লেনের মধ্যে, লস অ্যাঞ্জেলেসে আসার সময়,' ক্যাসি বলল। 'আমাকে জানানো হয়েছিল, ওর ব্রীফকেসের মধ্যে অনেকগুলো গহনার কপি আছে। লস অ্যাঞ্জেলেসের বাজারে ওগুলোর চাহিদা যাচাইয়ের জন্যে আসছিল জনি। কপিগুলো তখনও আব্বা, জনি আর যে ডিজাইনার বানিয়েছে, সে ছাড়া আর কেউ দেখেনি। এমনকি আমিও না।'

'তোমাকেও দেখাননি তোমার আব্বা!'

শুকনো হাসি হাসল ক্যাসি। 'আমার সঙ্গে আব্বার সম্পর্ক ভাল যাচ্ছে না কদিন থেকে।'

'ভাল যাচ্ছে না মানে?'

'ঝগড়া করেছিলাম। যে কারণে ওদের সঙ্গে ক্যাম্পিঙেই যাইনি আমি। যে কারণে তোমাদের এখানে বেড়াতে চলে এসেছি। দুই হপ্তা আগে আব্বার সঙ্গে প্রচণ্ড ঝগড়া হয়েছে আমার। তারপর থেকে কেউ কারও সঙ্গে কথা বলি না। মানসিক শাস্তি দেয়ার জন্যেই বোধহয় ডিজাইনগুলো আমাকে দেখতে দেয়নি আব্বা।' বিষণ্ণ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল ক্যাসি। 'অবাক লেগেছে আমার। আব্বার স্বভাব নয় এটা।'

'তারপর?'

'আমি মনে করেছিলাম কপিগুলোই আছে জনির ব্রীফকেসে। কার্গো হোল্ডে অন্যান্য জিনিসপত্রের সঙ্গে ব্রীফকেসটা রাখার ঝুঁকি নেবে না সে, আমি জানতাম। সুতরাং অপেক্ষা করতে লাগলাম কখন সে রেস্টরুমে যায় সিগারেট খেতে, ব্রীফকেসটা খুলে আমি দেখতে পারব জিনিসগুলো।'

'হুঁ,' মাথা দোলাল রবিন।

'চুরি করে অন্যের ব্রীফকেস খুলে দেখার ব্যাপারটাকে তুমি আবার অন্য কিছু মনে করে বোসো না,' ক্যাসি বলল। 'গহনার প্রতি মেয়েমানুষের স্বাভাবিক কৌতূহল, বুঝতেই পারছ। আব্বা যদি প্রথমেই আমাকে দেখিয়ে দিত, তাহলে আর এ রকম করার প্রয়োজন পড়ত না। আমি যে দেখতে না পেয়ে অস্থির হয়ে যাব, আব্বা নিশ্চয় বুঝতে পেরেছিল, আর এই শাস্তিটাই

'দিতে চেয়েছিল আমাকে।'

'ক্যাসি, কোনভাবে কি তোমার সন্দেহ হয়েছিল, ব্রীফকেসে আসল গহনা রয়েছে?'

হাসল ক্যাসি। 'না। সন্দেহ করার কোন কারণ ছিল না। আসল গহনা কেন ব্রীফকেসে নিয়ে ঘুরে বেড়াবে জনি...'

'মাঝখানে একটা কথা জিজ্ঞেস করি। আসল আর নকল চেনার কি কোন উপায় আছে?'

'আছে। গহনার কোথাও না কোথাও ক্লিওপেট্রার প্রথম অক্ষর 'সি' ছোট্ট করে খোদাই করা থাকে। এটা অনেকটা ট্রেড মার্কের মত। ব্রীফকেসে যতগুলো গহনা ছিল, তারমধ্যে একমাত্র নেকলেসটারই কোথাও অক্ষরটা দেখতে পাইনি। অদ্ভুত লেগেছিল আমার। শিওর হওয়ার জন্যে হাতের ঘড়ির কাঁচে দিলাম পোঁচ,' দম নেয়ার জন্যে থামল ক্যাসি। 'কেটে গেল। এই সময় জনিকে ফিরে আসতে দেখতে পেলাম। তাড়াতাড়ি নেকলেসটা বাদে বাকি গহনাগুলো ভরে রাখলাম ব্রীফকেসে। নেকলেসটা রেখে দিলাম নিজের পকেটে। নকলের মাঝে আসল নেকলেস দেখেই বুঝে গিয়েছিলাম কি ঘটেছে। মনে মনে ঠিক করেছিলাম, নেকলেসটা যে খোয়া গেছে, প্লেনেই যদি দেখে না ফেলে জনি, তাহলে প্লেন থেকে নেমে পুলিশের কাছে যাব।'

'সবগুলোই চুরি করল না কেন জনি? শুধু নেকলেসটা কেন?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'আমার মনে হয় এতটা সাহস করতে পারেনি। কিংবা চুরিটা যে হয়েছে, সেটা সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে দিতে চায়নি। চুরি করে ধরা পড়ে গেলে কোন লাভ নেই। পালানোর সুযোগ করে রাখা দরকার। ভেবেছিল, ফেরত পাঠানোর পর এত গহনার মাঝে একটামাত্র জিনিস চুরি গেলে সহজে কারও চোখে পড়বে না। তা ছাড়া একটা হারই বা কম কি তার জন্যে, চার-পাঁচ লক্ষ ডলার দাম। ওর মত মানুষের জীবন কাটিয়ে দেয়ার জন্যে যথেষ্ট।'

মাথা দোলাল রবিন। 'তোমাকে নেকলেসটা সরাতে দেখেছিল নাকি জনি?'

'কিছু বলেনি তখন। তবে আমাকে সন্দেহ করেছিল বুঝতে পেরেছিলাম। ব্রীফকেসটা সরানো দেখেছিল। প্লেনের ডিউটি ফ্রি কার্ট থেকে একবাক্স চকলেট কিনলাম। নিয়ে চলে গেলাম রেস্ট রুমে। ওখানেই বাক্সের মধ্যে নেকলেসটা ভরলাম। এ চালাকি করেছিলাম, প্লেনের মধ্যে সন্দেহ করে যদি আমার পকেট-টকেট খোঁজে, তাহলে যাতে নেকলেসটা না পায় সে। এয়ারপোর্টে নামার পর পরই হঠাৎ করে ভাবভঙ্গি বদলে গেল ওর। মিষ্টি ভাষা, নরম আচরণ শেষ। পোস্ট অফিসে গিয়ে আমাকে বাক্সটা তোমার কাছে পাঠাতে দিল বটে, কিন্তু সর্বক্ষণ ছায়ার মত লেগে রইল আমার পেছনে। ওর কাছ থেকে সরতে পারলাম না, পুলিশকে জানাতে পারলাম না, কিছুই করতে পারলাম না। ওর ব্যবহার ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল যখন দেখল আমার সঙ্গে নেকলেসটা নেই। আমাকে একটা হোটেলে নিয়ে গেল। শাসিয়ে বলল,

যতক্ষণ নেকলেসটা কোথায় আছে না বলব, আমাকে ছাড়বে না সে। তারপরেও যখন বললাম না, পিস্তল দেখিয়ে হুমকি দিল, গুলি করবে।'

থামল ক্যাসি। রবিনের দিকে তাকাল। 'এরপর আর না বলে পারলাম না। জনির ভাবভঙ্গিতে বুঝতে পারছিলাম, ওর পক্ষে সব সম্ভব। অত টাকার জন্যে খুন করতে দ্বিধা করবে না।'

'তুমি বলে দেয়ার পর কি করল সে?'

'গোটা দুই ফোন করল। একটা নিউ ইয়র্কে, তার কোন এক সহকারীর কাছে; যাতে আমার ব্যাপারে কারও কাছ থেকে ফোন পেলে, আমি কেমন আছি জিজ্ঞেস করলে বলে দেয় আমি ভাল আছি।'

'জরুরী টেলিফোন নম্বর,' আনমনে বিড়বিড় করল রবিন। ক্যাসিকে বলল, 'নিউ ইয়র্কে ফোন করেছিলাম আমি, আর আমাকে ঠিক এ কথাটাই বলেছে যে লোকটা ফোন ধরেছিল। দ্বিতীয় ফোনটা কাকে করেছিল?'

'সম্ভবত রকি বীচের কাউকে। আমাকে বাথরুমে আটকে রেখেছিল। কাকে কি বলল, ভালমত শুনতে পাইনি। মনে হয় সব কিছু আগে থেকেই প্ল্যান করে রাখা ছিল। সে-ভাবেই চলছিল সে। তারপর আমাকে দিয়ে ফোন করাল তোমাদের বাড়িতে। আমার ঘাড়ের কাছে পিস্তল ধরে রেখেছিল। কি কি বলতে হবে শিখিয়ে দিচ্ছিল। তারপর হোটেল থেকে বের করে গাড়িতে করে নিয়ে এল আমাকে এখানে।' তিক্ত হাসি হাসল ক্যাসি। 'আমার শেষ ভরসা ছিলে তুমি। আশা করেছিলাম, তুমি সন্দেহ করবে, নেকলেসটা বের করে পুলিশের কাছে নিয়ে যাবে।'

'অত হতাশ হয়ো না,' রবিন বলল। 'আমি ধরা পড়লেও আমার বন্ধু কিশোর আর মুসা এখনও বাইরে রয়ে গেছে। নেকলেসটা ওদের কাছে। ওরা কিছু না কিছু করবেই। আমার কিছু ঘটেছে আঁচ করার সঙ্গে সঙ্গে চলে যাবে পুলিশের কাছে।' ক্যাসির কাঁধে হাত রেখে সান্ত্বনা দিল সে। 'কোন চিন্তা কোরো না। কিশোর আর মুসা আমাদের উদ্ধার করবেই।'

'তাই,' হাসল ক্যাসি। 'কিন্তু তোমার মত দুর্ভাগ্য যদি ঘটে যায় ওদের? জনিকে বিশ্বাস নেই। ওদের অপেক্ষায় হাত গুটিয়ে বসে থাকা উচিত হবে না আমাদের। বেরোনোর চেষ্টা করা দরকার।'

'দরজায় তালা লাগানো,' রবিন বলল। 'জানালাটায়ও বড় বড় শিক। বেরোনো যাবে না। তবে...' ওপর দিকে তাকাল সে। একটা ট্র্যাপ-ডোর দেখা যাচ্ছে। 'ওটা দিয়ে বেরিয়ে দেখা যেতে পারে, কোথায় গেছে।'

'কিভাবে বেরোবে?'

নড়বড়ে টেবিল আর চেয়ারটার দিকে তাকাল রবিন। জানালা দিয়ে বাইরে দেখল। অন্ধকার হতে দেরি আছে এখনও। তবে পশ্চিমে ঢলতে শুরু করেছে সূর্য।

ক্যাসির দিকে তাকাল সে। 'টেবিলের ওপর চেয়ারটা তুলে ওখান পর্যন্ত পৌঁছানো যাবে। যদি ভেঙে না পড়ে।'

'তাহলে দেরি করছি কেন? চলো।'

টেবিলটা টেনে এনে ট্র্যাপ-ডোরের নিচে রাখল রবিন। তাতে তুলে দিল চেয়ারটা। ভালমত চাপ দিয়ে দেখল সহ্য করতে পারবে কিনা। মনে হলো, পারবে। ক্যাসিকে শক্ত করে ধরে রাখতে বলে প্রথমে টেবিলে, তারপর চেয়ারটায় চড়ল সে। মড়মড়, ক্যাঁচকোঁচ, নানা রকম শব্দ করল বটে, কিন্তু পড়ল না।

হাত বাড়িয়ে ট্র্যাপ-ডোরের ডালাটায় ঠেলা দিল সে। মরচে পড়া কব্জা আওয়াজ তুলল বটে, তবে উঠে গেল ওপর দিকে। আরেকটু ঠেলা দিতে একপাশে কাত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ডালাটা।

মুখ নামিয়ে ক্যাসির দিকে তাকাল সে। তারপর আবার ওপরে তাকিয়ে ধরে ফেলল ফোকরের কিনারটা। হাতের ওপর ভর রেখে নিজেকে টেনে তুলল। ওপাশে বেরিয়ে শুয়ে পড়ল উপুড় হয়ে। ফোকরের কাছে মুখ এনে ক্যাসিকে ডাকল, 'উঠে এসো। সাবধানে উঠবে, যাতে চেয়ারটা পড়ে না যায়।'

উঠে হাত বাড়িয়ে দিল ক্যাসি।

শক্ত করে ওর বাড়ানো হাতটা চেপে ধরল রবিন। টেনে তুলে নিল ওপরে। আবার নামিয়ে দিল ডালা।

নিচ থেকে ডালার ফোকর দিয়ে যে আলো আসছিল, সেটাও ঢেকে যেতে ঘন অন্ধকারে ঢাকা পড়ে গেল জায়গাটা।

পুরু বালিতে ঢেকে আছে মেঝে। মাকড়সার জালের ছড়াছড়ি। এগোনোর চেষ্টা করতেই লেগে গেল মুখে, মাথায়। ওপর দিকে তাকাল। অস্পষ্ট ভাবে মনে হলো ঢালু একটা চালামত রয়েছে।

'ক্যাসি?'

'বলো।'

'এসো আমার সঙ্গে।'

'তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না তো।'

'এই যে, আমার হাত ধরো।'

খুব সাবধানে অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলল ওরা। কোথায় যাচ্ছে বুঝতে পারল না। কিছুদূর এগোনোর পর মনে হলো, সামনে আলো আছে।

আলোর উৎসটা খুঁজে বের করল রবিন। আরেকটা ট্র্যাপ-ডোর। নিচে একটা ঘর। ট্র্যাপ-ডোরের ডালাটা ভেঙে গেছে। আলো আসছে সেখান দিয়ে। একটা করিডর ধরে হাঁটছে ওরা। এর নিচের ঘরগুলো এক সময় বোধহয় সব ক'টাই স্টোর রুম ছিল।

দ্বিতীয় ট্র্যাপ-ডোরের ফোকরটা দিয়ে নিচে তাকাল সে। আলো আসছে একটা দরজা দিয়ে।

কোন রকম দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে গেল না রবিন। ক্যাসিকে বলল ফোকর দিয়ে নেমে যেতে। ওপর থেকে হাত ধরে তাকে নিচে ঝুলিয়ে দিল। তারপর ছেড়ে দিল হাতটা।

ফোকর দিয়ে রবিনও লাফিয়ে নেমে এল মেঝেতে।

ঘরে কোন লোক নেই।

'ওই যে বেরোনোর পথ!' খোলা দরজার দিকে দৌড় দিল ক্যাসি।
'আস্তে!' হিসিয়ে উঠল রবিন। 'এত শব্দ কোরো না। ভুলে যাচ্ছ নাকি জনির কাছে পিস্তল আছে। ও এখন কোথায় তা-ও আমাদের জানা নেই।'
ফিরে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল ক্যাসি। 'না, ভুলিনি। শয়তানটাকে কি আর এত সহজে ভুলি।' দরজা দিয়ে বাইরে উঁকি দিল। একটা সরু সিঁড়ি চোখে পড়ল। নিচে অন্ধকার।
কাঠের সিঁড়ি। পা টিপে টিপে নামতে লাগল ওরা। মাঝে মাঝেই মড়মড় করে উঠছে পুরানো তক্তা। চমকে দিচ্ছে।
'জনি কতক্ষণ পর পর দেখতে আসে তোমাকে?' জিজ্ঞেস করল রবিন। 'আমরা যে নেই, জানতে কতক্ষণ?'
'জানি না,' জবাব দিল ক্যাসি। 'সকালে একবার খাবার দিয়ে যায়, আরেকবার সন্ধ্যায়।'
বড় বড় জানালাওয়ালা একটা হলঘরে এসে ঢুকল ওরা। এখান থেকে বাড়ির সামনেটা চোখে পড়ে। ড্রাইভওয়েতে জনির সবুজ গাড়িটা দেখতে পেল। গাছে ছাওয়া একটা কাঁচা রাস্তা বাড়ি থেকে বেরিয়ে এঁকেবেঁকে চলে গেছে দূরের পাকা মহাসড়কের দিকে।
'জনি বোধহয় কারও অপেক্ষা করছে,' রবিন বলল। 'ফোনে যোগাযোগ করে থাকতে পারে।' অন্ধকার হয়ে আসা আকাশের দিকে তাকাল সে। 'অন্য লোকটা আসার আগে বেরোবে না। ওই লোকটাকে চেনো নাকি তুমি?'
'ওকে আমি দেখিইনি,' ক্যাসি বলল। 'ওদের কথা বলতে শুনেছি। লোকটাকে ভীত মনে হয়েছে আমার।'
'ভীত?'
'হ্যাঁ। যে ঘরটায় আটকে রেখেছিল আমাকে, তার বাইরে সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল ওরা। দ্বিতীয় লোকটা জনিকে সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে পালানোর পরামর্শ দিচ্ছিল। কিডন্যাপিঙের ব্যাপারটা তার পছন্দ হচ্ছিল না।'
'জনি কি বলল?'
'বলল–আমার হাতে যতক্ষণ পিস্তল আছে, ততক্ষণ তোমাকে যা বলব, তাই শুনতে হবে–রাগারাগি, তর্কাতর্কি, এ সমস্ত।'
'লোকটা কি ড্রাইভার?'
'হতে পারে। জানি না।'
ড্রাইভওয়ের দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগল রবিন। 'বেরোতে হলে ওদিক দিয়ে বেরোতে হবে,' গেটটা দেখাল সে, 'আর কোন পথ দেখছি না। কিন্তু খোলা জায়গায় যাওয়ার ইচ্ছে আপাতত নেই আমার। কোনখানে বসে তাকিয়ে আছে জনি, কে জানে। আবার ধরে ফেলবে। এত কষ্ট করে পালানোটাই বৃথা যাবে।'
'করবটা কি তাহলে? ওরা দুজন। সঙ্গে পিস্তল আছে। মারামারি করে পারব না ওদের সঙ্গে।'
'অন্ধকার হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করব,' রবিন বলল। 'তখন পালানোর

কোন না কোন সুযোগ পেয়েই যাব।'

'তাহলে এখন লুকিয়ে পড়া যাক কোথাও,' হাসল ক্যাসি। 'ও যদি আমাদের ঘরে গিয়ে দেখে ফেলে আমরা নেই, ভাববে বাড়ি ছেড়েই পালিয়েছি। এ বাড়িতেই যে লুকিয়ে আছি, কল্পনাই করবে না। খোঁজাখুঁজি করবে বলে মনে হয় না।'

নিঃশব্দে করিডরে বেরিয়ে এল দুজনে। একটা ঘর খুঁজতে লাগল লুকানোর জন্যে।

শূন্য ঘরের নোংরা কোন কোণে চুপ করে লুকিয়ে বসে থাকা মোটেও সহজ নয়, যে ওভাবে না লুকিয়েছে সে বুঝবে না। জনির শুনে ফেলার ভয়ে কথা বলা যাবে না। নড়াচড়া করা যাবে না। হাতে-পায়ে খিল ধরে গেলেও সহজে টান টান করে আড়মোড়া ভাঙা কিংবা রক্ত চলাচল স্বাভাবিক করানোর ব্যবস্থা করা যাবে না, তা-ও জনির ভয়ে, মেঝের তক্তা যদি চাপ লেগে শব্দ শুরু করে?

বন্দী থেকে থেকে বন্দিত্বটা বেশ সহ্য করে নিয়েছে ক্যাসি, সে চুপচাপ বসে রইল। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে রবিনের। সে মোটেও চুপ থাকতে পারছে না।

ফিসফিস করে কথা বলছে ক্যাসির সঙ্গে। ওদের ছোটবেলার কথা। মুসা আর কিশোরের কথা। তিন গোয়েন্দার নানা রকম অভিযানের কথা। ক্যাসির মতই চুপ করে থাকাটাই সবদিক থেকে ভাল, বুঝতে পারছে, কিন্তু মুখ বন্ধ রাখতে পারছে না। কথাগুলো আপনাআপনি বেরিয়ে আসছে তার মুখ থেকে।

শব্দ হলো একটা। কথা থামিয়ে কান পাতল দুজনে। গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দ। গেট দিয়ে ঢুকল গাড়িটা। থামল। দড়াম করে দরজা লাগানোর শব্দ হলো।

'আরও কেউ এসেছে,' ফিসফিস করে বলল রবিন। 'কে লোকটা, বলো তো?'

'হবে হয়তো টনির বস্। কিংবা রকি বীচের যে লোকটাকে ফোন করেছিল সে।...বেরোবে নাকি?'

মাথা ঝাঁকাল রবিন। 'আরেকটু পরে। আরও অন্ধকার হোক।'

বিশ

গেটের ভেতর ঢুকে, সাইকেল দুটো দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাখল মুসা আর কিশোর। তারপর একটা ঘরের জানালায় আলো দেখে সেদিকে এগোল।

এত জঘন্য সাদা কাদা, তার মধ্যে এগুনো খুব কঠিন। তা-ও যথাসাধ্য কম শব্দ করে, নতুন করে ফেলা খোয়া আর মাটির ওপর দিয়ে দিয়ে, কাদা পার হয়ে এসে দাঁড়াল জানালার কাছে। উঁকি দিল আলোকিত ঘরের ভেতরে।

দুজন লোক। একজনকে চিনতে পারল–আব্রাহাম। অন্যজন পরিচিত না হলেও চিনতে অসুবিধে হলো না। অনুমানেই বুঝতে পারল, জনি বিয়াণ্ডা।

ঝগড়া করছে দুজনে।

'দেখো, জনি,' আব্রাহাম বলছে, 'আমি আর এ সবের মধ্যে নেই। মেয়েটা যখন হারটা দেখে ফেলল তোমার ব্যাগে, তখনই তোমার বন্ধ করা উচিত ছিল এ খেলা। আমাকেও তুমি মিথ্যে কথা বলেছিলে। বলেছ, জিনিসটা তোমার নিজের, কোন আগ্রহী ক্রেতা পেলে বেচে দিতে। জিনিসটা তোমার, এ কথা আমি মোটেও বিশ্বাস করিনি। এত দামী জিনিস তোমার হতে পারে না, তাহলে অন্য কারও চাকরি করতে যেতে না। চোরাই মাল আগেই বুঝতে পেরেছি। মনে করেছি চোরের ওপর বাটপাড়ি করেছ। এত কাণ্ড করেছ যে, ঘুণাক্ষরেও ভাবিনি–বিশেষ করে কিডন্যাপিং। তুমি মিথ্যে কথা বলেছ, না জেনে আমি তোমার ফাঁদে পা দিয়েছি। এখন আর কোন কথা শুনতে চাই না। আমি আর তোমার কাজ করে দেব না। ভাল চাও তো, ছেলেমেয়েগুলোকে ছেড়ে দাও।'

চট করে মুসার দিকে তাকাল কিশোর। মেয়েটা নিশ্চয় ক্যাসি। আর ছেলেটা? রবিন।

'ইস্, কি একটা ভীতুকেই না ঠিক করেছিলাম জিনিস বেচে দিতে!' আফসোস করে বলল জনি। 'এ রকম যদি জানতাম...তাহলে তুমি এখন কেটে পড়তে চাও? সব দোষ আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে? সেটি হবে না। তুমি কি ভেবেছ তুমি কান্নাকাটি করলেই আমি সব বাদ দিয়ে দেব? এতদূর এগিয়ে? তোমার ভরসায় আমি জিনিসটা চুরি করেছি, মেয়েটাকে কিডন্যাপ করেছি, আর এখন তুমি ডোবাতে চাইছ আমাকে।'

'কিন্তু তুমি মিথ্যে কথা বলেছ আমাকে...'

'সে যা বলার বলেছি। এখন তোমাকে আমার কথামত কাজ করতেই হবে...'

'দেখো জনি, ভাল চাও তো এখনও এ সব বাদ দাও। ব্যাপারটা যতখানি গড়িয়েছে, তাতে কোনমতেই সামাল দিতে পারবে না তুমি। ধরা পড়লে চোদ্দ বছর ঘানি টানতে হবে। তারচেয়ে ছেলেমেয়েগুলোক ছেড়ে দিয়ে...'

'চুপ! ভীতুর ডিম কোথাকার! তোমার সাধুবাক্য শোনার সময় আমার নেই। লোভটা আছে ষোলোআনা, অথচ সাহস নেই একরত্তি, মাথায়ও গোবর। আমি ওদের এখন ছেড়ে দিলেই পার পেয়ে যাব? মেয়েটা জানে আমি নেকলেসটা চুরি করতে যাচ্ছিলাম। তাকে কিডন্যাপ করেছি। ছাড়া পেয়েই সোজা পুলিশের কাছে চলে যাবে সে। লস অ্যাঞ্জেলেস থেকেও বেরোতে পারব না আমি। তার আগেই ধরা পড়ে যাব। পালাতেই যদি হয়–আর যদি বলছি কেন, পালাব তো বটেই, হারটা নিয়েই পালাব–তুমি কিনতে চাইলে কিনবে না কিনতে চাইলে নেই। ছেলেমেয়েগুলোকেও ছেড়ে দিয়ে যাব না। দরকার হয়, দরকার হয় মুখ বন্ধ করে দেব ওদের।'

শিউরে উঠল আব্রাহাম। 'খুন করবে নাকি!'

খ্যাকখ্যাক করে হাসল জনি। 'এত দামী একটা জিনিসের জন্যে তা-ও করতে পারি আমি। শুধু ওদের না, প্রয়োজন পড়লে আমি তোমাকেও খুন করব।'

ভয়ঙ্কর ভঙ্গিতে আব্রাহামের দিকে পিস্তল তুলে নাচাল সে।

কুঁকড়ে গেল আব্রাহাম।

হেসে উঠল জনি। 'এখন শোনো আমার কথা, যদি বাঁচতে চাও...'

কিন্তু ওর কথা শেষ হওয়ার আগেই কঠিন কণ্ঠে আদেশ হলো মুসা আর কিশোরের পেছন থেকে, 'অ্যাই, নড়বে না একদম! আমার হাতে পিস্তল আছে!'

ভেতরের কথায় এতটাই মনোযোগ ছিল দুজনের, পেছনে যে ছায়ার মত নিঃশব্দে এসে দাঁড়িয়েছে লোকটা, টেরই পায়নি।

*

ঘরগুলো এমনিতেই অন্ধকার। তার ওপর বাইরে অন্ধকার নেমে আসায় গাঢ় অন্ধকার হয়ে গেছে।

এতক্ষণে উঠে দাঁড়াল রবিন। 'চলো, এবার যাওয়া যাক।'

এত অন্ধকারের মধ্যে কোন রকম আলো ছাড়া শুধু আন্দাজে এগিয়ে যাওয়া বড় কঠিন। কোথায় যাচ্ছে, কোন্‌দিকে, কিছুই বোঝার উপায় নেই।

একটা বড় ঘরে ঢুকল ওরা। জানালার কাছে এসে দাঁড়াল। দেখল, ড্রাইভওয়েতে এখন দুটো গাড়ি। কোন মানুষ চোখে পড়ল না। অন্ধকার আর ছায়া সবখানে। কোথাও কেউ লুকিয়ে থেকে পাহারা দিচ্ছে কিনা, বোঝার উপায় নেই।

তবে ঝুঁকি নিতেই হবে। নইলে বসেই থাকবে এ বাড়িতে। পালানো আর হবে না।

রবিন বলল, 'বেরোনোর চেষ্টা বোধহয় করা যায় এবার।'

'চলো।'

ঘরটা থেকে বেরিয়ে আবার করিডর ধরে এগোল ওরা।

সামনে বাঁকের ওপাশে আলো দেখা যাচ্ছে।

'জনি নাকি?' রবিনের প্রশ্ন।

'ও ছাড়া আর কে হবে?' ক্যাসি বলল। 'রাতের বেলা হ্যাজাক জ্বালায় সে। ইলেকট্রিসিটি নেই এ বাড়িতে।'

আলো লক্ষ্য করে এগিয়ে চলল ওরা।

বাঁক নিতেই আরও স্পষ্ট হলো আলো। জানালা বা দরজা দিয়ে আসছে না, আসছে নিচতলা থেকে, ফোকর দিয়ে। মেঝের তক্তা খসে পড়ে গেছে। সেখান দিয়ে নিচের ঘর থেকে আলো এসে ছাতে পড়ে বিচিত্র আলো-আঁধারির সৃষ্টি করেছে।

দম বন্ধ করে ফোকরটার দিকে এগোল রবিন। পায়ের চাপে তক্তা মড়মড় করে উঠলেই ওদের অস্তিত্ব ফাঁস হয়ে যাবে।

ফোকরের কাছে এসে আস্তে করে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল। গলা লম্বা করে

মুখ বাড়িয়ে দিল সামনে।

বাতিটা রাখা হয়েছে একটা টেবিলে। হাতে পিস্তল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে টনি। ওপর থেকে বাতির আলোয় সরাসরি নিচে দাঁড়ানো ওর দেহটাকে কিম্ভূত আর খাটো লাগছে।

নিচের দৃশ্য ভালমত দেখার জন্যে গলাটা ফোকরের ওপর আরেকটু ঠেলে দিল রবিন।

এতটাই চমকে গেল, আটকে রাখা দমটা বেরিয়ে গেল আপনাআপনি।

পিস্তল হাতে কাকে শাসাচ্ছে দেখতে পেল এতক্ষণে।

একুশ

টেবিলের কিনারে বসে কিশোর আর মুসার দিকে তাকিয়ে আছে জনি। নীল চোখে সাপের শীতল দৃষ্টি। আলতো করে ধরে রেখেছে পিস্তলটা।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে আব্রাহাম। চঞ্চল দৃষ্টি ঘুরে বেড়াচ্ছে তিনজনের ওপর।

'কোনদিন আর নেকলেসটা হাতে পাবেন না আপনি,' কিশোর বলল।

'তাই নাকি?' হালকা স্বরে বলল জনি। 'আমি তো ভাবছি তোমাদের আস্ত ফিরে পাওয়ার জন্যে সহজেই নেকলেসটা দিয়ে দেবে তোমাদের বাবা-মা।' হাত বাড়িয়ে টেবিল থেকে পোর্টেবল টেলিফোনটা তুলে নিল সে। 'একটা ফোনেই কাজ হয়ে যাবে, কি বলো?' আব্রাহামের দিকে তাকাল। 'এই এলাকা তুমি চেনো ভাল। কোনখান থেকে নেকলেসটা তুলে নিলে সুবিধে হয়, ভেবে দেখো। এমন কোথাও, যেখান থেকে নেকলেসটা নিয়ে পালাতে পারি আমরা।'

চোখ বড় বড় করে ওর দিকে তাকিয়ে রইল আব্রাহাম।

কঠোর হয়ে উঠল জনির চেহারা। 'কি হলো?'

'অ্যাঁ!...ভাবছি!'

'ভাবো। জলদি করো।' গোয়েন্দাদের দিকে তাকাল আবার জনি। 'তোমাদের এখানে আসার কথা কে কে জানে? কেউ জানে?'

'জানে,' সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল কিশোর, 'পুলিশ। ওরা এই এল বলে।'

হেসে উঠল জনি। 'এ সব ধাপ্পাবাজিতে কাজ হবে না।'

'পুলিশ!' আতঙ্কে কুঁকড়ে গেল আব্রাহাম। 'পুলিশ!'

'ভীতুর ডিম কোথাকার!' আব্রাহামের দিকে তাকিয়ে মুখ বাঁকাল জনি। 'আরে পুলিশ আসবে কোত্থেকে? ধাপ্পা দিচ্ছে ছেলেগুলো, তা-ও বুঝতে পারছে না। পুলিশকেই যদি জানাত, ওদের ছাড়া ওরা এখানে আসত নাকি? শোনো এখন, মেরুদণ্ডহীন কেঁচো কোথাকার, ভেবেছ কিছু? কোথায় দেখা করা যায়?'

'জায়গা একটা আছে অবশ্য,' ভয় যাচ্ছে না আব্রাহামের। 'হাউলার'স

কফি শপ। ওখান থেকে একটা রাস্তা দিয়ে সোজা উঠে যাওয়া যায় হাইওয়েতে। কিন্তু...'

'থামো!' ধমকে উঠল জনি। 'তোমার রাস্তার বর্ণনা শোনার সময় নেই এখন।' কিশোরের কাছে এগিয়ে গেল সে। 'নাও, তোমার বাবাকে ফোন করো। বলো, নেকলেসটা যেন হাউলার'স কফি শপে পৌঁছে দিয়ে যায়।' ঘড়ি দেখল সে। 'এক ঘন্টার মধ্যে। এটাও বলো, না দিয়ে গেলে কোনদিন তোমাদের দেখতে পাবে না আর।'

মাথা নাড়ল কিশোর। 'না, পারব না।'

পিস্তল তুলল জনি, 'তোমাকে পারতে হবে।'

তাড়াতাড়ি হাত তুলল আব্রাহাম। 'জনি,' গলা কাঁপছে ওর, 'দোহাই লাগে তোমার, খুনখারাপির মধ্যে যেয়ো না!'

'তোমাকে চুপ থাকতে বলেছি আমি,' ধমক দিল জনি। 'নেকলেস না পেলে আমি ওদের ছেড়ে দেব মনে করেছ? তোমার কি ধারণা ইয়ার্কি মারছি আমি ওদের সাথে?'

'যা-ই মারো না কেন, ওদের কোন ক্ষতি আমি করতে দেব না তোমাকে,' অনিশ্চিত ভঙ্গিতে এগোল আব্রাহাম। হাত বাড়াল পিস্তলটা কেড়ে নেয়ার জন্যে।

সাপের মত ছোবল মারল যেন জনির পিস্তলধরা হাতটা। পিস্তলের বাঁটটা গিয়ে প্রচণ্ড আঘাত হানল আব্রাহামের মুখের একপাশে।

চিত হয়ে পড়ে গেল আব্রাহাম। গাল চেপে ধরল। গোঙাচ্ছে মার খাওয়া কুকুরের মত। তীব্র ব্যথায় বিকৃত হয়ে গেছে মুখ। চোখে রাজ্যের বিস্ময়। কল্পনাই করেনি সত্যি সত্যি তাকে মারবে জনি।

'আর একটা কথা যদি বলো,' হিসিয়ে উঠল জনি, 'কোন রকম পরামর্শ বা বাধা দিতে আসো, ভাল হবে না বলে দিলাম।'

হামাগুড়ি দিয়ে ওর কাছ থেকে সরে গেল আব্রাহাম। ওর কাঁচের মত চোখে আতঙ্ক।

'ও তো বলছে ফোন করবে না বাড়িতে,' কিশোরকে দেখিয়ে মুসাকে বলল জনি, 'তুমি করবে তো?'

জনির কণ্ঠে প্রচ্ছন্ন হুমকি।

'কোন লাভ হবে না,' মুসা বলল। 'আমি করলেও কোন লাভ হবে না। নেকলেসটা কোথায় বাড়ির কেউ জানে না। সত্যি বলছি।'

'না জানলে তুমি ওদের বলে দাও কোথায় পাওয়া যাবে।'

দ্বিধা করে জবাব দিল মুসা, 'তাতেও লাভ হবে না। বাড়িতেই নেই নেকলেসটা।'

মুসার হাত চেপে ধরল কিশোর। 'বলে দাও ওকে। দোহাই তোমার, বলে ফেলো। নইলে এই লোক আমাদের ছাড়বে না।'

মুসার হাতে ফোনটা গুঁজে দিল জনি। 'তোমার বন্ধু যা বলছে, করো। ওই নেকলেসটা আমাকে এনে দাও, ব্যস, ডানা মেলা পাখির মত তোমরা মুক্ত।'

আন্তরিকতা প্রকাশের জন্যে ওর ভারী হাতটা নেমে এল মুসার কাঁধে। হঠাৎ বদলে গেল মুখের ভঙ্গি। আঙুলগুলো দ্রুত এগিয়ে গেল মুসার গলার কাছে। চোখে উত্তেজনা আর অবিশ্বাস। সোয়েট-শার্টের কলার ধরে টান মারল আচমকা।

বেরিয়ে পড়ল গলায় পরা ঝলমলে নেকলেসটা।

'মুসা!' চিৎকার করে উঠল কিশোর।

'রেখে আসার চেয়ে পরে আসা নিরাপদ মনে করেছিলাম,' ভোঁতা গলায় বলল মুসা। আস্তে করে হাত পেছনে নিয়ে গিয়ে হুক সরিয়ে খুলে আনল নেকলেসটা। জনির বাড়ানো হাতের তালুতে ফেলে দিল।

লোভের আগুন জ্বলজ্বল করে উঠল জনির চোখে। নেকলেসটা চেপে ধরে উন্মাদের মত হাসতে লাগল সে।

মুসার দিকে তাকাল। 'যাক, বাড়িতে আর ফোন করতে হলো না তোমাকে।'

'আপনি বলেছেন,' কিশোর বলল, 'নেকলেসটা দিয়ে দিলে আমরা পাখির মত মুক্ত। এখন আমাদের ছেড়ে দিন।'

নেকলেসটা পকেটে ভরে রাখল জনি। ফিরে গিয়ে বসল টেবিলে।

'তোমাদের নিয়ে আসলে কি করব, এখনও ঠিক করিনি আমি,' পিস্তলটা ধীরে ধীরে তুলে ধরল আবার দুজনের দিকে।

বাইশ

রবিনের কোন এক পূর্বপুরুষের রক্তে ছিল ইনডিয়ান রক্ত। মাঝে মাঝে সে-জন্যেই বোধহয় ইনডিয়ানদের মত খেপে ওঠে সে। জনির ওপর এত রাগ হলো তার, সেই খেপামিতে পেয়ে বসল। নিজের অজান্তেই মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল ইনডিয়ানদের যুদ্ধ-হুঙ্কার, 'জেরোনিমো!'

কি ঘটবে কোন রকম চিন্তা-ভাবনা না করে ফোকর দিয়ে চিতাবাঘের মত লাফিয়ে পড়ল জনির ঘাড়ে। আক্রান্ত হরিণের মতই ধরাশায়ী হলো জনি। হাত থেকে উড়ে চলে গেল পিস্তলটা।

এক লাফে গিয়ে ওটা তুলে নিল কিশোর। ফিরে তাকিয়ে দেখল, নড়ছে না জনি। চিত হয়ে পড়ে আছে। রবিনও পড়ে গিয়েছিল। উঠে দাঁড়াচ্ছে ধীরে ধীরে।

রবিনের চিৎকার, তারপর জনির চিৎকার–দরজার বাইরে থেকে বোধহয় কানে গেছে রীডের। কি ঘটছে দেখার জন্যে উঁকি দিল।

বিমূঢ় হয়ে তাকিয়ে রইল। রেখে গিয়েছিল দুটো ছেলেকে, এখন দেখে তিনটে। জনি পড়ে আছে মেঝেতে।

আবার শোনা গেল যুদ্ধ-হুঙ্কার। তবে এবার রবিন নয়, মুসা। ভিন্ন ভাষায়

গর্জে উঠেছে, 'ইয়া-আলী!' মাথা নিচু করে তীব্র গতিতে ছুটে গেল সে।

রীডের মনে হলো, পেটে একটা কামানের গোলা এসে আঘাত হেনেছে। নিগ্রোর মাথার খুলি যে এত শক্ত হতে পারে, দুঃস্বপ্নেও কল্পনা করেনি সে। বাস্তবেও করার পুরো অবকাশ পেল না। জোরে হেঁচকি ওঠার মত 'হুঁক!' করে একটা শব্দ বেরিয়ে এল কেবল মুখ থেকে। প্রথমে ঝাঁকুনি দিয়ে সামনের দিকে বেঁকে গেল শরীরটা। ওই অবস্থাতেই ছিটকে পড়ল পেছনে। তার গায়ের ওপর পড়ল মুসা।

বসের মতই রীডও জ্ঞান হারিয়েছে। ঠ্যাং ধরে তাকে ঘরের ভেতর টেনে নিয়ে এল মুসা।

হতবাক হয়ে তাকিয়ে আছে আব্রাহাম। তার বড় বড় চোখ মনে হচ্ছে ঠিকরে বেরিয়ে আসবে কোটর থেকে। দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে আছে। বেগুনী ফোঁড়ার মত ফুলে উঠেছে গালের আঘাতটা।

কিশোরের হাতে পিস্তল। কাউকে গুলি করার কিংবা হুমকি দেয়ার প্রয়োজন হলো না। শান্তকণ্ঠে নির্দেশ দিল সে, 'বেঁধে ফেলো!'

'দড়ি কোথায় পাব?' এদিক ওদিক তাকাতে লাগল মুসা।

'আমি আনতে পারতাম,' ওপর থেকে বলল ক্যাসি। 'কিন্তু অন্ধকারে খুঁজে পাব না।'

ওপর দিকে তাকাল মুসা আর কিশোর। রবিন ছাড়া আরও যে কেউ ছিল ওখানে, জানত না।

ক্যাসিকে দেখে অবাক হলো না কিশোর। পকেট থেকে টর্চ বের করে জিজ্ঞেস করল, 'ছুঁড়ে দিচ্ছি। ধরতে পারবে?'

'পারব,' জবাব দিল ক্যাসি।

'নাও।'

ছুঁড়ে দেয়া টর্চটা লুফে নিল ক্যাসি। অদৃশ্য হয়ে গেল তার মুখ।

ওপরে কাঠের মেঝেতে ছুটন্ত পায়ের শব্দ হলো। নিচে থেকে বুঝতে পারল গোয়েন্দারা, দৌড়ে যাচ্ছে ক্যাসি।

অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকা দেহ দুটোর দিকে পিস্তল ধরে বসে রইল কিশোর। সতর্ক রইল রবিন আর মুসা। দরজাটা লাগিয়ে দিয়ে সেটা আগলে দাঁড়িয়ে আছে মুসা।

দড়ি আনতে তিন মিনিটও লাগল না ক্যাসির। নিচে দড়ির বান্ডিল ছুঁড়ে দিয়ে ফোকরের নিচ থেকে টেবিলটা সরাতে বলল সে। ফোকর গ ̄ া বের করে দিল। ফোকরের কিনার দুই হাতে ধরে ঝুলে পড়ল নিচে। আলগোছে ছেড়ে দিল হাত দুটো। ধপ করে পড়ল মেঝেতে।

বেঁধে ফেলা হলো জনি আর রীডকে।

জনির পকেট থেকে নেকলেসটা বের করে নিল কিশোর। রবিনের দিকে তাকাল, 'নাও, এবার পুলিশকে ফোন করো।'

কিন্তু রবিন ফোন করার আগেই কানে এল সাইরেনের শব্দ। কি করে যেন আগেই খোঁজ পেয়ে গেছে পুলিশ। ছুটে আসছে।

তেইশ

গাড়ি থেকে মা'কে নামতে দেখে রবিন অবাক।

ছুটে এসে জড়িয়ে ধরলেন ছেলেকে।

সবাইকে সুস্থ দেখে খুব খুশি তিনি। রবিনকে ছেড়ে ক্যাসিকে জড়িয়ে ধরলেন।

কি করে এলেন তিনি, জানা গেল। 'কাল রাতে তো ঘুম হয়নি ভাল, দুপুরে খাওয়ার পর একটু শুয়েছিলাম।' রবিনের দিকে তাকালেন, 'তোর ওপর মেজাজটা খারাপই হয়ে গিয়েছিল। হুট করে চলে গেলি। সন্ধের আগে আগে ঘুম ভাঙল। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে মাথাটা তখন পরিষ্কার হয়ে এসেছে। ভালমত চিন্তার সুযোগ পেলাম। তখনই মনে হলো, কোথাও একটা গণ্ডগোল হয়েছে। কারণ, আমি তোকে বাড়িতে থাকতে বলা সত্ত্বেও তুই জোর করে বেড়াতে চলে যাবি, মুসা আর কিশোরও তোকে নিয়ে যাবে, এটা হতেই পারে না। তারমানে কিছু একটা হয়েছে। বেড়াতে যাসনি তুই। বাগানে বেরিয়ে আরও শিওর হলাম, যখন দেখলাম তোর সাইকেলটা পড়ে আছে। পুলিশকে ফোন করলাম। ওরা এসে আমাকে থানায় নিয়ে গেল রিপোর্ট লেখানোর জন্যে।'

'ও, এইজন্যেই ঘর অন্ধকার দেখেছি আমরা,' কিশোর বলল। 'গাড়িটা ড্রাইভওয়েতে। অবাক লেগেছে আমার। ভাবছিলাম, গাড়ি ফেলে আপনি কোথায় গেলেন?'

মাথা ঝাঁকালেন মিসেস মিলফোর্ড। 'ফিরে এসে অ্যানসারিং মেশিনে পেলাম তোমাদের মেসেজ। সঙ্গে সঙ্গে আবার ফোন করলাম পুলিশকে। তক্ষুণি গাড়ি নিয়ে হাজির হয়ে গেল ওরা। স্টোনশেক ভিলার কথা ওদের বললাম। খোঁজখবর করে ওরা জানতে পারল, বাড়িটা পাহাড়ের মাঝখানে। অনেক দিন পতিত থাকতে থাকতে অনেকটা পোড়োবাড়ির মতই হয়ে গেছে। ভূমিকম্পের পর একজাতের অদ্ভুত সাদা কাদা উঠতে থাকে। এই কাদায় সাংঘাতিক অসুবিধে করে বলে মালিক বাড়িটা ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে। বিক্রির চেষ্টা করেছিল অনেক, কিন্তু ওই সাদা কাদার জন্যে কেউ কিনতে রাজি হয় না।

'যাই হোক, বাড়িটার খোঁজ পাওয়ার পর পুলিশ রওনা হতে যাবে, আমিও ওদের সঙ্গে আসতে চাইলাম। রাজি হলো তারা।'

মিসেস মিলফোর্ড থামতে একজন অফিসার বলল, 'এত সহজে বুঝতে পারতাম না কোন বাড়িটা সম্পর্কে বলা হচ্ছে, যদি না একটা রিপোর্ট পেতাম। বাড়িটার সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় গত কদিন ধরে লোকে নাকি রাতের বেলা আলো দেখতে পাচ্ছিল। বাড়িটাতে চোর-ডাকাতে আস্তানা গেড়েছে কিনা ভেবে সন্দেহ হয়েছে দু'একজনের, তারাই থানায় জানিয়ে গেছে।' জ্ঞান ফিরে

এসেছে জনি আর রীডের। ওদের দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে অফিসার বলল, 'এখন তো দেখছি, সন্দেহটা সত্যিই ছিল। চোর-ডাকাতেই আস্তানা গেড়েছে।'

জ্বলন্ত চোখে তিন গোয়েন্দার দিকে তাকাতে লাগল জনি আর রীড। হাত খোলা পেলে এখন হয়তো গলা টিপে ধরতে আসত।

দেয়ালে হেলান দিয়ে তেমনি বসে আছে অব্রাহাম।

তার দিকে তাকিয়ে অফিসার বলল, 'কি ব্যাপার, মিস্টার অব্রাহাম, আপনাকে তো ভদ্রলোক বলেই জানতাম। আপনি আবার এদের দলে যোগ দিলেন কবে?'

মুখ নিচু করে রেখেছে অব্রাহাম। তুলতে পারছে না লজ্জায়।

*

পরদিন সকাল।

ঝলমলে রোদ।

রবিনদের বাগানে বসে হাসাহাসি, গল্প করছে তিন গোয়েন্দা আর ক্যাসি। সবার হাতেই লেমোনেডের বোতল। সামনে টেবিলে রাখা বিরাট প্লেটে স্যান্ডউইচের স্তূপ।

আলোচনার বিষয়বস্তু মূলত আগের রাতের ঘটনা।

রবিনের দিকে তাকাল মুসা। 'আমার এখনও জানা হলো না, ক্যাসিকে তুমি আমাদের কথা কি কি বলেছ।'

'কি আর বলব,' রবিন বলল। 'সাধারণত আমরা যা যা করি।'

আরও কিছু জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল মুসা, দরজায় দেখা দিলেন মিসেস মিলফোর্ড। ক্যাসিকে ডেকে বললেন, 'ক্যাসি, তোমার ফোন।'

'ফোন!' উঠে দাঁড়াল ক্যাসি। 'কে করল?'

'তোমার আব্বা।'

দৌড় দিল ক্যাসি।

কয়েক মিনিট পর ছুটতে ছুটতেই ফিরে এল। হাসিমুখে জানাল, 'আব্বা আর আম্মা লস অ্যাঞ্জেলেসে আসছে। কাল রাতেই পুলিশ আব্বার সঙ্গে যোগাযোগ করে সব জানিয়েছে। প্রথম যে প্লেনে টিকেট পাবে, তাতে করেই চলে আসবে।' চেয়ারে বসল ক্যাসি। 'নেকলেসটা এবার আব্বা নিজের হাতে করে নিয়ে গিয়ে যার জিনিস তাকে দিয়ে আসবে। আর কাউকে বিশ্বাস নয়।'

'এটাই ঠিক হবে,' বলল কিশোর। 'একেবার নিশ্চিন্ত।'

'আরেকটা কথা,' সলজ্জ ভঙ্গিতে ক্যাসি বলল, 'আব্বা নিজে থেকেই আমার সঙ্গে ঝগড়াটা মিটমাট করে নিয়েছে।'

'যাক, শেষ পর্যন্ত হ্যাপি এনডিংই হলো,' রবিন বলল।

'কিন্তু আনন্দটা বেশিদিন টিকিয়ে রাখতে পারব না।' একটা স্যান্ডউইচ তুলে নিয়ে এক কামড়ে আধখানা মুখে পুরে দিল মুসা এমন ভঙ্গিতে, যেন তার আনন্দ নষ্ট করার জন্যে দায়ী স্যান্ডউইচটাই। খাবারের ফাঁক দিয়ে কোনমতে কথা বের করল, 'স্কুল খোলার সময় হয়ে গেছে।'

'যে কদিন আছে সে-কদিনই চুটিয়ে আনন্দ করে নেব, অসুবিধে কি?' রবিন বলল। 'সময় যা আছে, তাতে আরও একটা রহস্যের সমাধান করে ফেলা সম্ভব।'

'যদি পাওয়া যায়,' কিশোর বলল।

'পেলে খুব ভাল হতো,' ক্যাসি বলল, 'তোমাদের সঙ্গে আমিও থাকতে পারতাম। রবিনের মুখে তোমাদের গোয়েন্দাগিরির কথা শোনার পর থেকেই অস্থির হয়ে আছি, কখন একটা তদন্তে অংশ নিতে পারব।'

ভুরু কুঁচকে তার দিকে তাকাল কিশোর, 'কেন, এ রকম একখান অ্যাডভেঞ্চার করে ফেললে, তাতেও আশ মিটল না?'

'না, মেটেনি,' মাথা নাড়ল ক্যাসি, 'কারণ জানা ছিল না আমি একটা অ্যাডভেঞ্চার করতে যাচ্ছি। জানা না থাকলে পুরো মজা পাওয়া যায় না। অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে কি আর অ্যাডভেঞ্চার হয়?'

'নিশ্চিত একটা অ্যাডভেঞ্চারের খোঁজ আমি এখনই দিতে পারি,' স্যান্ডউইচটা শেষ করে কাগজে আঙুল মুছতে মুছতে মুসা বলল।

তিনজনেই অবাক হয়ে তাকাল তার দিকে।

রবিন জিজ্ঞেস করল, 'কি?'

'তোমাদের ফ্রিজে কাল অনেক আইসক্রীম দেখেছিলাম,' মুখটাকে গম্ভীর করে রেখে বলল মুসা, 'তদন্ত করে দেখা যেতে পারে তার কতটা এখনও অবশিষ্ট আছে।'

'ধুর!' আগ্রহী হয়ে সামনে ঝুঁকেছিল কিশোর, মুসার কথায় হতাশ ভঙ্গিতে হেলান দিল আবার। 'তোমার তো খালি খাওয়া।'

'তারচেয়ে আমি বরং একটা প্রস্তাব দিই,' হেসে বলল রবিন।

'কি?' ভুরু নাচাল কিশোর।

'মুসাকে আরেকবার মেয়ে সাজানো হোক। একটা পার্টি দেব আমরা। রকি বীচে যত বন্ধু-বান্ধব আছে আমাদের, সবাইকে দাওয়াত দেব।'

আঁতকে উঠল মুসা। চোখ বড় বড় করে চেঁচিয়ে উঠল, 'দোহাই লাগে তোমাদের, এই কুবুদ্ধি আর কোরো না! যদি আমাকে বাধ্য করো, স্রেফ আত্মহত্যা করব আমি। চিঠি লিখে রেখে যাব, আমার মৃত্যুর জন্যে একশো ভাগ দায়ী আমার দুই প্রিয় বন্ধু কিশোর আর রবিন।'

- : শেষ :-